ভস্মাবশেষ

অগ্নিসংস্কার—

ভস্মাবশেষ

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৫

মূল্য চার টাকা মাত্র

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'অগ্নিসংস্কার'এর দ্বিতীয় পর্ব "ভস্মাবশেষ" ছাপিয়ে বের করতে এত দেরি হয়ে গেল যে, সে জন্য কৈফিয়ৎ দিতেও লজ্জা বোধ হয়। তবে কৈফিয়ৎ আমার আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাগজের অভাব, ছাপাখানার গোলমাল প্রভৃতি কারণে ইচ্ছা থাকলেও এত দিন এ পর্ব বের করা সম্ভব হয় নি। সহৃদয় পাঠক এ কথা বুঝে বিলম্বের ত্রুটি মার্জনা করবেন আশা করি।

কলিকাতা,
১৫ই জুন, ১৯৪৮

মণীন্দ্র রায়

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যে দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি' বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।"

—রবীন্দ্রনাথ

অগ্নিসংস্কার

ভস্মাবশেষ

১

কলকাতায় জরুরী 'তার' পেয়ে অরুণাংশু উদ্বিগ্ন হয়েছিল; কিন্তু এলাহাবাদ পৌঁছবার পর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বাড়িতে দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি; এমন কি অসুখও হয় নি কারও। তবু সারা বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গিয়েছে। রমেনবাবুর গাম্ভীর্য গিয়েছে বেড়ে; প্রতুলবাবুর কেমন যেন আনমনা ভাব; মহামায়া দেবীর মুখে-চোখেও উদ্বেগের কালো ছায়া।

বিশেষ ক'রে অনামিকার মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে সব চেয়ে বেশি। তাকে আগের সে অনামিকা ব'লে আর যেন চেনাই যায় না। অরুণাংশু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, অনামিকা সর্বদাই তাকে যেন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, বাড়ির দশজনের বৈঠকে সে নিজে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেও অনামিকার দিক থেকে সাড়া সে একেবারেই পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে আলাপ জমাবার উপক্রম করলেই অনামিকা কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়ে।

বিহ্বল অরুণাংশু কিছুই বুঝতে পারলে না,—এমন কি, কেন যে কলকাতা থেকে 'তার' ক'রে তাকে ডেকে আনা হ'ল তাও নয়।

মহামায়া দেবীকে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেও একটির বেশি উত্তর সে পেলে না, কাজ আছে, বাবা, কাজ আছে, নইলে কি আর—

শেষে অরুণাংশু বিরক্ত হয়ে বললে, কাজ, না হাতী! কেন, বাড়িতে সবাই তো দেখছি বেশ ভালই আছে।

এর উত্তরে মহামায়া দেবীও বিরক্ত হয়েই বললেন, তুই বলছিস কি, অরুণ? বাড়িতে সবাই ম'রে না যাওয়া পর্যন্ত এখানে বুঝি তোমার কোনই কাজ থাকতে পারে না?

এ কথার উপযুক্ত উত্তর অরুণাংশু মুখে দিতে পারলে না বটে, কিন্তু মনে মনে তখনই সে ঠিক ক'রে ফেললে যে, আবার সে কলকাতায় ফিরে যাবে।

কিন্তু সংকল্পটাকে কাজে পরিণত করবার আগেই একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অনামিকার সঙ্গে একান্তে তার দেখা হয়ে গেল।

তখনও সন্ধ্যা হয় নি, কিন্তু হবার খুব দেরিও নেই। দারাগঞ্জের গাছপালার নীচে সূর্যের তখন ডুবুডুবু অবস্থা। রোদ নেই, কিন্তু আলো রয়েছে। তাতে সোনালীর আভা। সাদা দালানটার গায়ে মনে হচ্ছে যেন আবীরের ছোপ লেগেছে। বাগানে সবুজ আর সোনায় মেশামেশি। গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে আসন্ন সন্ধ্যার আলো ও আঁধার কেমন যেন একটা মায়ালোক সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সেখানেই অরুণাংশু অনামিকার দেখা পেলে।

হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটি ঝাড়ের আড়ালে পাথরের বেঞ্চের উপর ব'সে অনামিকা কি যেন একখানা বই পড়ছিল।

কিন্তু অরুণাংশু হাসিমুখে তার কাছে এসে দাঁড়াতেই অনামিকা সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল; মুখ তুলে অরুণাংশুকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে; কোলের বইখানা সশব্দে মাটিতে প'ড়ে গেল; তারপর যা তার হ'ল সেটাকে বলা চলে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা।

দেখে অরুণাংশু মুচকি হেসে বললে, তোমার কি হয়েছে, বল তো, অনু? এবার আমাকে কেবলই তুমি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছ কেন?

উত্তরে লাল মুখ আরও লাল ক'রে অনামিকা অস্ফুট স্বরে বললে, যান, তা কেন? আমি বুঝি—

কথাটাকে সে শেষ করতে পারলে না। কিন্তু অরুণাংশু কিছুক্ষণ হাসিমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর তার ঐ অসম্পূর্ণ উত্তরটার সূত্র ধ'রেই বললে, তা যদি না হয় তবে ব'স আবার; দুজনে, এস, আগের মত আবার একটু গল্প করি।

কিন্তু উত্তরে অনামিকা আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না, বসুন আপনি। আমার আমার একটু কাজ আছে।

ব'লেই সে চ'লে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু অরুণাংশু তার পথ

রোধ ক'রে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর ঈষৎ ক্ষোভের স্বরে সে বললে, বেশ, না হয় না-ই বসলে। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবে আমার? আমায় এখানে ডেকে আনা হ'ল কেন? কিছু জান তুমি?

অনামিকার মুখখানা এক নিমেষেই সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠে পরক্ষণেই কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, না তো; জেঠিমাকে জিজ্ঞেস করবেন আপনি।

মনে মনে বিস্মিত হ'ল অরুণাংশু; কিন্তু মুখে অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে সে বললে, তোমার জেঠিমাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানতে হ'লে বোধ করি বাকি জীবনটা আমাকে এখানেই কাটাতে হবে। কিন্তু তা করবার ইচ্ছে যখন আমার নেই, তখন কথাটা না শুনেই চ'লে যেতে হবে আমায়। দু-এক দিনের মধ্যেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব।

অনামিকা চোখ তুলে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললে, ও। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে চোখ নামিয়ে নিলে।

অরুণাংশু তার বিস্ময় আর গোপন করতে পারলে না; বললে, তোমার কি হয়েছে বল তো, অনু? এমন একটা কথার উত্তরেও ওই ছোট্ট 'ও' ছাড়া আর কোন কথা তোমার মুখে এল না?

এবার অনামিকার ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা গেল। মুখ তুলে একটু হাসলে সে; বললে, কি আর বলব! যাওয়াই তো আপনার স্বভাব।

তেমনই অনর্গল কথা বলাটাই তোমারও স্বভাব; অন্তত কদিন আগেও তাই ছিল।—ব'লে টিপে টিপে হাসতে লাগল অরুণাংশু।

অনামিকা উত্তর দিলে না; কিন্তু তার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশু বেশ স্বস্তি বোধ করলে। তার মনে হ'ল যে, অবস্থাটা ঠিক আগের মত না হ'লেও বেশ সহজ হয়ে এসেছে। একটু পরে নিজেই সে আবার বললে, আর কোন কথা না হোক, সুভদ্রা দেবীর কথাটাও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারতে।

কার কথা?—অনামিকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে।

অরুণাংশু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, সুভদ্রা দেবীর কথা, যার সম্বন্ধে আগেই তুমি অনেকখানি এগিয়ে ভেবে রেখেছিলে।

আবার লাল হয়ে উঠল অনামিকার মুখ। না, কিছু ভাবি নি আমি।—বলতে বলতে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। হাস্নাহেনার একটা ডাল হাত দিয়ে চেপে ধরলে সে; ফুলের বেশ বড় একটা গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে তা থেকে একটি একটি ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে সে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে একটু পরে অরুণাংশু বললে, তুমি জিজ্ঞেস না করলেও তার কথাটা তোমায় আমি না জানিয়ে পারছি নে। তোমার কৌতূহল তার সম্বন্ধে খুব বেশি ব'লেই ক'দিন থেকেই তোমাকে তার কথাটা জানাবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

অরুণাংশু থামলে—বোধ করি ইচ্ছা ক'রেই। সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল অনামিকা, সে যেন সম্মোহিতের চোখ।

সেই চোখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে অরুণাংশু বললে, তুমি যা ভেবেছিলে তার কিছুই হয় নি, অনু। বরং সুভদ্রা দেবীর কাছে এবার আমি বিদায় নিয়েই চ'লে এসেছি; ব'লে এসেছি যে, জীবনের টানে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছি আমি।

তার মানে?—অনামিকা সম্মোহিতের মতই অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে অরুণাংশু বললে, তার মানে, তাকে আমি ব'লে এসেছি যে, একদিন যে তাকে ভালবেসেছিলাম, আজ সেই স্মৃতিটুকুই কেবল আমার আছে, ভালবাসা আর নেই।

অনামিকার পাথরের মত শরীরটাও হঠাৎ যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দুটিকে আরও বড় ক'রে প্রায় আর্তনাদের স্বরেই সে বললে, এই তাঁর মুখের উপর তাঁকে ব'লে এসেছেন আপনি?

এমন অরুণাংশু আশা করে নি। অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সে। চোখ দুটিকে নামিয়ে কতকটা কৈফিয়তের স্বরেই সে উত্তর দিলে, না ব'লে আর উপায় ছিল না, অনু। ব্যাপারটা সত্যি ঘোরালো হয়ে উঠছিল। আরও কিছুদিন আগের মত চললে হয়তো দুজনেই নাগপাশে জড়িয়ে পড়তাম। তাই সময় থাকতেই সেই সম্ভাবনার গোড়া কেটে দিয়ে এলাম।

তারপর চোখ তুলে মুখখানাকে আবার হাসবার মত ক'রে সে বললে,

কাজেই, বুঝেছ, অন্থু, তোমার ভবিষ্যৎবাণী সফল হ'ল না, আর সুযোগও রইল না তোমার ঘটকালি করবার।

কিন্তু অনামিকা ও রসিকতায় যোগ দিলে না। একটু হাসলেও না সে। আরও কিছুক্ষণ অভিভূতের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তারপর একটি কথাও না ব'লে অরুণাংশুকে এড়িয়ে খুব জোরে পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

অপ্রতিভ অরুণাংশু আরও বেশি অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসমৃদ্ধ জীবনে এমন আর কোনদিনই হয় নি।

গত দুই মাসের মধ্যে অনামিকার অনেক রূপ সে দেখেছে। কিন্তু আজ ওর যে রূপ তার চোখে পড়ল তা অদৃষ্টপূর্ব। পরিহাস নয়, বিদ্রূপ নয়, উপেক্ষাও নয়,—ও যেন পরিপূর্ণ ঘৃণারই জীবন্ত অভিব্যক্তি।

সুভদ্রার কথাটা অনামিকাকে সে বলেছিল বাহাদুরি করবার জন্য। ভেবেছিল যে, শুনে অনামিকা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যা হ'ল তা তার প্রত্যাশার বিপরীত।

সেদিন সুভদ্রাকে কথাটা শুনিয়ে দেবার পরেও তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আজ অনামিকার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে আঘাত এল, তা গিয়ে লাগল ঠিক ওই দুটি জিনিসেরই গোড়ায়। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, অনামিকার চোখে আজ সে যেন বড় বেশি ছোট হয়ে গিয়েছে। ওরই প্রতিক্রিয়ায় নিজের কাছেও নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল তার।

তার সঙ্কুচিত মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুতাপের ভাবও জেগে উঠল, নিজে থেকে কথাটা অনামিকাকে সে না বললেই পারত।

জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করলে যে, প্রতিপক্ষীয়ের কাছে তার হার হয়েছে; তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে যে আঘাত সে পেয়েছে, তা তার নিজের অনেক বিশ্বাস, ভাল-মন্দের অনেক ধারণাকে শিকড়সুদ্ধ নাড়া দিয়ে তার জীবনের অনেক লাভ-লোকসান, অনেক চাওয়া-পাওয়াকেই যেন একেবারে নিরর্থক ক'রে দিয়েছে।

সে রাত্রে খাওয়ার সময় অনামিকার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'লেও সে তার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলে না।

অনামিকার বুকের মধ্যেও সে রাত্রে ক্রমাগতই যেন ঝড়ের মাতামাতি চলতে লাগল।

সুভদ্রার সম্বন্ধে যে কথাটা অরুণাংশু অত সহজভাবে তাকে শুনিয়ে দিলে, তা তার মোটেই ভাল লাগে নি। ভাল লাগবার কথাও নয়। হিন্দু ঘরের একপত্নীনিষ্ঠ বাপের মেয়ে সে। নারী-পুরুষের ভালবাসা বন্যার মত এসে দুদিন পরেই কর্পূরের মত উড়ে যাবে—এই তত্ত্বটিকেই মন দিয়ে সে স্বীকার করতে পারে না। আগে অরুণাংশুর মুখে বার বার এ কথাটা শুনলেও কোনদিনই ওকে সত্য ব'লে সে মেনে নেয়ও নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অরুণাংশুর সঙ্গে সহজ একটা সম্বন্ধ বজায় রাখতে এতদিন তার দিক থেকে কোন বাধা ওঠে নি। কিন্তু আজ তা-ই উঠল। কারণটা সহজ। এতদিন অরুণাংশু তার কাছে ছিল সুদূরের বিস্ময়; কিন্তু আজ তাকে তার ভাবতে হ'ল নিজেরই ভাবী স্বামী হিসাবে।

তা ছাড়া, অরুণাংশুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠবার পরেও তার নিজের মনে একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সুভদ্রা দেবীকে অরুণাংশু অত বেশি ভালবাসে ব'লেই তাকে বিয়ে করতে সে মোটে রাজীই হবে না। কিন্তু আজ সে অনুভব করলে যে, এর পর তাকে বিয়ে করতে রাজী হওয়া অরুণাংশুর পক্ষে আর অসম্ভব না-ও হতে পারে। সেইজন্যই মনটা তার আরও বিকল হয়ে গেল।

একটি মেয়েকে অমন আত্মহারা হয়ে ভালবাসবার পরেও যে পুরুষ নিতান্ত অকারণে সেই মেয়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে পারে, তাকেই নিজে সে কেমন ক'রে নিজের স্বামী ব'লে বরণ করবে?

একদিন নিজেই সে অরুণাংশুকে শ্মশানচারী শিবের সঙ্গে তুলনা করেছিল; কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন তার মনে হতে লাগল যে, সেই অরুণাংশুই আসলে সত্য-শিব-সুন্দরের জীবন্ত অস্বীকৃতি।

প্রায় সারাটা রাতই থেকে থেকে তার চোখ দুটি জ্বালা ক'রে জলে ভ'রে উঠতে লাগল। কিন্তু চোখের ওই জল কার জন্য,—তার নিজের, সুভদ্রার না অরুণাংশুর জন্য, তা সে কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না।

পরদিন প্রতুলবাবুকে একান্তে পাওয়ামাত্রই অনামিকা তাঁর গা ঘেঁষে ব'সে

বললে, আর কত দিন এখানে থাকবে, বাবা? চল না,—এবার আমরা যাই।

প্রতুলবাবু এমন একটা প্রস্তাবের জন্য তৈরি ছিলেন না ; উত্তরে তিনি শুধু বললেন, অ্যাঁ !

কিন্তু অনামিকা দৃঢ় স্বরেই আবার বললে, হ্যাঁ বাবা, এবার চল। এখানে আর এক দিনও থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।

বিহ্বল প্রতুলবাবু এবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ; বললেন, কেন মা ? কিছু এখানে হয়েছে ?

হবে আবার কি !—ব'লে অনামিকা দূরে স'রে গেল ; সেখান থেকে আবার বললে, আমার থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না, তাই বললাম। আর, হ্যাঁ বাবা—অন্য কোথাও এবার আর যাওয়া হবে না। চল, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।

প্রতুলবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না ; কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু মা, ও কথাটা—মানে, বিয়ের কথাটা কিছুই যে ঠিক হ'ল না।

না-ই বা হ'ল।—অনামিকা ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে, ও কথা ঠিক করবার জন্য আমাকে মাসেব পর মাস এ বাড়িতে থেকে যেতে হবে নাকি ?

ভিতরের রহস্যটা প্রতুলবাবু ধরতে পারলেন না। নানা সম্ভাবনার কথাই তাঁর মনে উঠতে লাগল। তাঁর একবাব মনে হ'ল যে, বিয়ের আগেই ভাবী স্বামীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে কুণ্ঠা বোধ করছে অনামিকা। আর একবার তিনি ভাবলেন যে, অরুণাংশুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করামাত্রই সেই প্রথম দিন অনামিকা যে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, হয়তো সেই অনিচ্ছাই ইতিমধ্যে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন সম্ভাবনাকেই সত্য ব'লে তিনি মেনে নিতে পারলেন না। হতভম্বের মত আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর তিনি চিরদিনের অভ্যাসমত মাথার টাকের উপর হাত বুলাতে বুলাতে অসহায়ের স্বরে বললেন, আচ্ছা মা, আজকালের মধ্যেই ওঁদের সঙ্গে কথা ব'লে দিনক্ষণ আমি ঠিক ক'রে ফেলব।

অরুণাংশুর মনটা খারাপই ছিল। দুপুরে বিছানায় শুয়ে অনেক চেষ্টা ক'রেও সে ঘুমোতে পারলে না। তখন উঠে সোজা সে তার মায়ের ঘরে চ'লে গেল। মহামায়া দেবীর মুখে কোন কথা ফুটবার আগেই সে বললে, কালই আমি কলকাতায় চ'লে যাব, মা। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তো বল। নইলে বুঝব যে আমাকে 'তার' ক'রে নিয়ে আসবার কারণ জানবার জন্য এখানে আমার থাকা নিষ্প্রয়োজন।

মহামায়া দেবী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর সোজা হয়ে ব'সে বললেন, কাল কিছুতেই তোর যাওয়া হবে না। তবে যা তুই জানতে চাচ্ছিস, তা এখনই বলছি। তুই ব'স্ ঠিক হয়ে।

অনেক রকম ভণিতা করবার পর শেষ পর্যন্ত মহামায়া দেবী যখন বললেন যে, তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গিয়েছে, তখন অরুণাংশু কিছুক্ষণ অবাক-বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তারপর হো-হো ক'রে হেসে উঠে সে বললে, বল কি মা,—সব ঠিক ক'রে ফেলেছ? তুচ্ছ বিয়েটাও তা হ'লে শেষ কর নি কেন? তা হ'লেই তো সব গোলমাল চুকে যেত।

কিন্তু মহামায়া দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠাট্টা নয়, বাবা। আমাদের বড় সাধ তোকে সংসারী দেখব। কিন্তু শুধু আমাদের কথাই এ নয়। তোর জন্য যে মেয়ে আমরা বেছে ঠিক করেছি সে হাতছাড়া হয়ে গেলে যে রত্ন তুই হারাবি, তা জীবনে আর ফিরে পাবি নে।

কৌতুক ও কৌতূহলে অরুণাংশুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ভুরু নাচিয়ে সে বললে, কিন্তু কোথায় পেলে তোমাদের সে রত্নটিকে? কে সে?

চোখ ও মুখের বিশেষ একটা ভঙ্গি ক'রে গলার স্বর কয়েক পরদা নীচে নামিয়ে মহামায়া দেবী উত্তর দিলেন, চোখের মাথা খেয়েছিস? সে আমাদের অনু।

কথাটা কাজ করলে মন্ত্রের মত। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে সোজা হয়ে ব'সে অরুণাংশু বললে, কে!

প্রশ্নটা নিরর্থক। উত্তরে মহামায়া দেবী আর একবার অনামিকার নাম ক'রে তার রূপ, গুণ, শিক্ষা ও ঐশ্বর্যের যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে গেলেন তাও তেমনি নিরর্থক। অন্ধকারে চাবি টিপে হঠাৎ খুব তীব্র সন্ধানী আলো ছড়িয়ে

দিলে যেমন হয় কতকটা তেমনি ব্যাপার ঘ'টে গেল অরুণাংশুর চোখের সামনে। এতক্ষণ চোখে যেন তার দৃষ্টিই ছিল না ; 'অন্ধ' কথাটা কানে যেতেই কেবল যে তার অন্ধ চোখে দৃষ্টিই ফিরে এল তা নয়, তার চোখের সামনে অন্ধকার জগৎটাও সেই সঙ্গে আলোয় আলোময় হয়ে গেল। সেই উজ্জ্বল আলোকে জীবন্ত অনামিকাকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে,—দূরে নয়, বাইরেও নয়, একেবারে তার নিজের বুকের মধ্যে।

তার নিজের মনেরই সুদূরতম ও নিবিড়তম গহনে চেতন চিত্তের অগোচরে গত দুই মাস ধ'রে যৌবনের শিল্পীদেবতার যে বিচিত্র শিল্পকার্য চলেছে, তারই সম্পূর্ণ রূপটা এখন এক নিমেষেই তার চোখের সামনে ধরা প'ড়ে গেল। সে বুঝলে যে অনামিকা তার অগোচরেই তার মনটাকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে নিয়েছে,—তার হৃদয়ের সিংহাসনে গিয়ে বসেছে রাজরাণীর মহিমময়ী মূর্তিতে। তার নিজের মনের গত দুই মাসের ইতিহাসের মধ্যে কোথাও আর কোন অস্পষ্টতা রইল না। হঠাৎ একদিন নিজের বুকের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রেও সুভদ্রাকে কেন যে সে খুঁজে পায় নি, তা আজ এক নিমেষেই বুঝতে পারলে সে। বুঝলে যে, সুভদ্রার ওই আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারটা কার্যকারণ সম্বন্ধহীন প্রকৃতির উদ্ভট একটা খেয়াল মাত্র নয়,—এই অনামিকাই সুভদ্রাকে তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গাটা নিজে দখল ক'রে নিয়েছে। সে আরও বুঝলে যে, সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর মতই নিজে সে গত দুই মাস কাল এই অনামিকার আকর্ষণেই এরই চারিদিকে অন্ধের মত ঘুরে বেড়িয়েছে,—আকাশের চাঁদের টানে সমুদ্রের মত এই অনামিকার টানেই তার নিজের বুকের মধ্যে অত সব দুর্বোধ্য আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গের মত ফুলে ফুলে উঠেছে, এই অনামিকাকে জয় করবার উদ্দেশ্যেই নিজে সে ময়ূরের মত পেখম তুলে ওর কাছে কাছে নেচে বেড়িয়েছে, নিজের কীর্তি ও অকীর্তির নানা কাহিনী তাকে শুনিয়ে একটি সসম্ভ্রম সস্মিত দৃষ্টি, একটু হাসি, সমর্থনের দুটি একটি কথার জন্য সতৃষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

সেই অনামিকারই সঙ্গে তার বিয়ে! নিজের মুখের ছোট্ট একটি সম্মতির

বিনিময়েই সেই অনামিকাকে সে একান্তভাবে চিরদিনের জন্য লাভ করতে পারবে।

কিন্তু নিশ্চিত প্রাপ্তির উল্লাসে তার হৃৎপিণ্ডটা সতেজে একবার লাফিয়ে উঠেই হঠাৎ যেন একেবারে অসাড় হয়ে গেল। পাওয়ার ব্যাপারটা এক তরফা কারবার নয়। অন্ততঃ অরুণাংশুর যা জীবনধর্ম তার মূলনীতি এক তরফা দাবির জোরে কোন নারীকেই আত্মসাৎ করবার অধিকার স্বীকার করে না, বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিত্তিম দিয়েও নয়। কাজেই অনামিকাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নিজে সে সচেতন হয়ে উঠবার পরের মুহূর্তেই যে কথাটা তার মনে উঠল তা এই যে, এ সম্বন্ধে তার নিজের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবলই হউক না কেন, ওই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য অনামিকার তরফ থেকে আত্মদানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা থাকা চাই। অথচ নিজের অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কিছুরই সন্ধান সে পেলে না, যাকে আশ্রয় ক'রে মন তার বিন্দুমাত্রও উৎসাহ বোধ করতে পারে। বরং অনামিকার অতীত আচরণ স্মরণ ক'রে সন্দেহই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল যে, অনামিকা তাকে নিয়ে আর যা-ই করুক না কেন, তাকে স্বীয় অন্তরের সশ্রদ্ধ ভালবাসা দিয়ে প্রিয়তম ব'লে কিছুতেই বরণ করবে না।

আগের সন্ধ্যায় তারই মুখ থেকে সুভদ্রার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির কথা শুনে অনামিকা যে ভাবে তার সান্নিধ্য এড়িয়ে দূরে স'রে গিয়েছিল, বিশেষ ক'রে সেই কথা স্মরণ ক'রেই অরুণাংশু অনামিকার সম্মতি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল।

তাই কিছুক্ষণ পর মহামায়া দেবী আবার যখন তার মুখের দিকে চেয়ে তারই সম্মতির জন্য তাকে অনুরোধ করতে আরম্ভ করলেন, তখন হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে অরুণাংশু বেশ জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, মা, এ হতে পারে না; কিছুতেই না।

মহামায়া দেবী বিস্মিত হয়ে বললেন, কি হতে পারে না?

এই বিয়ে।

কেন?

অনুর এতে মত হবে না।—ব'লে অরুণাংশু মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মহামায়া দেবীর ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল। তাঁর মনে প'ড়ে গেল যে, সেদিন অনামিকাও ঠিক এই রকমের কথাই বলেছিল, এ বিয়েতে অরুণাংশুর মত হবে না। বেশ একটু কৌতুক বোধ হ'ল তাঁর, নূতন যৌবনের ধর্মই এই! ভীরুতা আর সংশয়, এই দুইই তো পূর্বরাগের দুই সুমধুর নিদর্শন!

ঠোঁট বেঁকিয়ে তিনি বললেন, কি যে বলিস তুই!

কিন্তু অরুণাংশু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, বলাবলির কথা নয়। আমি ঠিক জানি যে, তার মত হবে না।

ছাই জানিস!—মহামায়া দেবীও একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, তার মত না নিয়েই কি—

কি!—ব'লে অরুণাংশু আবার সোজা হয়ে বসল।

মহামায়া দেবী আবার হেসে ফেললেন; বললেন, অনুকে জিজ্ঞেস না ক'রেই কি এ কথা তোকে বলছি? সে মত দিয়েছে।

দু-তিন সেকেণ্ড কাল অরুণাংশুর মুখে কোন কথাই ফুটল না; কিন্তু তার পর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝেঁকে বললে, অসম্ভব, এ হতেই পারে না। হয় তুমি মিছে কথা বলছ, নয় তো শুনতে ভুল করেছ তোমরা।

মহামায়া দেবীর মুখের হাসি আবার নিবে গেল; বেশ একটু বিরক্ত হয়েই তিনি বললেন, আমরা কি কানা, না কালা? আচ্ছা, আমার কথা যদি তোর বিশ্বাস না-ই হয় তো অনুকে তুই নিজেই জিজ্ঞেস কর্ না। সে তো বাড়িতেই আছে।

না!—অরুণাংশু আরও উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলে, জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার নেই। আমি ঠিক জানি যে, বিয়েতে তার মত হবে না।—ব'লেই ঘর থেকেই সে বের হয়ে গেল।

কিন্তু মায়ের প্রস্তাবটাকে তখন অমন রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত অনামিকাকে কথাটা সে জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলে না। পরদিন মধ্যাহ্নে নিজেই সে অনামিকার ঘরে গিয়ে তাকে বললে, এঁরা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার মতলব আঁটছেন। এ খবর তুমি জান, অনু?

অনামিকা কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, জানি।

শুধু জানা নয়।—অরুণাংশু উত্তেজিত হ'য়ে বললে, মা বলছেন যে, তুমি নিজেই নাকি এ বিয়েতে মত দিয়েছ!

এরও উত্তরে অনামিকা মৃদু স্বরে বললে, তা ঠিক।

কি! অরুণাংশু আরও উত্তেজিত স্বরে বললে, সত্যি এতে মত আছে তোমার?

অনমিকা চকিতে একবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়েই পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে নিলে; তারপর মৃদু স্বরে বললে, আমার অমত নেই।

কিন্তু তার পরেই শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে বেশ সহজভাবেই অনামিকা আবার বললে, আপনার প্রশ্নের উত্তর তো আপনি পেয়েছেন। এবার পথ ছাড়ুন, আমি যাই।

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত দোরের কাছ থেকে স'রে দাঁড়াল; কিন্তু অনামিকা দোর পর্যন্ত এগিয়ে যাবার আগেই সে শুষ্ক কণ্ঠে বললে, ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হয় নি, অনু। এ রকম একটা ব্যাপারে অমত না থাকাটাই তো সব নয়,—ইতির ঘরেও তো কিছু থাকা চাই

অনামিকা দোরের কাছে থমকে দাঁড়াল; কিন্তু মুখ না ফিরিয়েই মৃদু স্বরে সে বললে, কি আর থাকবে!

চিরকালই যার মুখে কথার খই ফুটেছে, সেই অরুণাংশুই আজ বার দুই ঢোক গেলবার অবসরে থেমে থেমে বললে, বিয়ের মত একটা ব্যাপারে অমত না থাকাটাই সব নয়, সম্মতির চেয়েও বড় আরও একটা জিনিস চাই। এঁদের কথামত বিয়ে আমাদের হয়ে গেলেই তুমি কি, মানে—এই ধর, আমি যদি তোমায় ভাল—মানে, ভাল না বাসি?

কিন্তু অনামিকা হঠাৎ তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে; বললে, তাতেই বা ক্ষতি কি? আপনিই তো বলেন যে, বিয়ের জন্য ও জিনিসটার মোটে কোন দরকারই নেই।

এর কোন উত্তর অরুণাংশুর মুখে ফুটল না। তাকে ঐ অবস্থায় রেখে কখন যে অনামিকা ঘর থেকে বের হয়ে গেল, তাও যেন সে জানতে পারলে না। কিন্তু সেই দিনই রাত্রে মহামায়া দেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে সে সংকল্পের

দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিলে যে, এ বিয়েতে অনামিকা মত দিয়ে থাকলেও নিজে সে কিছুতেই মত দেবে না।

যাকে সে বেশ একটু ভয়ও দেখিয়ে দিলে,—তার অমত সত্ত্বেও তাঁরা যদি এ ব্যাপারে আরও বেশি অগ্রসর হন, তবে শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই অপদস্থ হতে হবে।

স্ত্রীর মুখ থেকে মোটামুটি কথাটা শুনবার পর রমেনবাবু সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, এ আমি আগেই জানতাম, বানরের গলায় মুক্তোর হার শোভা পায় না।

মহামায়া দেবীর মনটাও দ'মে গিয়েছিল; তবু আর একজনের সন্তানের সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে স্বামীর মুখের অমন মর্মান্তিক মন্তব্যটাকে মুখ বুজে তিনি মেনেও নিতে পারলেন না। মুখ ভার ক'রে তিনি বললেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কথা,—রুণুকে কোন দিনই তো ভাল চোখে দেখ নি তুমি।

উত্তরে রমেনবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যা খুশি বলতে পার। তবে আমি নিজে সব জেনেশুনেও অমুর মত মেয়েকে ওই বাঁদরটার হাতে সঁপে দেবার জন্য তার বাপের উপর চাপ দিতে পারব না।

তা হ'লে এ বিয়ে তুমি ভেঙে দিতে চাচ্ছ?

আমি ভেঙে দিতে চাচ্ছি নে, অরুণ নিজেই ভেঙে দিয়েছে।

না, দেয় নি। আর দিতে সে পারবেও না। আমি ঠিক জানি যে, এ বিয়ে প্রজাপতির নির্বন্ধ, এ বিয়ে হবেই।

হয় যদি, তাতে তোমার চেয়ে কম খুশি হব না আমি। তবে আপাতত এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হতে পারবে না। আর ওঁদের আমি এখানে ধ'রেও রাখতে পারব না। ওঁরা যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধ'রে মহামায়া দেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন; তার পর বললেন, বেশ, আমিও ওদের আটকে রাখতে চাই নে। কিন্তু আর একটা কথা তোমায় আমি বলব, রাখবে?

রমেনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, কি?

চল, আমরাও কলকাতায় যাই।—মহামায়া দেবী উত্তর দিলেন, প্রতুল-ঠাকুরপোর বাড়ির কাছাকাছি কোন একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সকলে মিলে সেখানে আমরা থাকব। রুণু তো কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করবে বলেছে, তাকে হাইকোর্টে ঢুকিয়ে দিয়ে অনুর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে, ওদের ঘরসংসার পেতে দিয়ে তবে আমরা এখানে ফিরে আসব।

রমেনবাবু পাকা লোক, স্ত্রীর উদ্দেশ্যটা চট ক'রেই তিনি ধ'রে ফেললেন। একমাত্র সন্তানকে সংসারী করবার জন্য স্ত্রীর এই ব্যাকুলতা তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, মরীচিকার পেছনে কত আর ঘুরতে চাও তুমি? এতে দুঃখ তো কেবল বাড়বেই।

মহামায়া দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন, গাঢ় স্বরে বললেন, সে আমি বুঝব 'খন। এখন শুধু এইটুকু কর তুমি, দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতায় চল। এখানেও তো রাতদিন ব'সেই থাক, দু-চার-ছ মাস কলকাতায় গিয়ে থাকলে তোমার কোন লোকসান হবে না।

রমেনবাবুকে মত দিতে হ'ল, শুধু কলকাতায় যাবার জন্যই নয়, এ দিকের অবাঞ্ছিত পরিণতিটা প্রতুলবাবুর কাছ থেকে গোপন রাখবার জন্যও। মহামায়া দেবীও সুকৌশলে ব্যাপারটাকে গুছিয়ে নিলেন। প্রতুলবাবুকে সোজাসুজি 'বেয়াই' ডেকে বসলেন। বললেন, কথা আমাদের পাকাই হয়ে থাকল, বেয়াই; তবু পাকা কথা এখানে হবে না। মেয়েকে আমি গিয়ে আশীর্বাদ করব মেয়ের নিজের বাড়িতেই; আর সেখানেই আমাদের পাকা কথা হবে। দেনা-পাওনা সম্বন্ধেও একটা বোঝাপড়া হওয়া চাই তো।—বলতে বলতে তাঁর চোখের দৃষ্টি ও ঠোঁটের হাসি রীতিমত কুটিল হয়ে উঠল।

ওতেই প্রতুলবাবুর কাছে অবস্থাটা সহজ হয়ে গেল; হো-হো ক'রে হেসে উঠে তিনি বললেন, বলেন কি, বউদি? শেষে আপনার দাবি মেটাতে আমার ভিটে-মাটি পর্যন্ত উচ্ছন্ন যাবে না তো?

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে মহামায়া দেবী উত্তর দিলেন, যেতেও পারে, মেয়ের বাপ যখন হয়েছেন।

তারপর সহজভাবেই তিনি আবার বললেন, কিন্তু ঠাকুরপো, আমাদের জন্য

আপনার বাড়ির কাছাকাছি একটি ভাল ছোট বাড়ি আপনাকে ভাড়া ক'রে দিতে হবে।

প্রতুলবাবু রাজি হয়ে গেলেন। ওই এলাহাবাদেই মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে পাকা কথা যে তাঁকে দিতে হ'ল না, এই উল্লাসেই মহামায়া দেবীর প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই তিনি নির্বিচারে সায় দিয়ে গেলেন।

কিন্তু কলকাতায় ফেরবার পর ওদের ফরমাশমত বাড়ি খোঁজবার জন্য তিনি কোন চেষ্টাই করলেন না।

কারণ অনেক। কথাটা ওদিকে যতই এগিয়ে থাকুক না কেন, অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে তিনি মোটেই কোন উৎসাহ বোধ করছিলেন না। গোড়া থেকেই তাঁর নিজের মনের মধ্যে খুঁত খুঁত ভাব একটা ছিলই। তার উপর অনামিকার মনটাও তিনি যেন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিলেন না,—তার মুখের সম্মতির সঙ্গে তার ব্যবহারের সামঞ্জস্য তিনি দেখতে পান নি। শেষের দিকে অরুণাংশুর মনের ভাব সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। কাজেই এলাহাবাদে মহামায়ী দেবীকে তিনি কথা দিয়ে কলকাতায় ফেরবার পর প্রথম কয়েক দিন তিনি নিশ্চেষ্ট হয়েই ছিলেন।

কিন্তু তাগিদ এল এলাহাবাদ থেকে। প্রথমে চিঠি এল ; তারপর আসতে লাগল 'তার'। সুতরাং অনিচ্ছা, এমন কি, অনির্দিষ্ট একটা আশঙ্কা মনে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বাড়ি তাঁকে খুজতে হ'ল ; একটা বাড়ি তিনি ঠিকও ক'রে ফেললেন। নিজের বাড়ির ঠাকুর-চাকরের মারফতে জন-দুই চাকরও ঠিক ক'রে নূতন বাড়ি গোছগাছ করতে লাগিয়ে দিলেন। তারপর এলাহাবাদে একটা 'তার' ক'রে দিয়ে তিনি অতিথিদের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার পর অরুণাংশু একেলা তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল।

কলকাতায় অরুণাংশু একাই এসেছিল, আর তা-ও দিন সাতেক আগে।

এলাহাবাদ থেকে আসার সময় মহামায়া দেবী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কলকাতায় গিয়ে অন্নুদের ওখানেই উঠবি তো?

অরুণাংশু খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, না।

ওঠেও নি সে। হাওড়া স্টেশন থেকে সে সোজা গিয়ে উঠেছিল তাদের পার্টির আপিসে।

তথাপি শেষ পর্যন্ত বালিগঞ্জে ওই 'অনু'দের বাড়িতেই তাকে আসতে হ'ল। কারণ গরজ তার নিজের।

কিন্তু সে ওখানে আসতেই বাড়িতে একটা হৈ হৈ প'ড়ে গেল। নীচের বসবার ঘরে প্রতুলবাবু তখন অনামিকার সঙ্গে গল্প করছিলেন। অরুণাংশুকে দেখেই অনামিকা সচকিত বিস্ময়ে একবার 'অরুণদা' ব'লেই কুণ্ঠিতভাবে উঠে দাঁড়াল; প্রতুলবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে প্রায় একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তুললেন।

এ কি কাণ্ড! কখন এলে তুমি? ওঁরাও এসেছেন তো? কি আশ্চর্য! লাগেজ-টাগেজ—ওরে কালাচাঁদ—আঃ, বেয়ারাগুলো গেল কোথায় সব?—ও অনু, দেখ না বাইরে গিয়ে—

দেখছি।—ব'লে ধীরপদক্ষেপে অনামিকা বারান্দার দিকে চ'লে গেল।

এ দিকে অরুণাংশু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাকাবাবু, আর কেউ আসে নি,—আমার সঙ্গেও কোন লাগেজ নেই। আমি কলকাতায় এসেছি হপ্তাখানেক আগে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, কাকাবাবু। আজ এখানে বেড়াতে এলাম—মানে, এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম কি না! আমি উঠেছি আমাদের পার্টির আপিসে।

পার্টির আপিসে?—সে কি কথা? আমার বাড়ি থাকতে—

নিজের খুব জরুরি কাজ আছে কিনা, ওখানে থাকলেই কাজের সুবিধে। তাই—

কৈফিয়তের পর অভিবাদন-আশীর্বাদের পালা। তাতেও মিনিট পাঁচেক কাটল। তারপর এক সময়ে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে প্রতুলবাবু ব'লে উঠলেন, অনু—ও অনু,—কোথায় গেলে তুমি? অরুণকে একটু চা দিতে হয় যে—

ঠিক আগের মতই ধীর পদক্ষেপে অনামিকা ঘরে এসে প্রবেশ করলে;

শান্ত কণ্ঠে বললে, চা নয়, বাবা,—ওঁর তো চা খাওয়া বারণ। আমি ঘোলের শরবত আনছি।

একটু পরে নিজেই শরবত নিয়ে এল সে। ততক্ষণে অরুণাংশুর সঙ্গে প্রতুলবাবু রাজনৈতিক আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন। ঠিক আলোচনা বলা চলে না, বক্তৃতা। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে অরুণাংশুকে দু-একটা প্রশ্ন ক'রে শেষে তিনি নিজেই বক্তা হয়ে উঠলেন। অরুণাংশু কখনও ছোটখাটো দু-একটি মন্তব্য, কখনও দু-একটি প্রতিপ্রশ্ন ক'রে, আর কখনও বা কেবল ঘাড় নেড়েই শুধু তাল রেখে চলল। অনামিকা কিছুই বললে না। একটু দূরে চুপ ক'রে কেবল সে কখনও প্রতুলবাবুরও কখনও অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

তার এমনি একটা চাউনি এক সময়ে প্রতুলবাবুর চোখে প'ড়ে গেল। সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে কি একটা কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, অনামিকা একদৃষ্টে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। অবশ্য পিতার দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনামিকা চোখ সরিয়ে নিলে; প্রতুলবাবুও নিজের কথাটা শেষ করলেন, যেন কিছুই হয় নি। তবু ওইটুকুতেই তাল কেটে গেল। প্রতুলবাবুর মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে, অরুণাংশু ও অনামিকাকে নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি আবার একটা অবিবেচনার কাজ ক'রে ফেলেছেন।

তাই মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ আলোচনা বন্ধ ক'রে পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে ওরই দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন, আমার হাতে বড্ড জরুরি একটা কাজ রয়েছে, অরুণ। সেটা আজ রাত্রেই শেষ না করলেই নয়।

অরুণাংশু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু তার মুখে কোন উত্তর ফুটবার আগেই অনামিকা বললে, তুমি যাও না, বাবা, অরুণদা তো এখান থেকে খেয়ে যাবেন; কাজেই তোমার কাজ সারবার পরেও কথা বলবার অনেক সময় তুমি পাবে।

প্রতুলবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে ব'লে উঠলেন, তা বই কি—ঠিকই তো! না

খেয়ে কি অরুণের যাওয়া হতে পারে।—তা বোস তুমি, বাবা,—আমি চট ক'রে কাজটা সেরে আসি।

কিন্তু অরুণাংশু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আমারও যে কাজ আছে, কাকাবাবু।

উত্তর দিলে অনামিকা, আমাদের বেশি দেরি হবে না। আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

প্রতুলবাবু বের হয়ে যাবার পর সে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এবার এসে আমাদের এখানে উঠলেন না যে?

একটু যেন ইতস্তত করলে অরুণাংশু; তার পর সোফার উপর সোজা হয়ে ব'সে নিজেও সে হেসেই উত্তর দিলে, কারণটা সত্যি জানতে চাও তুমি?

না চাইলে আর জিজ্ঞেস করব কেন?—অনামিকাও মুখের হাসি বজায় রেখেই উত্তর দিলে।

কিন্তু অরুণাংশু আর হাসলে না; একটু চুপ ক'রে থেকে অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে সে বললে, সেদিন এলাহাবাদে কথাটা তো আমাদের শেষ হতে পাবে নি, তাই শেষ করতে চাই। দেখতেই তো পাচ্ছ যে, এরা পাঞ্জাব মেলের বেগে এগিয়ে চলেছেন। কাজেই আমাদের বোঝাপড়াটা আর তো ফেলে রাখা যায় না।

অনামিকা প্রথমে বোধ করি কথাটা ধরতে পারে নি, কিন্তু শেষের দিকে বুঝতে পেরে মুখ লাল ক'রে চোখ নামিয়ে নিলে সে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, বোঝাপড়া আবার কিসের?

অরুণাংশু আবার বললে, সেদিন কথাটা তো শেষ হয় ।ন।

কিন্তু আমার হয়েছে,—অনামিকা উত্তরে বললে,—আমার যা বলবার ছিল সব বলেছি আমি। আর কিছু আমার বলবার নেই।

অরুণাংশুর মুখ ম্লান হয়ে গেল; ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে সে বললে, তা যদি হয় তো আমার মনে হয় যে, ওইটুকুর উপব নির্ভর ক'রে আমাদের বিয়ে হতে পারে না।

অনামিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, বেশ তো—ভেঙে দিন।

খুব স্পষ্ট উক্তি। স্বর মৃদু, কিন্তু ওতে জড়তা একটুও নেই। কথাটা যেন তীরের মত অরুণাংশুর বুকে গিয়ে ফুটল। চমকে সোজা হয়ে বসল সে।

কিন্তু চেষ্টা ক'রেও অনামিকার মুখখানা সে ভাল দেখতে পেলে না। আহত বিবর্ণমুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর আবার মুখখানাকে হাসবার মত ক'রে সে বললে, আমি তো তাই চাচ্ছি; কিন্তু ফল হচ্ছে কোথায়?

আপনি বললেই হবে, অনামিকা আগের মতই মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপনার অমতে কিছুই তো হ'তে পারবে না।

কিন্তু হচ্ছে,—অরুণাংশু উত্তরে বললে,—আমার মতামতের জন্য কিছুই আটকাচ্ছে না। এঁরা এঁদের পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়েই চলেছেন, কারণ এঁরা আশা পেয়েছেন তোমার কাছ থেকে। কাজেই এদের গতি রোধ করবার জন্তে যা করবার তা তোমাকেই করতে হবে,—কথাটা বলতে হবে তোমাকেই।

আমার যা বলবার তা আমি বলেছি।

তা হ'লে সেটা এখন উল্টাতে হবে।

তা আমি পারব না।

কেন?

নিজের মুখের কথা নিজে আমি পাল্টাতে পারি নে।

কিন্তু সে তো তোমার মনের কথা নয়। তুমি কথা দিয়েছ এঁদের চাপে প'ড়ে।

তা হ'লেও সে আমারই মুখের কথা। তা অস্বীকার করবার সাধ্য আমার নেই।

অরুণাংশু থ হয়ে গেল। অনামিকাকে আগেও তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, কিন্তু আজ তাকে সে একেবারেই বুঝতে পারলে না। বলবার মত কোন কথাও ভেবে পেলে না সে। বলবার দরকারও হ'ল না। একটু পরেই অনামিকা উঠে দাঁড়িয়ে ঠিক তার চোখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃঢ় স্বরে বললে, দেখুন, আপনার বাপ-মায়ের সঙ্গে আপনি যেমন খুশি তেমনি ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু আমার বাপের মনে আমি ব্যথা দিতে পারব না। তবে এ কথাও আপনি ঠিক জানবেন যে, এ বিয়েতে আপনার মত যদি না থাকে, তবে আমাদের তরফ থেকে কোন রকমেই আপনাকে বিব্রত করা হবে না।

ব'লেই অরুণাংশুকে একেলা রেখেই সে পরদা ঠেলে ভিতরে চ'লে গেল।

আধঘণ্টাখানেক পর প্রতুলবাবু ঘরে ঢুকে অরুণাংশুকে শুষ্ক বিমর্ষ মুখে একা সোফার উপর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে বিস্মিত এবং বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই ব'লে উঠলেন, এ কি, অরুণ,—তুমি একা ব'সে যে? অনু কোথায়?

অরুণাংশু প্রথমে চমকে উঠেছিল, পরে কুণ্ঠিত হয়ে সে বললে, বোধ হয় ভিতরে গিয়েছে—এই অল্প একটু আগে।

তোমায় একা ফেলে?

খুব বেশিক্ষণ তো নয়, কাকাবাবু,—এতক্ষণ এখানেই ছিল সে; গিয়েছে মাত্র মিনিট—

না, না, এ তার ভারি অন্যায়।—প্রতুলবাবু কথার মাঝখানেই ব'লে উঠলেন; তারপর সুর চড়িয়ে ডাকতে শুরু ক'রে দিলেন,—অনু, অনু,—কোথায় গেলে তুমি?—ও অনু—

ভিতর থেকে সাড়া এল, এই যাই, বাবা।—একটু পরেই অনামিকা পরদা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল।

যে গিয়েছিল সে নয়,—একেবারে আর এক অনামিকা। নিঃসঙ্কোচ কুণ্ঠাহীন ভাব; গাছ-কোমর ক'রে কাপড় পরা; ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি একটু হাসির রেশ। হলুদের ছোপ-লাগা পরিষ্কার একখানি তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বাপের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, আমায় ডাকছিলে, বাবা?

হ্যাঁ, মা,—ডাকছিলাম বই কি!—প্রতুলবাবু উত্তেজিত স্বরেই বললেন,—কোথায় ছিলে তুমি?

অনামিকা হাসিমুখেই উত্তর দিলে, আমি ছিলাম রান্নাঘরে,—রাঁধছিলাম।

রাঁধছিলে?

বাঃ রে! রাঁধতে হবে না? বাড়িতে অতিথি রয়েছেন,—সব কি ঠাকুরের হাতে ফেলে রাখা চলে?

যুক্তিটি দুর্বল নয়। প্রতুলবাবু বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখখানা একবার দেখে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, তা হ'লেও—অরুণকে

একেবারে একা ফেলে চ'লে যাওয়াটা ঠিক হয় নি তোমার। অন্তত আমায় তো ডেকে দিয়ে যেতে পারতে!

এরও উত্তরে অনামিকা অকুণ্ঠিত স্বরেই বললে, তুমি কাজ করছিলে কি না, তাই তোমায় ডাকি নি। তা এখন তোমার কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো তোমরা দুজনে গল্প কর,—আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে আসি।

তার পর সহাস্য মুখখানি অরুণাংশুর দিকে ফিরিয়ে সকৌতুক কণ্ঠে সে আবার বললে, ছানার ডালনাটা আমি নিজের হাতে রাঁধছি। কেমন হয়েছে, খেয়ে বলতে হবে আপনাকে।

অরুণাংশুর কণ্ঠে উত্তর ফুটল না,—অনামিকার কথার তো নয়ই, পরে প্রতুলবাবুর কথারও নয়। খাওয়ার সময় এবং খাওয়ার পরে কারও মুখের দিকে ভাল ক'রে সে তাকাতেও পারলে না। মনটা তার সেই যে ভেঙে পড়েছিল, তারপর কিছুতেই আর জোড়া লাগল না। যে কথা অনামিকাকে সে বলতে এসেছিল তার অনেক কথাই যেমন তার বলা হ'ল না, তেমনি যে কথা শুনবার আশা তার ছিল তাও শুনতে পেলে না সে। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার সময় সে না নিয়ে যেতে পারলে অবিসংবাদিত বিজয়ের উন্মত্ত উল্লাস, না স্বীকৃত পরাজয়ের কঠিন সন্তোষ।

পথে রিক্‌শা গাড়িটার মধ্যে চুপ ক'রে ব'সে কেবলই তার মনে হতে লাগল যে, সে যেন একটা অদৃশ্য অথচ দুশ্ছেদ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে,—তার নিজের বাপ-মা, প্রতুলবাবু, অনামিকা আর সকলের উপরে তার নিজের মনেরই একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগতই তার চারিদিকে ওই জাল বুনে চলেছে, সে জাল ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করবার সাধ্য তার নেই।

২

বিয়ে সম্বন্ধে অরুণাংশু তার মন ঠিক ক'রতে না পারলেও যথাসময়ে রমেনবাবু ও মহামায়া দেবী প্রায় আধ ডজন ঝি-চাকর এবং পর্বতপ্রমাণ লটবহর সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বাসা-বাড়িতে তাঁদের সংসার জ'মে উঠল; অরুণাংশুকেও শেষ পর্যন্ত সেখানেই আসতে হ'ল।

কিন্তু সংস্কার জ'মে উঠলেও বিয়ের প্রস্তাবটা তেমন অগ্রসর হ'ল না,—অন্তত মহামায়ী দেবীর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নিশ্চয়ই নয়।

তার কারণ রমেনবাবু নিজে। একদিন প্রতুলবাবুকে একলা পেয়ে কথা-প্রসঙ্গে মনের কথাটা তাঁকে তিনি ব'লেই ফেললেন, দেখ, প্রতুল, তোমার বউদি যা-ই বলুন না কেন, আমি তাড়াহুড়ো ক'রে কিছুই হ'তে দেব না। অনুমাকে আমি ভালবাসি, আর নিজের ছেলেকেও আমি চিনি।

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন—এ যে তাঁরই মনের কথার প্রতিধ্বনি! অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকার বিয়ের প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কোন দিনই তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি;—ইদানীং তো সেটা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর একটা বিভীষিকা। অনামিকাকে তিনি যেন বুঝতেই পারছিলেন না,—অরুণাংশুকেও নয়। সেদিন রাত্রে তাঁর নিজের বাড়িতেই যা তিনি চোখে দেখেছিলেন তা তাঁর মোটেই ভাল লাগে নি। তার পর অরুণাংশু আর তাঁদের বাড়িতে যায় নি। অনামিকাও তার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ, এমন কি, কৌতূহলও প্রকাশ করে নি। শেষের দিকে পাশাপাশি দুখানা বাড়িতে বাস ক'রেও ওরা দুজনে যেন দুজনকে এড়িয়েই চলছিল। এ রকম অবস্থায় অরুণাংশুর সঙ্গে অনামিকাকে বিয়ের মন্ত্র দিয়ে বেঁধে দেবার কল্পনাকে তিনি যেমন আমল দিতে পারছিলেন না, তেমনি বিয়েটাকে বন্ধ ক'রে দেবার কোন উপায়ও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কাজেই বিয়েটা একেবারে বন্ধ করা না হ'লেও আপাতত স্থগিত রাখবার প্রস্তাবটা খোদ রমেনবাবুর মুখ থেকে শুনে প্রথমে প্রতুলবাবু নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

তারপর রীতিমত উৎফুল্ল হয়েই বললেন, আমিও তা-ই বলি, রমেনদা,—মানে, বিয়ের মত একটা ব্যাপারে তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু এ কথা শুনে রমেনবাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল; প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমার মনেও একটা ইতস্তত ভাব রয়েছে, না?

প্রতুলবাবু কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ; বললেন, ঠিক তা নয়, রমেনদা,—তবে মুশকিল কি হয়েছে, জান ? ওই অনুর মনটাই আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।

অনু !—বলতে বলতে রমেনবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—অনুর মনটা বুঝতে পারছ না তুমি ? কিন্তু উনি—মানে, তোমার বউদি যে, বলছিলেন যে, অনু নাকি তাঁর কাছে সম্মতি জানিয়েছে,—তোমাকেও বলেছে ?

তাই তো বলেছিল,—বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলেছিল।

তবে ?

তবে—এখন আমার মনে হচ্ছে,—মানে, কিছু আমি বুঝতেই পারছি নে, রমেনদা।

রমেনবাবু আর কোনও কথা বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখখানা অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে উঠল।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিতান্ত অসহায়ের মতই প্রতুলবাবুই আবার বললেন, কি বিপদেই যে আমি পড়েছি, রমেনদা, রাতে ভাল ঘুম পর্যন্ত হয় না। ইদানীং মাঝে মাঝে আমার কি মনে হচ্ছে, জান। মনে হচ্ছে যে, বেশ ছিল আমাদের আমলে,—ছোট থাকতেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, বাপ-মা'রাই সব ঠিক ক'রে দিতেন, কাঁচা বয়সের দুটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে জীবনের সাথী হিসাবে পেয়ে খুব সহজেই পরস্পরকে ভালও বাসত। কিন্তু একালে বাপমায়ের ভাবনার আর সীমা নেই। এই আমাদের অনু আর অরুণের কথাই ধর না কেন। ওদের দুজনেরই বয়স হয়েছে, দুজনেই লেখা-পড়া শিখেছে, দুজনেরই পরিণত হয়েছে ওই যাকে বলে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। ওদের অমতে ওদের বিয়ে দেওয়া যায় না ; অথচ কি যে ওদের সত্যিকারের মত তা-ও জানা সহজ নয়। তরুণ চিত্তের অপার রহস্য বাইরে থেকে আমরা কেমন ক'রে জানব ? আর জানলেও কতটুকু জানব আমরা ?

রমেনবাবু উত্তরে শুধু বললেন, হুঁ। সেটা সম্মতি, না অসম্মতি তা বোঝাই গেল না।

একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, সেইজন্যই আমি বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, রমেনদা। মা-মরা ওই একটিমাত্র মেয়ে, দায় তো আমার কম নয়। তাড়াতাড়ি কিছু করতে সাহস হচ্ছে না আমার।

রমেনবাবু আবার ন'ড়ে বসলেন; তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, না, প্রতুল; আমিও তাড়াতাড়ি করব না। অরুকে আমিও তো ভালবাসি, আমা দ্বারা তার কোনও অনিষ্ট হবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, তুমি ভেবো না, প্রতুল। তোমার বউদির কথা আলাদা, কিন্তু আমি যে বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছি তা অরুণের বিয়ে দেবার জন্য নয়, তোমার সাহায্যে ওকে হাইকোর্টে ঢুকিয়ে দিতে। শুধু সেইটুকু যদি তুমি করতে পার, তা হ'লেই এবারের মত আমার সাধ মিটবে।

প্রতুলবাবু একটু বিব্রত হয়েই বললেন, কেন রমেনদা, এ কথা কেন বলছ? পরশুও তো অরুণ আমায় হাইকোর্টের কথা জিজ্ঞেস করছিল। এর মধ্যে আবার কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

না, তা হয় নি।—রমেনবাবু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন; তারপর মুখখানি হাসবার মত ক'রে আবার বললেন, তবে ওর সম্বন্ধে কোন কথাই আমার বিশ্বাস হয় না, ওর অতীতটা তো তেমন ভাল নয়।

প্রতুলবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল; উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

কিন্তু রমেনবাবু ন'ড়ে-চ'ড়ে সোজা হয়ে বসলেন; তারপর প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ম্লান মতন একটু হেসে নিজেই আবার বললেন, ওর সম্বন্ধে সব কথা তুমি তো জান না, প্রতুল,—ও যে কি, কি যে ও চায়, আমি ওর বাপ হয়েও এতদিনেও তা বুঝতে পারি নি। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ওর একেবারেই নেই। ছেলেবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্রবে গিয়ে ও হয়ে উঠেছিল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ; প্রাতঃস্নান, নিরামিষাহার, পূজা-অর্চনা, এমন কি, ধ্যানধারণা পর্যন্ত বাদ দেয় নি। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে, হয়তো ও সন্ন্যাসীই হয়ে যাবে। কিন্তু বছর দুয়েক পর ও নিজে থেকেই সব ছেড়ে দিলে। ভাবলাম ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। কিছুদিন ভালই গেল। কিন্তু তারপর এল বন্যার মত দেশে তিরিশের সত্যাগ্রহ আন্দোলন আর ও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কলেজের পড়া-টড়া ছেড়ে। জেলেই যায় আর কি—এত ওর উৎসাহ। কিন্তু মাসতিনেকের মধ্যেই সব উৎসাহ ওর নিবে গেল। নিজে থেকেই

ফিরে গেল কলেজে, বললে যে, আগে লেখাপড়া, পরে দেশের কাজ। খুশি হলাম; ভাবলাম, ওর সুমতি হয়েছে! কিন্তু হরি হরি! এম. এ. পরীক্ষার ছ মাস আগে ও হঠাৎ ধুয়া ধরলে, এ দেশে লেখাপড়া কিছুই হয় না, ও বিলাত যাবে। কত বোঝালাম, রাগ করলাম, কিন্তু ওর মন ফিরল না; পরীক্ষা না দিয়েই ও বিলাতে পালিয়ে গেল। ফিরে এল কম্যুনিস্ট হ'য়ে। তারপর কি ও করেছে, কোথায় কেমন ভাবে থেকেছে, এ যুদ্ধকে একবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও একবার জনযুদ্ধ ব'লে কি রকম লাফালাফি করছে, সে তো কিছু কিছু তুমি নিজেই জান।

প্রতুলবাবুর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল, অরুণাংশুর জন্য নয়, অনামিকার চিন্তায়। এ হেন চপলচিত্ত যুবকের হাতে অনামিকাকে সুদূর ভবিষ্যতে সমর্পণ করবার চিন্তাকেও আর যেন তিনি আমল দিতে পারলেন না। পথ চলতে চলতে কেমন যেন তাঁর মনে হতে লাগল যে, বেশ হয় অরুণাংশু যদি ওকালতি করতে অস্বীকার ক'রে বসে অথবা সে যদি আগের মত আর একবার ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। চিন্তাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতেই তিনি অবশ্য লজ্জায় শিউরে উঠলেন; কিন্তু চেষ্টা ক'রেও মনের ওই ইচ্ছাটাকে তিনি একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না।

প্রতুলবাবুর গোপন মনের অশুভ ইচ্ছা এবং রমেনবাবুর আশঙ্কাসত্ত্বেও অরুণাংশুর মধ্যে অতীতের কোন দুর্লক্ষণ প্রকাশ পেল না। অরুণাংশু তার মা-বাপের সঙ্গে বাড়িতেই থেকে গেল এবং ওর চাইতেও বড় কথা, নির্দিষ্ট দিনে প্রতুলবাবুরই বড় একজন মক্কেলের ছোট একটি মামলার ব্রীফ নিয়ে যথারীতি হাইকোর্টে ওকালতি শুরু ক'রে দিলে।

প্রতুলবাবু নিজের গাড়িতেই অরুণাংশুকে কাছারিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, বৈকালে তাকে নিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; গাড়ি থেকে নেমেই হাঁক দিলেন, অনু—ও মা অনু!

উপর থেকে সাড়া দিয়েই অনামিকা দ্রুতপদে নীচে নেমে আসছিল, কিন্তু অরুণাংশুকে দেখেই দোরের কাছেই থমকে দাঁড়াল সে।

অরুণাংশুর আজ নূতন বেশ; পরনে দামী সাহেবী স্যুট, পায়ের জুতা

থেকে গলার 'টাই' পর্যন্ত কোথাও কোন খুঁত নেই, সাহেববাড়ির তৈরি আঁটসাঁট পোশাকে তার সুগঠিত দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য মনোরম হয়ে ফুটেছে।

কিন্তু তাকে উদ্দেশ ক'রে অনামিকা একটি কথাও বললে না; ফিরে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে এস বাবা, আমি চায়ের আয়োজন করছি।

খাওয়ার ঘরে অরুণাংশুকে আদর ক'রে নিজের কাছে বসিয়ে প্রতুলবাবু আর একবার তার দিকে মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বললেন, দেখ, অনু, দেখ; স্যুট প'রে অরুণকে কেমন চমৎকার মানিয়েছে!

অরুণাংশু লজ্জিত হয়ে বললে, আঃ, কি যে আপনি বলছেন, কাকাবাবু!

মিছে কথা তো নয়, বাবা,—প্রতুলবাবু গলার স্বর আরও এক পরদা উপরে চড়িয়ে বললেন, তোমায় আজ যে দেখবে তাকেই মানতে হবে। আর দেখ,—অনু, কোর্টে দাঁড়িয়ে অরুণ আজ যা বক্তৃতা করলে,—সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ; যেমন ভাষা তেমনি তার প্রয়োগ; উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু সঙ্কোচও নেই; কে বলবে যে, অরুণ এই প্রথম হাইকোর্টে দাঁড়িয়েছে! জজসাহেব সুদ্ধ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু অনামিকা কোন উত্তরই দিলে না; খাওয়ার টেবিল আর ওর উপরের সরঞ্জামগুলি নিয়ে সে অকারণেই বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠল। এক সময়ে অতি নগণ্য একটি ত্রুটির জন্য চাকরটাকে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে দিলে সে, এবং সে বেচারা রীতিমত তৎপর হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকলেও নিজেই অন্তত তিন বার রান্নাঘরে গিয়ে কয়েকটি জিনিস নিজের হাতেই সে ব'য়ে নিয়ে এল।

প্রতুলবাবু দ'মে গেলেন। অরুণাংশুকে আজ সত্যই তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, তাকে যে তিনি ছুটির পর বাড়িতে টেনে এনেছিলেন সেটা নিছক ভদ্রতার খাতিরেই নয়। কিন্তু অরুণাংশুর প্রতি অনামিকার ওই ঔদাসীন্য দেখে আগের সন্দেহটাই তাঁর মনের মধ্যে আবার প্রবল হয়ে উঠল। অরুণাংশুর মুখের বিব্রত ভাবটা লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি নিজেও বেশ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

যাবার আগে অরুণাংশু হঠাৎ অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললে, মেট্রোতে একটা ভাল ছবি এসেছে, অনু। যাবে দেখতে?

অনামিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলবাবুও চমকে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ অনামিকার মুখে কোন কথাই ফুটল না; কিন্তু অনামিকার মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই প্রতুলবাবুই আগ্রহের স্বরে বললেন, কি ছবি, অরুণ?

অরুণাংশু একটা নাম-করা ইংরেজী ছবির নাম করলে; তারপর বললে, ছবিটা শুনেছি নাকি খুব ভাল।

তাই নাকি? তা হ'লে—

বলতে বলতে প্রতুলবাবুর চোখ দুটি আবার অনামিকার মুখের উপর গিয়ে পড়ল। কুণ্ঠিত অনুনয়ের স্বরে কথাটাকে তিনি শেষ করলেন, তা হ'লে যাও না, মা,—দুজনে ছবিটা দেখে এস গে।

পলকের জন্য অনামিকার ভুরু দুটি কুঁচকে গেল; কিন্তু পরক্ষণেই বিরক্তির ভাবটা গোপন ক'রে অল্প একটু হেসেই সে বললে, ও ছবিটা আমি আগেই দেখেছি, বাবা; মনে নেই তোমার? ওটা আগেও তো একবার এসেছিল।

প্রতুলবাবু মনে করতে পারলেন না; কাজেই আরও বেশি বিব্রত হয়ে বললেন, তা হ'লেও যাও না আর একবার,—অরুণ যখন বলছে।

অনামিকা উত্তর দিলে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে, একটা ছবি দুবার দেখতে ভাল লাগে না আমার।

কথাটা সে মুখ মিষ্টি ক'রে বললেও অরুণাংশুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলবাবুও বুঝতে পারলেন যে, অনামিকার ওই কথার উপরে কারও কোন কথাই আর চলবে না। প্রতুলবাবু বলবার মত আর কোন কথা ভেবেও পেলেন না। অরুণাংশুই তার ম্লান মুখে কষ্টে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে বললে থাক্ তবে, আর একদিন কোন একটা ভাল নতুন ছবি এলেই যাওয়া যাবে।

দিন তিনেক পর আবার ওই রকমেরই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। কি কারণে হাইকোর্ট সেদিন বন্ধ ছিল। বৈকালে নিজের গাড়ি নিজে হাঁকিয়ে অরুণাংশু প্রতুলবাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হল।

প্রতুলবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি, অরুণ, কার গাড়ি এটা?

অরুণাংশু হাসিমুখে উত্তর দিলে, আমারই গাড়ি। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কিনে-ছিলাম দিন কয়েক আগে। এ কদিন কারখানায় ছিল, আজ নিজে নিয়ে এলাম আমি। চমৎকার রঙ করেছে, না?

চমৎকার, প্রতুলবাবু খুশি হয়ে সায় দিয়ে বললেন। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মনে হয়, অনু?

বেশ গাড়ি, অনামিকা ঘাড়টা একটু কাত ক'রে উত্তর দিলে। তার পরেই অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, নতুন গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণাংশুর চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; সে বললে, বিশেষ কোথাও নয়, এই লেকের ধারে একটু ঘুরে আসব। তাই ভাবলাম যে তোমাকে একবার,—মানে, চল না তুমিও, বেশি দূর তো নয়!

আমি!

কথাটা ব'লেই অনামিকা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই পিছনে স'রে গেল।

সেটা লক্ষ্য ক'রেই প্রতুলবাবু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, যাও না, মা, কদিন থেকে শরীরটাও তো তেমন ভাল নেই তোমার। খোলা হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরে এলে উপকার হবে।

কিন্তু এরই উত্তরে অনামিকা হঠাৎ যেন আগুনের মতই জ্ব'লে উঠে বললে, বাবা, তুমি জান, আজ মীরাদের বাড়িতে আমার যাবার কথা আছে।

অনামিকার পক্ষে এ রকম অসংযত আচরণ এতই অস্বাভাবিক যে, প্রতুল-বাবুর মাথাটা হঠাৎ যেন একেবারে গুলিয়ে গেল। থতমত খেয়ে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, তাই নাকি? কিন্তু কই, আমি তো—

তুমি জান,—অনামিকা এবার গাঢ় স্বরে বললে,—তবু শুধু শুধু আমাকে কেবল বিব্রত করবার জন্যেই— বলতে বলতে কথাটা শেষ না ক'রেই হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে ভিতরে চ'লে গেল।

প্রতুলবাবু আর অরুণাংশু দুজনের মুখই একেবারে কালো হয়ে গেল; তার উপর নিদারুণ লজ্জায় প্রতুলবাবু অরুণাংশুর মুখের দিকে আর তাকাতেই পারলেন না।

বার দুই ঢোক গিলে অরুণাংশুই কোনরকমে বললে, আমি এখন আসি, কাকাবাবু। ব'লেই সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাতেই প্রতুলবাবু তখনকার মত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু মনটা তাঁর আবার বিকল হয়ে গেল। আগের দিনও রমেনবাবুর সামনেই মহামায়া দেবী তাঁকে আশীর্বাদের দিন ঠিক করবার জন্য তাড়া দিয়েছিলেন, রমেনবাবু তার কোন প্রতিবাদ করেন নি। তাঁর নিজের মনটাও ধীরে ধীরে আবার যেন অরুণাংশুর দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। বুঝতেও তিনি পারছিলেন যে, অরুণাংশু অনামিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওই অনামিকাকে নিয়েই তিনি মুশকিলে প'ড়ে গেলেন। পর পর তিন দিন তাঁর চোখের সামনেই অনামিকা অরুণাংশুর সঙ্গে যে ব্যবহার করলে অনামিকার চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে ওর সঙ্গতি একেবারেই নেই। কি যে ওর অর্থ, তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। দিন তিনেক তিনি উন্মনা হ'য়ে কাটালেন। অবশেষে মানসিক অস্বস্তি আর সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞাই ক'রে বসলেন যে, লজ্জা-সঙ্কোচ সব বিসর্জন দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা সম্বন্ধে আর একবার অনামিকার সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই তিনি আলাপ করবেন; তারপর হয় আশীর্বাদের দিন ঠিক ক'রে, নয়তো বিয়ের প্রস্তাবটাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে বর্তমানের অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার অবসান ক'রে দেবেন।

আলাপের ধারাটাকে, এমন কি, ভাষা পর্যন্ত আগে থেকেই ঠিক ক'রে নিয়ে সেই রাত্রেই তিনি শোবার আগে অনামিকাকে নিজের কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একটা কথার ঠিক উত্তর দেবে, মা?

অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি কথা, বাবা?

সত্যি বল তো, মা,—অরুণকে তোমার কেমন মনে হয়?

কথাটা প্রথমে যেন অনামিকা বুঝতেই পারলে না; কিন্তু তার পরেই তার মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে সে বললে, আমার আবার কি মনে হবে?

কিন্তু প্রতুলবাবু মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, না, অনু, লজ্জা ক'রো না, মা? নিজে আমি বড্ড ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছি।

অনামিকা চমকে মুখ তুলে বললে, কেন, বাবা?

মন ঠিক করতে পারছি নে, মা।—প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, অরুণের হাতে তোমায় সঁপে দেবার কথা ভাবলেই মনটা আমার কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে।

অনামিকা এবার আর কথা বললে না, কিন্তু তার চোখ দুটি প্রতুলবাবুর মুখের উপরেই প'ড়ে রইল।

একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, অরুণ যেন কেমন,—আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওর জীবনযাত্রার সাদৃশ্য একেবারেই নেই। তুমি নিজেই তো শুনেছ, দিনরাতই ওর মুখে লেগে রয়েছে হয় জনযুদ্ধ, নয়তো কিষাণ-মজদুরের কথা। দিন কাটে ওর হৈ হৈ ক'রে—হয় পার্কে, নয় কারখানার কুলিবস্তিতে।

কিন্তু এ কথা শুনে অনামিকা হেসে ফেললে; বললে, তা কেন বলছ, বাবা? সে সব তো দূর হয়ে গিয়েছে। আজকাল তো বাড়ি আর কোর্ট, কোর্ট আর বাড়ি,—এই নিয়েই ওর দিন কাটছে দেখতে পাচ্ছি।

প্রতুলবাবু চমকে উঠলেন; অনামিকার কথা বা হাসি কোনটাই যেন তিনি বুঝতে পারলেন না। স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটু অতিরিক্ত উত্তেজনার সঙ্গেই তিনি বললেন, কিন্তু সেও তো ভাল নয়, মা; এও তো আর একটা সীমান্ত। কদিন এ ভাব থাকবে কে জানে!

অনামিকা এবার আর কথা বললে না, মুখ নামিয়ে নিজের আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, ওর অতীত ইতিহাসটাও শুনলাম খুব ভাল নয়; কোন কাজেই খুব বেশিদিন ও নাকি টিঁকে থাকে নি। তাই মনটা আমার কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে, এক একবার মনে হচ্ছে যে, এ বিয়ে যেন না হওয়াই ভাল।

অনামিকা মুখ তুললে না, কিন্তু মৃদু স্বরে বললে, বেশ তো, তাই যদি তোমার মত হয়!

প্রতুলবাবু আবার চমকে উঠলেন। এবারও কথাটা তিনি যেন ভাল বুঝতে পারলেন না; চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রেও অনামিকার মুখও ভাল দেখতে পেলেন না তিনি। বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর

শেষে বিপন্ন কণ্ঠে তিনি বললেন, কিন্তু, মা, তোমার মতটা ঠিক জানতে না পারলে আমার মত যে আমি ঠিক করতেই পারছি নে!

উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হ'ল অনামিকার; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক প্রতুলবাবুর চোখের দিকে চেয়েই ধীর গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমার মতামতের কোন কথাই এতে নেই, বাবা। এ বিয়েতে তোমার যদি অমত থাকে তো আমারও তাই। কিন্তু আমি কেবল ভাবছি যে, ভদ্রলোককে কথা দিয়ে সেই কথা আবার তুমি ফিরিয়ে নেবে? মুখের কথা তো ছিনিমিনি খেলবার জিনিস নয়।

প্রতুলবাবু চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন; উত্তেজিত স্বরে বললেন, কি বলছ, মা, তুমি? এই বিয়ের সম্বন্ধের কথা! কিন্তু এ সম্বন্ধে কথা তো এখনও দেওয়া হয় নি।

অনামিকার চোখের তারা দুটি হঠাৎ যেন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল, অস্ফুটস্বরে সে বললে, কথা দেওয়া হয় নি? ওঁদের কথা দাও নি তুমি?

না তো! প্রতুলবাবু মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন।

কতকটা যেন অভিভূতের মতই আবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল অনামিকা; তারপর নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, তা হ'লেও আমার কথা তো নিয়েছ তুমি!

সে তো আমি নিয়েছি।

কিন্তু সে-ও তো কথাই—আমার নিজের মুখের কথা। আমিই কি তা প্রত্যাহার করতে পারি?

প্রতুলবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে কলেজে-পড়া যুবতী মেয়ের মুখে এ কি কথা! নিজের কানকেই তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না; প্রায় মিনিটখানেক কাল তাঁর মুখে কোন কথাও ফুটল না।

কিন্তু তারপর খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে ব্যাকুল স্বরে তিনি বললেন; তুমি ভুল করেছ, মা, খুব বড় একটা ভুল। বিয়ের ব্যাপারে যা প্রত্যাহার করা যায় না, তা হচ্ছে বাক্‌দান; তার বিশেষ একটা রূপ আছে, সে রকম কথা দেবার একটা শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি আছে। তবু বিশেষ অবস্থায় তারও প্রতিগ্রহ

চলে। আমাদের যে কথা হয়েছে সে তো কেবল কথার কথা, তা প্রত্যাহার করা যাবে না কেন?

অনামিকা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল; আর একবার প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ঠিক আগের মতই ধীর গম্ভীর স্বরে সে বললে, বেশ তো, বাবা, তা যদি হয় তবে যা করবার তা তুমিই কর। কেবল ভবিষ্যতে এই কথা ব'লে আমায় যেন দায়ী ক'রো না যে, আমার জন্যই এ বিয়ে ভেঙে গেল।

অনামিকা চ'লে গেল মূর্তিমতী প্রহেলিকার মত। আজও প্রতুলবাবু তাকে বুঝতে পারলেন না। তার কথার সঙ্গে কাজের, এমন কি, একটা কথার সঙ্গে আর একটা কথার সামঞ্জস্যও খুঁজে পেলেন না তিনি। তার অন্তরের রহস্যটাও তার কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেল। শেষের দিকে আবার তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রী লীলাকে তাঁর মনে প'ড়ে গেল। সেই এলাহাবাদের মতই সে রাত্রেও তাঁর মনে হ'তে লাগল যে, তিনি বেঁচে থাকলে এই বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আজ তাঁকে একেবারেই মাথা ঘামাতে হ'ত না। এক দিকে অনামিকার কথা ভেবে মাথাটা তাঁর যতই গুলিয়ে যেতে লাগল, অপর দিকে ততই স্বর্গীয়া স্ত্রীর জন্য তাঁর বুকের মধ্যে অক্ষম হাহাকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

প্রতুলবাবু তাঁর মন ঠিক করবার আগেই একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল।

সেদিন বেলা দুটো বাজবার একটু পরেই অরুণাংশু কাছারির পোশাকেই প্রতুলবাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল। প্রতুলবাবু তখন বাড়িতে নেই। বেয়ারার কাছে খোঁজ নিয়ে অরুণাংশু সোজা উপরে চ'লে গেল—একেবারে অনামিকার ঘরে।

বিস্মিতা অনামিকাকে আরও বিস্মিত ক'রে সে বললে, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, কাজও বলতে পার।

তারপর পকেট থেকে মখমলের সুদৃশ্য ছোট একটি বাক্স বের ক'রে সেটি অনামিকার সামনে টেবেলের উপর রেখে বললে, দেখ তো, অনু, জিনিসটা কেমন?

কি আছে এতে?—অনমিকা বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলে।

খুলেই দেখ না।—ব'লে অরুণাংশু বাক্সটি অনামিকার দিকে আরও একটু ঠেলে দিলে।

শেষ পর্যন্ত বাক্সটি অনামিকাই খুললে। ভিতর থেকে বের হ'ল হীরার কাজ করা সোনার একটি ব্রচ্। চোখ ছুটি তার হয়তো বা ঝলসেই গেল; চমকে অরুণাংশুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে।

অরুণাংশু হাসিমুখে বললে, তোমার জন্মে এনেছি।

আমার জন্মে?

হ্যাঁ। ব্যারিস্টারি ক'রে টাকা রোজগার করব, এ কথা কোনদিন ভাবি নি। কিন্তু সত্যি যখন মক্কেলের টাকা পকেটে এসে গেল, তখন সেটা কিসে খরচ করব, তা নিয়ে বড্ড ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলাম। শেষে হ্যামিল্‌টনের দোকান থেকে তোমার জন্ম এই জিনিসটি কিনে টাকাটার সদ্‌গতি করলাম।

অনামিকা কোনও উত্তর দিলে না, এমনভাবে সে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যেন অরুণাংশু তখনও কথা বলছে।

একটু পরে অরুণাংশুই কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, জিনিসটা কেমন? পছন্দ হয়েছে তোমার?

এইবার অনামিকার ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠল। চোখ নামিয়ে ব্রচটির দিকে তাকাল সে; মুখে বললে, চমৎকার জিনিস, আপনার পছন্দের তারিফ না ক'রে পারছি নে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটি বন্ধ ক'রে অরুণাংশুর দিকে ঠেলে দিয়ে সে আবার বললে, এ আপনি নিয়ে যান, ধন্যবাদ।

চক্ষের নিমেষে অরুণাংশুর মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল; আহতের মতই সে বললে, কিন্তু এ যে আমি তোমার জন্ম এনেছি।

আমার দরকার নেই।—চট ক'রে উত্তর দিলে অনামিকা।

বেশ একটু চেষ্টায় মুখখানা হাসবার মত ক'রে অরুণাংশু বললে, তোমার দরকারের জন্ম তো এটা আমি আনি নি। দেবার দরকার আমার। সেই জন্মই এটা তোমায় নিতে বলছি।

অনামিকা মৃদু কিন্তু কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলে, না, এ আমি নিতে পারব না,—নেব না।

নেবে না ?—অরুণাংশু রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমার একটা উপহার তুমি নিতে পারবে না ?

অনামিকা হঠাৎ যেন আগুনের মতই জ্ব'লে উঠল ; দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, কেন বার বার আপনি আমায় অপমান করছেন ?

অরুণাংশুর মুখখানা এবার ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল ; ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে সে শুধু বললে, অপমান করছি !

অপমান নয় তো কি ? অনামিকা আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে, সেদিন নিয়ে যেতে চাইলেন সিনেমায় ; তারপর মোটরগাড়ি নিয়ে এলেন আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে ; আজ জহুরীবাড়ি থেকে হীরার ব্রচ নিয়ে এসেছেন আমায় উপহার দিতে। কেন, আমায় কি ভেবেছেন আপনি ?

জলে ডোবা মানুষের মত হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণাংশু বললে, এ কি বলছ, অনু ? আমি তো—

থাক্, অনামিকা তাকে যেন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে, কৈফিয়ৎ আর আপনাকে দিতে হবে না।

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, আমি আপনাকে বোঝাতেও পারব না। কেবল দয়া ক'রে আপনার ব্রচ আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ব'লেই চৌকি ছেড়ে উঠে সোজা সে জানালার ধারে চ'লে গেল।

অরুণাংশুর বিকল ইন্দ্রিয়গুলি আবার যখন কতকটা সজাগ হয়ে উঠল, তখন অনামিকার মাথার চুল আর পিঠের কাপড় ছাড়া কিছুই আর তার চোখে পড়ল না। তথাপি সেই দিকেই আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবার পর সে নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ; ব্রচের বাক্সটির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুখানা হাতই পায়জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমি তোমায় অপমান করি নি, অনু, তুমিই বরং বার বার আমায় অপমান করেছ। কিন্তু থাক্ সে কথা। ব্রচ আমি নিয়ে যাচ্ছি ; আর সেই সঙ্গে নিজেকেও আমি তোমার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

অনামিকা নড়ল না, অরুণাংশুর দিকে ফিরেও তাকাল না সে। কিন্তু

উত্তরে আগের মতই ঝাঁজের সুরে সে বললে, তাই ভাল, তাতে আপনিও বেঁচে যাবেন, আমারও বিড়ম্বনা ঘুচবে।

ট্রামের মধ্যেও অনামিকার মুখের ঐ শেষের কথাটাই অরুণাংশুর কানের কাছে থেকে থেকে যেন বেজে বেজে উঠছিল। কিন্তু ওর মধ্যেই হঠাৎ এক সময়ে তার কানে গেল 'টেলিগ্রাফ' কাগজের ফেরিওয়ালা জোরে জোরে ঘোষণা করছে—চাটগাঁয়ে আবার বোমা পড়ল।

চমকে উঠল অরুণাংশু। একখানা কাগজ তৎক্ষণাৎ কিনে নিলে সে। খবরটাকে পড়লে বেশ মন দিয়ে। পড়তে পড়তে তার মুখের চেহারাও বদলে গেল। এসপ্লানেডে ট্রাম থেকে যখন সে নাবল, তখন তার বিষণ্ণ ম্লান মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

চারিদিকেই তখন দারুণ ভিড়। কত দেশের কত রকমের লোক যে পথে বের হয়ে এসেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। উর্দি-পরা অনেক সৈন্যও অরুণাংশুর চোখে পড়ল,—ইংরেজ, ইয়াংকি এবং চীনা তো আছেই, ভারতীয় সৈনিকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তাদের কত রকমের পোশাক, কত রকমের ব্যাজ,—কেউ নৌবাহিনীর, কেউ সেনাবাহিনীর, কেউ বিমানবাহিনীর। মন্ত্র-মুগ্ধের মত বার বার তাদেরই দিকে তাকাতে লাগল অরুণাংশু।

ঘণ্টাখানেক পর পার্টির আপিসে কমরেড প্রবীর চ্যাটার্জির মুখে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দেবার অনুরোধ শুনে অরুণাংশু হেসে ফেলে বললে, রক্ত আমি দেব, প্রবীরদা, তবে তা শিরা থেকে ছুঁচ দিয়ে টেনে বের করা রক্ত নয়,—আসল বুকের রক্ত।

তার মানে?—চ্যাটার্জি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

অরুণাংশু হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে, আমায় ছেড়ে দিতে হবে প্রবীরদা, আমি এয়ার ফোর্সে যোগ দিতে চাই।

বল কি?

হ্যাঁ, প্রবীরদা। কথা আমরা অনেক বলেছি। কিন্তু শুধু মুখের কথা দিয়ে জাপানকে আর ঠেকানো যাবে না। তাই সাক্ষাতে লড়াই করতে চাই আমি। ওরা আমাদের নিরপরাধ ভাইবোনদের রক্তে চট্টগ্রাম

মাটি রাঙা ক'রে দিয়ে গিয়েছে; তাই আমি নিজে বোমারু বিমান নিয়ে ওদের দেশে যেতে চাই, ঠিক এমনি ক'রেই তাদের রক্তে তাদের দেশের মাটি রাঙিয়ে দিয়ে আসতে চাই আমি।

কমরেড চ্যাটার্জি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর কমরেড চ্যাটার্জি বললেন, কিন্তু অরুণাংশু, যে ফ্রন্টে আমরা কাজ করছি, তার গুরুত্বও তো কম নয়। আর যে কাজ আমরা করছি, সেও তো যুদ্ধেরই কাজ।

অরুণাংশু হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠে বললে, হতে পারে; কিন্তু এ সব আমার কাছে বড্ড পান্‌সে লাগছে, প্রবীরদা।

বাড়িতে ফিরেই মহামায়া দেবীকে সে বললে, একবার বাবার ঘরে এস তো, মা, একটা কথা বলব।

শুনে মহামায়া দেবীর মুখে কোন কথাই ফুটল না; কিন্তু রমেনবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন, তা বাবা, সেখানে তোমার থাকবার ব্যবস্থাটা আজ রাত থেকেই হতে পারল না?

অরুণাংশু বুঝতে না পেরে বললে, কোথায়, বাবা?

ওই এর পর থেকে যেখানে তুমি থাকবে সেই জায়গায়? মানে, কলকাতায় তোমার এই বাড়ি আর সংসারটার খবরদারি করবার চাকরি থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি পেলে বুড়োমানুষ আমি ঘরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারতাম।

অরুণাংশুর মুখ লাল হয়ে উঠল; সেও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার পাততে আমি আপনাদের কোনদিন বলি নি; এখনও রাখতেও আমি বলি নে। আপনার যেদিন খুশি সেই দিনই আপনার সংসার আপনি গুটিয়ে নিয়ে এলাহাবাদে ফিরে যেতে পারেন। আমায় বলেন তো আজ রাত্রেই আমি বাড়ি ছেড়ে যাব।

ব'লেই তৎক্ষণাৎ সে তার নিজের ঘরে চ'লে গেল।

মহামায়া দেবী এতক্ষণ অভিভূতের মত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, অরুণাংশুর পায়ের শব্দ শুনেই হঠাৎ তিনি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন; জলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বুড়ো বয়সে তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?

এমনিতেই যে ছেলে উড়োপাখি, তাকে তুমি ওই কথা বলতে পারলে? অভিমানে আজ রাত্রেই ও যদি বাড়ি ছেড়ে যায়!

উপরে রমেনবাবু প্রায় চীৎকার করে বললেন, চ'লে যাবে? চ'লে গেলে আমি তো নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারি। শুধু চ'লে যাওয়া কেন, ও যদি ম'রে যায়, ওর মুখ যদি আর আমায় দেখতে না হয়, তবে, সত্যি বলছি তোমায়, নিজে আমি কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব।

থাম তুমি।—মহামায়া দেবী স্বামীর উপরেও আরও এক পরদা গলা চড়িয়ে বললেন, তোমার ঘটে কতটুকু যে বুদ্ধি আছে, তা আমি জানি। এই ব্যাপারে আর একটি কথাও যদি তুমি বল তবে, আমিও সত্যি বলছি তোমায়, নিজে আমি তোমার সামনেই গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

পরদিন সকালেই প্রতুলবাবুকে ডাকিয়ে এনে মহামায়া দেবী রাতের ঘটনাটা তাকে খুলে বললেন।

প্রতুলবাবু প্রথমে শিউরে উঠলেন, সর্বনাশ, এরই হাতে তিনি তার একমাত্র কন্যাকে সম্প্রদান করতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু তার পরেই যেন ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকটা তাঁর কানায় কানায় ভ'রে উঠল, যাক, বিয়ে তো এখনও হয় নি, ভগবান নিজেই সময় থাকতে অরুণাংশুর মাথায় এই ভাবটা ঢুকিয়ে দিয়ে অনামিকাকে চরমতম দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু কোন ভাবনাই দানা বাঁধবার অবসর পেল না। বর্ণনাটা শেষ ক'রেই মহামায়া দেবী তাঁর একখানা হাত চেপে ধ'রে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললেন, ওকে ফেরাও, ঠাকুরপো। তোমারই বুদ্ধি আর তোমারই চেষ্টায় এতদিন ওকে ঘরে রাখতে পেরেছি। আজও তোমাকেই এ ভার নিতে হবে। ও তো তোমারও সন্তানের মতই।

প্রতুলবাবু বিহ্বল স্বরে বললেন, আমি! আমি কি করব, বউদি? আমার কথা কি ও মানবে?

মানবে, ঠাকুরপো।—মহামায়া দেবী কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, আমি জানি, সব কলকাঠি তোমার হাতে আছে। একা তুমিই ওকে ফিরাতে পারবে।

প্রতুলবাবুর মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল; তবু ওরই মধ্যে তাঁর

মনে পড়ল, তাঁর নিজেরই অন্যতম বন্ধু ও বিলাতের সহপাঠী ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী মিঃ মজুমদারকে,—মনে পড়ল যে, অরুণাংশুরই মত যুদ্ধপ্রচেষ্টার সমর্থক দেশের লোককে নিয়ে তিনি যুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। আবছায়া রকমে তাঁর মনে হ'ল যে, মিঃ মজুমদারকে ধরলে হয়তো এই ব্যাপারে একটা সুরাহা হতেও পারে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, আমি বললে কোন লাভ হবে না, বউদি ; তবে আর একজনকে দিয়ে বলাব আমি। আমারই চেনা-জানা একজন সরকারী কর্মচারী।

পরিকল্পনাটা মহামায়া দেবী মন দিয়েই শুনলেন। কিন্তু প্রতুলবাবুর বক্তব্য শেষ হবার পর ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, ওতে যদি কিছু লাভ হবে মনে কর, ঠাকুরপো, তবে করতে পার। কিন্তু আমি বলি, অনুকে দিয়ে ওকে একবার বলাও।

প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, অনু!

হ্যাঁ, ঠাকুরপো, এক অনু ছাড়া আর কেউ তাকে ফিরাতে পারবে না। আমার মনে হয় যে, অনুর জন্যই ও বিবাগী হয়ে যাচ্ছে।

সম্ভাবনাটাকে প্রতুলবাবু একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না। ওদিকে মহামায়া দেবীও একেবারে নাছোড়বান্দা। কাজেই এ ব্যাপারের মধ্যে অনামিকাকেও টেনে আনবার কোন ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও শেষ পর্যন্ত মহামায়া দেবীর প্রভাবেই তাঁকে সম্মতি দিতে হ'ল।

শেষে বলতেও হ'ল অনামিকাকে। বর্ণনাটা শেষ ক'রে অসহায়ের মত কন্যার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এখন কি করা যায়, বল তো, মা?

শুনতে শুনতে অনামিকা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল, প্রশ্নটা শুনে সে সুপ্তোত্থিতের মতই চমকে উঠল। পলকের জন্য তার কানের কাছটা ঈষৎ লাল হয়ে উঠল ; কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি আর কি বলব, বাবা!

প্রতুলবাবু বললেন, আমিও কিছু বুঝতে পারছি নে, মা। ওদের ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে হয় না আমার—ওদের সঙ্গে সব সম্বন্ধই আমি চুকিয়ে দিতে চাই। কিন্তু বউদি এমন ভাবে আমায় চেপে ধরেছেন, বড্ড মুশকিলে পড়েছি আমি।

অনামিকা এবার আর কোন কথা বললে না। একটু পরে প্রতুলবাবুই আবার বললেন, বউদির বিশ্বাস যে, তুমি অরুণকে একবার নিষেধ করলেই সব গোলমাল চুকে যাবে।

আমি!—অনামিকা চমকে উঠে বললে।

প্রতুলবাবু বিব্রতের মত বললেন, হ্যাঁ, মা, বউদির বিশ্বাস যে, তোমার কথা অরুণ ঠেলতে পারবে না।

অনামিকা উত্তর দিলে না, কিন্তু তার গম্ভীর মুখ আরও যেন গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেই মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কি বল, মা, বলবে একবার অরুণকে?

অনামিকা মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে, না, বাবা, আমি পারব না।

বিব্রত মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর প্রতুলবাবু আবার অসহায়ের মত বললেন মা, অনু, বউদির যখন অমন বিশ্বাস তখন তুমি একবার—শুধু একটিবার—

কিন্তু কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, অনামিকা দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলে বললে, বাবা!

প্রতুলবাবু থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু অনামিকা থামলে না; ডান হাতে কপালের উপর থেকে রুক্ষ চুল কয়গাছাকে সরিয়ে দিয়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, তোমরা আমায় কি পেয়েছ, বাবা? আর কি করাতে চাও আমায় দিয়ে? পুরাণের দেবতারা তাদের অপ্সরীদের যে রকমে ব্যবহার করেছে, আজও শিকারীরা বুনো হাতী ধরবার জন্য পোষা মাদী হাতীকে যে রকমে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি ক'রেই আমায় তোমরা বার বার ব্যবহার করছ। ওঁরা না হয় আমার কেউ নয়। কিন্তু তুমি? তুমি আমার বাপ হয়েও আমাকে দিয়ে— বলতে বলতে কথাটা সে শেষ না ক'রেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

প্রতুলবাবু হতবুদ্ধির মত বললেন, এ কি বলছিস মা?

পরের মুহূর্তেই চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে মাথা নেড়ে তিনি আবার বললেন, ভুল বুঝেছিস, অনু, একেবারে ভুল। তুই যে আমার

না, তোকে আমি কখনো এমন হীন কাজ করতে বলি নি, কক্ষনো বলবও না।

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে তিনি অনামিকার হাত ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অনামিকা হঠাৎ উঠে অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে অবরুদ্ধ স্বরে বললে, না, ব'লো না ; বল যদি, আমার যেদিকে চোখ যায় সেই দিকে চ'লে যাব আমি।

ব'লেই প্রতুলবাবুকে আর একটি কথাও বলবার অবসর না দিয়েই সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

খালি ঘরের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকবার পর প্রতুলবাবু আবার গাড়িতে গিয়ে বসলেন। মিঃ মজুমদারের বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞাই ক'রে ফেললেন যে, অরুণাংশুর সম্পর্কে এই শেষ কর্তব্যটি সম্পাদন করবার পরেই ওদের পরিবাবের সঙ্গে শেষ সম্বন্ধটুকুও ঘুচিয়ে দিয়ে অনামিকাকে নিয়ে কোন দূর দেশে চ'লে যাবেন তিনি, যাতে অরুণাংশুব সঙ্গে অনামিকার বিয়ে হওয়া দূবে থাক্, দুজনের আর দেখাও না হতে পাবে।

প্রতুলবাবুকে নিজের বাড়িতে দেখে মিঃ মজুমদার বিস্মিত হলেন ; তাঁর ভূমিকা শুনে হলেন উদ্বিগ্ন ; কিন্তু আসল বক্তব্যটি শুনবার পব হো-হো ক'রে হেসে উঠে তিনি বললেন, না হে, না। একটি ছেলেকে যুদ্ধে যাবার সঙ্কল্প থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে আমার কর্তব্যজ্ঞান যদিও বা একটু বেঁকে বসে, বিবেক মোটেই অস্থির হবে না। আমি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের সেক্রেটারি হতে পারি, কিন্তু আমিও তো বাঙালী, ছেলেমেয়ে আমারও তো আছে! আর যে যুদ্ধ করতে যাবে এরা, সে তো এই যুদ্ধ! সরকারী চাকরি করি ব'লেই কি— তা ছেলেটির নাম আর ঠিকানা বলতো শুনি।

নাম শুনেই মজুমদার চমকে উঠে বললেন, একে তো আমি চিনি, অনেক বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যে! আর সে আমাদের জন্য অনেক কাজও তো ক'রে দিচ্ছে। নিজে সে যুদ্ধে যাবে কি হে? তাকে যে আমাদেরই দরকার আমাদেব রাজনৈতিক ফ্রন্টের কাজের জন্য।

প্রতুলবাবু তার হাত চেপে ধ'রে বললেন, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা,

ভাই,—ওকে ফেরাতে না পারলে ওর বাপমায়ের কাছে আমি মুখই দেখাতে পারব না।

মজুমদার প্রতুলবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব,—আচ্ছা, আজই বলব।

তথাপি প্রতুলবাবুর সব সংশয় দূর হ'ল না, দোরের কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, কিন্তু ভাই, তোমার কথাও অরুণ যদি না মানে?

তা হ'লেও ভাবনা নেই তোমার।—মজুমদার দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন।

তার পর অল্প একটু হেসে কথাটাকে তিনি বুঝিয়েও বললেন, যুদ্ধে ওর যাওয়া হবে না। হাজার হ'লেও সে হ'ল গিয়ে বিপ্লববাদী একটা রাজনৈতিক দলের লোক,—পুলিসের খাতায় লাল কালিতে তার নাম লেখা রয়েছে। এ রকম লোক দিয়ে সুযোগ সুবিধে মত দু-একটা কাজ করিয়ে নেওয়ার কথা আলাদা। কিন্তু এদের সৈন্যদলে ভর্তি করা? সে একেবারে অসম্ভব। বৃটিশ গভর্মেণ্ট অত বোকা নয় হে, প্রতুল,—অত বোকা নয়।

প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করলেন অক্ষরে অক্ষরে। সেই দিনই কমরেড চ্যাটার্জির মারফতে অরুণাংশুকে তিনি ডেকে পাঠালেন নিজের আপিসে। সে এলে পরম সমাদরে তাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নাকি এয়ার ফোর্সে যেতে চাচ্ছেন, অরুণাংশুবাবু?

বিস্মিত হয়ে অরুণাংশু বললে, তাই ভেবেছি বটে। কিন্তু আপনি কার কাছে শুনলেন? প্রবীরদা বলেছেন বুঝি?

সহাস্য কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে মিঃ মজুমদার উত্তর দিলেন, আগুন কি চাপা থাকতে পারে, অরুণাংশুবাবু? আমি সব খবর পেয়েছি। কার কাছে পেয়েছি, তা আপনি নাই বা শুনলেন। যে জন্য কষ্ট দিয়ে এত দূর আপনাকে টেনে এনেছি তাই আগে শুনুন। যুদ্ধ করতে আপনাকে যেতে হবে না,—সে জন্যে অন্য লোক আছে। আপনাকে আমরা চাই পলিটিক্যাল ফ্রণ্টে। সেখানে আপনি অপরিহার্য।

অরুণাংশু বিব্রতভাবে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ মজুমদার গম্ভীর স্বরে আবার বললেন, না, মিঃ সেন, আপনাকে আমরা ছাড়তে পারি নে,—কিছুতেই নয়। দেখছেন তো দেশের

[illegible] ? তবে যে জাপানীরা হুড়হুড় ক'রে আসাম বা চিটাগাং-এর মধ্যে ঢুকে পড়বে কিছুই বলা যায় না। এখন সব চেয়ে বেশি দরকার জনসাধারণের মরাল। অথচ ঠিক সেই জিনিসটিই নষ্ট ক'রে দেবার জন্যে চেষ্টা চলছে চারদিকে। পাকাপাকি যারা পঞ্চম বাহিনীর লোক তারা তো আছেই; তার উপর মিঃ গান্ধীও আবার তোড়জোড় শুরু ক'রে দিয়েছেন। আমরা যতদূর খবর পেয়েছি,—একটা মারাত্মক রকমের বিপ্লব-প্রচেষ্টা দেশে আসন্ন হয়ে আসছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য নয়, মিঃ সেন,—ইংরেজের বদলে জাপানীকে রাজতক্তে বসাবার জন্য। আপনাদের মত ফ্যাসীবিরোধী জনপ্রিয় নেতাদের এ সময়ে কি রাজনৈতিক ফ্রণ্টে না থাকলে চলে!

অরুণাংশু কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, রাজনৈতিক ফ্রণ্টেই তো কাজ করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ—

'কিন্তু' নয় অরুণাংশুবাবু।—মজুমদার মাথা নেড়ে আরও বেশি গম্ভীর স্বরে বললেন, আপনাকে থাকতেই হবে,—আপনাকে আমরা রাখবই। আমাদের মজদুর বিভাগের ভার নিতে হবে আপনাকে,—ওরা যাতে মজদুরদের দিয়ে ধর্মঘট না করাতে পারে তাই আপনাকে দেখতে হবে। হ্যাঁ, আপনাকেই এই বিভাগের ভার আমরা দিতে চাই। সারা বাংলা দেশ ঘুরে ঘুরে আপনাকে কাজ করতে হবে,—আর সে কাজ শুরু হবে এখন থেকেই। বলুন, ভার আপনি নেবেন?

অরুণাংশু কথা দিলে না, কিন্তু প্রস্তাবটাকে সরাসরি অগ্রাহ্যও করলে না সে। মিঃ মজুমদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য তাকে যেতে হ'ল কম্‌রেড চ্যাটার্জির কাছে। সেখানেও আরও খানিকটা বক্তৃতা শুনতে হ'ল। রাত্রে সে যখন বাসায় ফিরে গেল, তখন তার সঙ্কল্পটা ক্রমাগত নাড়া খেয়ে খেয়ে বেশ একটু কাহিল হয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই রকম অবস্থায় নিজের ঘরের টেবিলের উপর সে পেলে অনামিকার চিঠি,—একেবারে তার নিজের হাতের লেখা—'আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার। কাল দুপুরে অবশ্য একবার আসবেন, বাবা যখন বাড়িতে না থাকেন।'

প্রতুলবাবুর কাছ থেকে ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে গিয়ে অনামিকা দোর বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। চোখের জল তখন আর তার বাধ মানে নি। কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন কেটে গেল, তখন সে হয়ে উঠল অসাধারণ রকমের গম্ভীর। প্রতুলবাবু ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বললে না সে; খাওয়ার পর তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়েই নিজে সে আবার শোবার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলে।

বৈকালের দিকে আবার যখন সে ঘর থেকে বের হয়ে এল, তখন তার হাতে একখানা খামে আঁটা চিঠি। ঝির হাতে সেখানা দিয়ে সে বললে, ও-বাড়ির দাদাবাবুকে দিয়ে আসতে হবে। খবরদার, আর কারও হাতে যেন না পড়ে। পারবি?

যুবতী ঝির চোখ দুটি চিকচিক ক'রে জ্ব'লে উঠল। হাসি গোপন করবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে উত্তর দিলে, ওমা, এ আর পারব না কেন দিদিমণি! আমরা কি আর—

চুপ কর্—অনামিকা লাল হয়ে উঠে বাধা দিয়ে বললে, যা, পালা শিগগির। কিন্তু মনে থাকে যেন, আর কারও হাতে যেন না পড়ে।—ব'লেই সে ত্রস্ত পদে স্নানের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

সেই চিঠি প'ড়ে অরুণাংশু সারা রাত ঘুমোতে পারলে না; পরদিন সকালটা তার কাটল ছটফট ক'রে। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতেই সে পায়ে হেঁটে প্রতুলবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাড়িতে কেউ নেই। প্রতুলবাবু কাছারিতে গিয়েছেন, ঝি-চাকরেরা তাদের মহলে গিয়েছে বিশ্রাম করতে। কেবল অনামিকার খাস ঝিটি বাইরের ঘরে বোধ করি বা অরুণাংশুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাকে উপরে অনামিকার ঘরে পৌঁছে দিয়েই সেও উধাও হয়ে গেল।

তবু এই খালি বাড়িতেও অনামিকা নিজের হাতে ঘরের দোর বন্ধ ক'রে হুড়কো এঁটে দিলে। কিন্তু তার পরেই অরুণাংশুর ঠিক সামনের আসনটিতে ব'সে সোজাসুজি তার মুখের দিকে চেয়ে অকুণ্ঠিত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি নাকি এয়ার ফোর্সে যোগ দিতে চাচ্ছেন?

আয়োজন দেখেই অরুণাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার উপর প্রশ্নটির

আকস্মিকতা তাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে দিলে। তৎক্ষণাৎ তার মুখে উত্তর ফুটল না।

কিন্তু উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না ক'রেই অনামিকা আবার বললে, আপনাকে আমি বারণ করব না। কিন্তু দোহাই আপনার, এ ভাবে এ সময়ে আপনি যাবেন না। বিয়েটা আগে হয়ে যাক; তার পর যেতেই যদি আপনি চান, আমি নিজের হাতে আপনাকে সাজিয়ে দেব।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত বললে, এ তুমি কি বলছ, অনু?

অনামিকা উত্তরে বললে, খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছি আমি। এ সময়ে এ ভাবে যুদ্ধে যেতে পাবেন না আপনি। গেলে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

অরুণাংশু চমকে উঠল; ব্যাকুল স্বরে সে বললে, কি হয়েছে, অনু? কে কি বলেছে তোমাকে?

না, কেউ কিছু বলে নি।—অনামিকা উত্তর দিলে, আমি নিজেই বলছি, দোহাই আপনার, আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে চ'লে যাবেন না আপনি।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত বললে, কি বলছ তুমি? এরা তোমায় বলেছে নাকি যে, তোমার উপর রাগ ক'রে আমি যুদ্ধে যেতে চাচ্ছি?

না।—অনামিকা বললে, কেউ আমায় কিছু বলে নি। নিজের গরজেই আপনাকে আমি বলছি। আমায় যত সাজা আপনি দিতে চান সব আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু বিয়ের পর। বিয়ের আগে আপনাকে যুদ্ধে আমি যেতে দেব না।

এ রকম একটা অবস্থার জন্য অরুণাংশু মোটেই তৈরি ছিল না; সে স্তম্ভিত স্বরে বললে, আমি তো—মানে, কিছুই তো ঠিক করি নি এখনও। কেবল—

তা হ'লে তো কথা দেওয়া আপনার পক্ষে আরও সোজা।—অনামিকা বাধা দিয়ে বললে, আর বেশি কিছু তো চাই নি আমি,—চির দিনের মত আপনাকে আমি বাঁধতে চাই নে। কেবল বিয়ে যত দিন না হয় তত দিন যুদ্ধে যেতে পাবেন না আপনি। এইটুকু প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতেই হবে।

অরুণাংশু বার দুই ঢোঁক গিলবার পর মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি পরে বলব, অনু।

কিন্তু অনামিকা মাথা নেড়ে বেশ একটু জোর দিয়েই বললে, না, পরে নয়—আজই—এক্ষুনি আপনাকে কথা দিতে হবে।

মুখ নামিযে দু-তিন মিনিট কাল চুপ ক'রে ব'সে রইল অরুণাংশু; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে বললে, বুঝেছি, অনু, আমার মা আবার তোমায় বিপদে ফেলেছেন।

কিন্তু এবারও অনামিকা প্রতিবাদ ক'রে বললে, না, তিনি আমায় কিছুই বলেন নি।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত আবার কিছুক্ষণ অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িযে বললে, থাক্ তবে, আর কারও কথা এর মধ্যে টেনে আনব না আমি। আর আমি নিজেও তোমায় কোন বিপদে ফেলব না,—যেটুকু করেছি তারই লজ্জা রাখবার ঠাঁই পাচ্ছি নে আমি। বেশ, তোমায় কথা দিলাম—যুদ্ধে আমি যাব না, আগের মত ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক ফ্রণ্টেই আমি কাজ করব।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে সে জানলার কাছে চ'লে গেল।

বৈশাখের দুপুর। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ কোথাও নেই। রোদে কলকাতা শহরটা তেতে উঠেছে,—হাওয়া ছুটছে যেন আগুনের হল্‌কা। এ দিকটাতে এমনিতেই লোকজনের বসতি কম,—এখন পথে একেবারেই লোক নেই। শব্দের মধ্যে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ থেকে মাঝে মাঝে ট্রামের ঘরঘর শব্দ অস্পষ্ট হযে ভেসে আসছে মুমূর্ষু পৃথিবীর অস্ফুট গোঙানির মত। অদূরে দেশপ্রিয় পার্ক মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করছে।

সেই দিকে চেয়ে অরুণাংশু কিছুক্ষণ ওই জানলার ধারেই স্তব্ধ হযে দাঁড়িয়ে রইল; তার পর ফিরে আবার অনামিকার কাছে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক রকম হাসি হেসে বললে, ভেবো না, অনু, আমা দ্বারা তোমার একটুও ক্ষতি হবে না। একটা অসাধারণ, অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমায় আমি আত্মসাৎ করব না,—যাকে তুমি ভালবাস না, তারই স্ত্রী হবার দুর্ভাগ্য তোমায় ভোগ করতে হবে না।

অনামিকা চমকে উঠেছিল, মুখ লাল ক'রে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি তাই বলেছি না কি!

ও, বল নি নাকি!—বলতে বলতে অরুণাংশুর ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, বেশ, বেশ, আমার কথাটা আমি তা হ'লে ফিরিয়েই নিচ্ছি। কোন রকমেই তোমায় আমি খাটো করব না, সব দায় নেব নিজের ঘাড়ে। বেশ, আমিই বিয়ে করব না। এবার নিশ্চিন্ত হ'লে তো তুমি?

কিন্তু এ কথা শুনতে শুনতে অনামিকার আরক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেল; অর্ধেকটা চোখ তুলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, বিয়ে আপনি করতে চাচ্ছেন না কেন?

উত্তরে অরুণাংশু শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললে, আবার ও প্রশ্ন কেন, অনু? শেষের কথাটাই তো তোমায় ব'লে দিয়েছি।

অনামিকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল; সোজাসুজি অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, না, এড়িয়ে যেতে পারবেন না আপনি। গোড়া থেকেই আপনি এই রকমের কথা বলছেন,—আমি জানি যে, আপনার মত নেই ব'লেই বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু কেন? কথাটা আজ আমি শেষ করতে চাই। বলুন, কেন বিয়ে করতে চান না আপনি?

অরুণাংশুর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন হিংস্র হয়ে উঠল; ভুরু কুঁচকে, নীচের ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে নীরস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, কারণ নিছক নারী-মাংসের উপর লোভটাকে ধর্ম-হিসাবে আমি অনুশীলন করতে পারি নি,—যে মেয়ে আমায় ভালবাসতে পারে নি, শুধু বিয়ের মন্ত্রের চালবাজির সাহায্যে তারই মনহীন সুন্দর দেহটাকে ভোগের জন্যে চির দিনের মত দখল করবার মহৎ নীতিটাও নয়।

অনামিকা কিন্তু শুনতে শুনতে হেসে ফেললে; বললে, থামলেন কেন? ওইটুকুতেই সব বলা হয়ে গেল না কি?

অনামিকার ওই হাসিটুকুই যেন হঠাৎ অরুণাংশুকে একেবারে নিরস্ত্র ক'রে দিলে। অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে সে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই অনামিকা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললে, থাক্ থাক্,

কৈফিয়ৎ আর দিতে হবে না। আপনি নিজেই জানেন যে, কোন দায়ই আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন না। কিন্তু কথা আমি বাড়াতে চাই নে। কেবল আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি? কি আপনি আমার কাছে চেয়েছিলেন যা পান নি?

অরুণাংশু মুখ তুলে অনামিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে; ক্ষোভের স্বরে বললে, এত দিনেও কিছুই যদি তোমায় বোঝাতে না পেরে থাকি, তবে আজও পারব না।

অনামিকার ঠোঁট দুখানি এক বার যেন অল্প একটু কেঁপে উঠল; কিন্তু শান্ত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, আমিও তো ঠিক সেই কথাই বলতে পারি।

অরুণাংশু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মুখ ফিরিয়ে বললে, তুমি!

অনামিকা চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, কথা দিয়ে আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। এতে যদি সংশয় আপনার দূর না হয়, না-ই হবে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমায় বিমুখ মনে ক'রে বিলাস-ব্যসনের ঘুম দিতে এসে আমার সঙ্গে নিজেকেও আর যেন ছোট করবেন না।—বলতে বলতে অনামিকার গলাটা কেঁপে গেল।

অরুণাংশু বিহ্বলের মত বললে, এ কি বলছ, অনু?

মুখখানি আরও একটু নত ক'রে অনামিকা উত্তর দিলে, আর সব দুঃখ আমি সইতে পারব; কিন্তু আমার মত তুচ্ছ একটি মেয়ের জন্যে আপনার জীবনের ব্রত যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ আমার কিছুতেই সইবে না।

অরুণাংশু স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয়, স্বপ্নের ঘোরও চোখে লেগে থাকে, বাস্তবটাকেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অবস্থা হ'ল তার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে তার কথাই ফুটল না; তার পরেও সংশয়ের স্বরেই সে বললে, এ কি সত্য! ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া যে অরুণাংশুটাকে তার নিজের বাপ-মা পর্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতে পারলে না, তাকেই তোমার ভাল লাগল!

অনামিকা মুখ তুললে না; কিন্তু মৃদু স্বরে সে বললে, বলেছি তো,

এত দিনেও যা আমি বোঝাতে পারি নি, আজ শুধু মুখের কথায় তা আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাব ?

না, অনু।—অরুণাংশু সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে অনুনয়ের স্বরে বললে, বলতে হবে তোমাকে, অন্তত একটিবার মুখ ফুটে বলতে হবে। আমার ছন্নছাড়া জীবনের সাথী হতে পারবে তুমি? দুঃখের পথে, দারিদ্র্যের পথে, জীবন-মরণপণ-সংগ্রামের পথে আমার সঙ্গে তুমি পথ চলতে পারবে ?

অনামিকা চকিতে একবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়েই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল; গাঢ় স্বরে বললে, হিন্দুর মেয়ে স্বামীর সহধর্মিণীই হতে চায়, খেলার পুতুল বা বিলাসের সঙ্গিনী তো নয়।—ব'লেই মুখ ফিরিয়ে সে দূরে বইয়ের আলমারিটার কাছে চ'লে গেল।

অরুণাংশু আর ব'সে থাকতে পারলে না; একবার জানলার কাছে গিয়ে অস্থির চোখে বাইরের দিকে তাকাল সে; তার পর ধীরে ধীরে অনামিকার কাছে ফিরে গিয়ে মৃদু স্বরে বললে, আমিই তোমায় বুঝতে পারি নি, অনু; না বুঝে তোমার উপর অবিচার করেছি, তোমায় সত্যি অপমানও করেছি। আমার সে সব অপরাধ তুমি মাপ করতে পারবে তো!

অনামিকার সারা শরীরটাই থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, আমাকেই মাপ করুন আপনি, দোষ তো আমারই বেশি।

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তোমার দোষের কথা ব'লে আমার দোষের বোঝা আর বাড়িয়ো না, অনু; অমনিতেই এ বোঝা আমার দুর্বহ হয়ে উঠেছে।

থাক্ তবে।—অনামিকা এবার মুখ তুলেই বললে, ও-কথার আলোচনাই আজ নিরর্থক। কিন্তু—। ব'লে একটু চুপ ক'রে রইল সে; তার পর কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনার কাছে একটা অনুরোধ যদি করি, রাখবেন ?

কি অনুরোধ, অনু ?

অরুণাংশু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে। তার চোখের দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠল তা কেবল বিস্ময়ই নয়, আতঙ্কও।

কিন্তু অনামিকার চোখ ছুটি চাপা হাসির আলোকে চিকচিক ক'রে জ্ব'লে উঠল। এক বার অরুণাংশুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে দিলে সে; একটু দূরে স'রে গিয়ে শাড়ির একটা কোণ দুই হাতের কম্পিত আঙুল কটি দিয়ে দড়ি পাকাবার ভঙ্গিতে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার কটাকে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, এ কদিন বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করেছেন আপনি। আমি খুশি হব মনে ক'রে এখন আবার উল্টো দিকে বাড়াবাড়ি শুরু করবেন না যেন, করতেই যদি হয় তো সে বিয়ের পরে করবেন।

প্রথমে অরুণাংশু কথাটা যেন বুঝতেই পারলে না; কিন্তু একটু পরেই শব্দ ক'রে হেসে উঠে সে বললে, আবার প্রতিশ্রুতি চাও কেন, অনু? আগেই তো কথা দিয়েছি যে, কোন মতেই তোমায় আর আমি বিব্রত করব না।

কিন্তু হাসি থামলে মুখখানাকে একটু অতিরিক্ত রকমেই গম্ভীর ক'রে সে আবার বললে, কিন্তু একটা বাড়াবাড়ি আজ আমি করতে চাই, অনু।

এবার অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কি?

আজ কাকাবাবু ফিরে এলে, চল, দুজনে যুগলে তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ নিই গে।

বলতে বলতে চেষ্টা ক'রেও হাসি আর চাপতে না পেরে অরুণাংশু শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেললে।

কিন্তু অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, ছিঃ!

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে সে আবার বললে, আমার লজ্জা করে না বুঝি!

অরুণাংশু আবার শব্দ ক'রেই হেসে উঠে বললে, লজ্জা আবার কি! আমিও তো তোমার সঙ্গেই থাকব।

দরকার নেই।—বলতে বলতে অনামিকা আরও একটু দূরে স'রে গেল; কিন্তু সেখান থেকেই অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, আপনি এখন দয়া ক'রে বাড়ি যান তো, বাবার ফিরবার সময় হয়ে এল।

অরুণাংশু কৌতুকের স্বরে বললে, যদি না যাই!

[illegible] আমিই যাচ্ছি।—বলতে বলতে অনামিকা সত্যই দোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে খলাৎ ক'রে বন্ধ কবাট দুখানি দু ফাঁক ক'রে খুলে ফেললে। কিন্তু বেরিয়ে যাবার জন্ত পা বাড়িয়েও আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বললে, সত্যি, বাবা এসে দেখলে বড্ড লজ্জা করবে আমার।

অরুণাংশু বিব্রত হবার ভান ক'রে বললে, কিন্তু কথাটা তো তাঁর সঙ্গেই পাকা করতে হবে।

না, হবে না।—অনামিকা আবার লাল হয়ে উঠে মাথা ঝেঁকে বললে।

অরুণাংশু উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অনামিকা আবার তার মুখের দিকে চেয়ে অনুনয়ের স্বরে বললে, কিচ্ছু করতে হবে না তোমায়, কেবল মাকে ব'লো, তিনিই সব ঠিক ক'রে দেবেন।

সত্যই অরুণাংশুকে খুব বেশি কিছু করতে হ'ল না। চলতি চাকা এক কোঁটা তেলের অভাবে থেমে গিয়েছিল, তেলটুকু পডতেই তা আবার চলতে শুরু করলে। অরুণাংশু গিয়ে বললে মহামায়া দেবীকে, সে যুদ্ধে যাবে না, বিয়েও করবে। মহামায়া দেবী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পরে মনের খুশি মনের মধ্যেই গোপন ক'রে গম্ভীর স্বরে বললেন, দেখি আবার ওদের ব'লে। যে কাণ্ড তুমি করেছ, ঠাকুরপোর মন ভেঙে না গিয়ে থাকলে বাঁচি।

আশঙ্কা তাঁর সত্যই ছিল; তবু সেটা গোপন ক'রে হাসিমুখেই প্রতুল-বাবুকে তিনি বললেন, দেখ ঠাকুরপো, আমার কথা সত্য হ'ল কি না! অনু নিজে মুখ ফুটে বলতেই অরুণের মত ফিরে গিয়েছে, এখন আর তর সইছে না তার।

আগের দিনের ইতিহাসটা প্রতুলবাবুর জানা ছিল না; তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, অনু ওকে বলেছ নাকি?

মহামায়া দেবী প্রতুলবাবুর মুখের উপর একটা কটাক্ষ হেনে উত্তর দিলেন, বলে নি আবার,—কোন কথা বলতে বাকি রেখেছে? একালের ছেলেমেয়ে নয় ওরা!

তথাপি প্রতুলবাবুর সংশয় ঘুচছে না দেখে তিনি আবার বললেন, বিশ্বাস

না হয় অম্বুকে ডেকে নিজেই জিজ্ঞেস কর না তুমি,—এখনই কথাটা পাকা হয়ে যাক।

ব'লেই প্রতুলবাবুর সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই নিজেই তিনি 'অম্বু' 'অম্বু' বলে ডাকতে শুরু ক'রে দিলেন। অনামিকার সাড়া না পেয়ে শেষে নিজেই উঠে গিয়ে ভিতর থেকে তাকে ধ'রে নিয়ে এলেন তিনি; এসেই বললেন, আমায় দেখেই ও কোথায় পালিয়েছিল, জান, ঠাকুরপো?—একেবারে ভাঁড়ার ঘরে। কিন্তু আমার মত শক্ত পেয়াদার চোখ এড়ানো অত সোজা নয়,—ঠিক ধ'রে ফেলেছি আমি।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই প্রতুলবাবু বুঝতে পারলেন যে, মহামায়া দেবী মিথ্যা কথা বলেন নি। কিন্তু এ রকম একটা অবস্থার জন্য তিনি মোটেই তৈরি ছিলেন না। মাথাটা তাঁর গুলিয়ে গেল; গলাটা শুকিয়ে হয়ে গেল যেন কাঠ। অনেকখানি চেষ্টা ক'রে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, অম্বু, অরুণ এখানে এসেছিল না কি?

অনামিকা মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, হ্যাঁ, বাবা, আমিই ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

মহামায়া দেবী স্মিত মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, শুধু ওইটুক বললেই হবে না, মা,—একেবারে পাকা কথা আজ আমি আদায় ক'রে নিতে এসেছি, দিন-ক্ষণ ঠিক ক'রে তবে যাব।

অনামিকা কথা বললে না, কিন্তু তার আরক্ত মুখখানি আরও লাল হয়ে উঠল।

দেখে প্রতুলবাবু নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, থাক্, বউদি, ওকে আর কেন মিছামিছি—

না, ঠাকুরপো। মহামায়া দেবী বাধা দিয়ে বললেন, যতই দেরি করছি ততই সব অনর্থ ঘটছে। আজ আমি বাপ-মেয়ে দুজনের সামনেই কথাটা পাকা ক'রে যেতে চাই। বল, অম্বু, বিয়ের দিন আমি ঠিক করব তো?

বাপের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে দেখলে অনামিকা; তার পর ঘাড়টা একটু কাত ক'রে অস্ফুট স্বরে বললে, করুন।—ব'লেই সে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

এর পর প্রতুলবাবু হয়তো আর আপত্তি করতে পারতেন না; মহামায়া দেবী পরের দিনই গায়ে-হলুদের আয়োজন করতে চাইলেও নিজের মনের সকল আশঙ্কা ও সকল অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনামিকার ওই শেষের কাণ্ডটার কথা ভেবেই হয়তো তিনি সম্মতি দিয়ে ফেলতেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন রমেনবাবু। মহামায়া দেবীর সকল আনন্দ, সকল উৎসাহের উপর অনেকখানি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে কর্তৃত্বের কঠোর স্বরে তিনি বললেন, এটুকুই এখনকার মত যথেষ্ট হয়েছে,—বিয়ে এখন হতে পারবে না।

মহামায়া দেবী আকাশ থেকে পড়বার মত হয়ে বললেন, এ কি বলছ তুমি?

রমেনবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, অন্তত ছ মাস অরুণের চালচলন ভাল ক'রে লক্ষ্য না ক'রে তার বিয়ে আমি দেব না। আমার এ কথার উপরে কোন কথা ব'লো না তুমি, বললে তার মর্যাদা থাকবে না।

রমেনবাবুর এ মুখ আর এ গলার আওয়াজ মহামায়া দেবীর অচেনা নয়। তিনি বুঝলেন যে, এ কথার আর প্রতিবাদ চলবে না। প্রতিবাদ তিনি করলেনও না। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর গাঢ় স্বরে বললেন, ঘাটে আসবার মুখে তরী ডোবাবে তুমি? এত চেষ্টা-যত্ন ক'রে যে বিয়ে আমি ঠিক করলাম, তুমি নিজেই তা ভেঙে দেবে?

রমেনবাবু আগের মতই গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, বিয়ের তারিখ ছ মাস পিছিয়ে দিলে বিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় না। প্রতুলকে খবর দাও তুমি, আমি তাকে সব বুঝিয়ে বলব।

মহামায়া দেবী আর কোন কথা না ব'লে বাইরে যাবার উপক্রম করেছিলেন, কিন্তু রমেনবাবুই তাঁকে ডেকে ফিরিয়ে আবার বললেন, হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি এবার এলাহাবাদে ফিরে যাব।

মহামায়া দেবী বিহ্বলের মত বললেন, তার মানে?

রমেনবাবু উত্তরে বললেন, তার মানে—এখানে আর আমার মন টিকছে না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি নিজে এখানেই থাকতে পার; কিন্তু আমি কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরে যেতে চাই।

মহামায়া দেবী বিরক্ত হয়ে বললেন, এ ঢঙ আবার করা কেন? তোমার

মত রোগা মানুষকে খালি বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আমি এখানে থাকতে পারি নাকি!

রমেনবাবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, তবে তুমিও চল। বাড়িতে বিয়ের জন্য আয়োজনও তো করতে হবে।

রাত্রে মহামায়া দেবীর সাক্ষাতেই রমেনবাবু প্রতুলবাবুকে বললেন, কথা আমাদের হয়েই রইল, প্রতুল; একটা ভাল দিন পেলেই আমরা দুজনে তোমার বাড়িতে গিয়ে বিধিমত আমার অনু-মাকে আশীর্বাদ ক'রে আসব। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে, ভাই; বিয়েটা আপাতত কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকবে।

প্রতুলবাবুর কাছে এটা একটা অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ; তিনি এমন চমকে উঠলেন যে, উত্তরে একটা কথাও তিনি মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারলেন না।

একটু পরে রমেনবাবুই আবার বললেন, পারলে একটা দিনও আমি দেরি করতাম না; কিন্তু এমনি দুর্দৈব যে, এখন কিছুদিন বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।

কিছু একটা কথা বলবার জন্যই যেন প্রতুলবাবু বললেন, কেন, রমেনদা?

আড়চোখে মহামায়া দেবীর মুখের অবস্থাটা দেখে নিয়ে রমেনবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, তোমরা তো এ সব মান না, ভাই,—বিলাত থেকে তুমি সাহেব হয়ে ফিরে এসেছ। কিন্তু আমাদের মত সেকেলে মানুষ এ সব না মেনে পারে না। দৈবজ্ঞ বলেছেন, সামনে ক মাস অকাল; তার উপর অরুণের গ্রহও অপ্রসন্ন হয়ে আছেন; এ সময়ে ওর বিয়ে দিলে তার ফল শুভ না-ও হতে পারে।

প্রতুলবাবু ও মহামায়া দেবী এক সঙ্গেই চমকে উঠলেন। প্রতুলবাবু বললেন, তা হ'লে তো বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না!

মহামায়া দেবী বললেন, এ সব কথা তুমি আমায় আগে বল নি কেন?

উত্তরে রমেনবাবু অভিযোগের মত ক'রে বললেন, বলবার অবসর তুমি আমায় দিচ্ছ কোথায়? চলেছ তো পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে; আমি পায়ে হেঁটে তোমার নাগাল পাব কেন!

ফিরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, খুব বেশি

দিনের কথা নয়, প্রতুল, মাস তিনেকের মধ্যেই এ সব দুর্যোগ কেটে যাবে। তারপর ধীরে-সুস্থে দিন-ক্ষণ ঠিক করা যাবে।

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মুছতে মুছতে ওরই আড়ালে বার দুই ঢোঁক গিলে তবে প্রতুলবাবু উত্তর দিলেন, তাই ভাল, রমেনদা, আমি তো কোনদিনই তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে চাই নি।

অথচ—। রমেনবাবু আবার মহামায়া দেবীর মুখের দিকে চেয়ে পরিহাসের স্বরে বললেন, তোমার বউদি এ দিকে ভেবে ম'রছিলেন যে, তুমি হয়তো আর একটি দিনও সবুর করতে চাইবে না।

প্রতুলবাবু বিদায় নিয়ে উঠবার আগে রমেনবাবু তাঁর দ্বিতীয় সঙ্কল্পটিও তাঁকে শুনিয়ে দিলেন। উপসংহারে বললেন, অরুণকে রেখে যাব তোমার জিম্মায়; আর—। বলতে বলতে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন; অনেকক্ষণ পর তাঁর ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল; এক চোখ মহামায়া দেবীর এবং আর এক চোখ প্রতুলবাবুর মুখের উপর রেখে কথাটা তিনি শেষ করলেন, আর আমার অনু-মায়ের—

৩

কমলাকে সুভদ্রা বলেছিল যে, সে কলকাতায় এসেছে প্র্যাক্‌টিস করতে, জীবনটাকে একেবারে ঢেলে সাজবার জন্য। কথাটা যে সে বাড়িয়ে বলে নি, তা প্রমাণ করবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। হুগলীর সঙ্গে তার সব সম্বন্ধ সে চুকিয়ে দিয়েছিল; আর ওই হুগলীর সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক জগৎটার সঙ্গেও। লাল ঝাণ্ডা আর মজদুর নিয়ে কোন দিন যে সে হৈ-হৈ ক'রে বেড়িয়েছে তার কোন প্রমাণই সে অবশিষ্ট রাখে নি। ডাক্তার চৌধুরীর কাছ থেকে সে যে সব পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিল, তাই নিয়ে সে বড় বড় ডাক্তারদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল,—আশা যে, ওদের জোরে যদি কিছু কেস পাওয়া যায়।

কিন্তু আসলে কলকাতায় সুভদ্রার মোটেই ভাল লাগছিল না। সেটা ঠিক কলকাতার কোন দোষের জন্য নয়। আসল কারণ, অতীতের সঙ্গে তুলনায়

তার বর্তমানের জীবনটা ছিল নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। হুগলীতে সে কেবল নার্সই ছিল না, ছিল সেখানকার মজদুর-সংঘের অন্যতম সক্রিয় কর্মীও। তার উপর সেখানে সে আবার ছিল সকলের দিদিমণি। বৈষম্য-ভিত্তিক এই পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজটাকে ভেঙে দুঃখ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্যমুক্ত অভিনব এক সমাজ সৃষ্টি করবার সুমধুর এক স্বপ্নের উন্মাদনায় আরও অনেকের সঙ্গে সেখানে সে দেশ ও দশের কাজে জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পেরেছিল। সেখানে তার হাসপাতালের কাজ আর বাইরের রোগীর সেবা ছিল মহত্তর জীবনধর্মের সেই অনন্যচিত্ত অনুশীলনেরই অবিচ্ছেদ্য একটা অঙ্গ। কিন্তু কলকাতায় যে জীবন সে যাপন করছিল, তার স্বরূপটাই ছিল অন্য রকমের—এ যেন প্রাণহীন একটা দেহ মাত্র। সে ছিল একটা ব্রত—এ একটা জীবিকা; সে ছিল নিরলস একটা সাধনা—এ নিছকই কায়িক পরিশ্রম; সে ছিল সুমহান একটা আত্ম-সমর্পণ—এ কেবলই উদরচর্যা। জীবনধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট দার্শনিক ভিত্তিহীন কায়িক পরিশ্রমের কাজটা রোগীর সেবা হ'লেও সুভদ্রার মন ওর মধ্যে যেন এক ফোঁটা মধুও খুঁজে পাচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই তার মনে হচ্ছিল যে, আদর্শের সঙ্গে যোগ হারিয়ে তার জীবনটা একেবারেই যেন নিরর্থক হয়ে গিয়েছে।

সরস মাটির বুক থেকে উপড়ে-তোলা তাজা পরিণত লতাটির মত সুভদ্রা তার পেশাদার নার্সের শ্রমসর্বস্ব জীবনের নীরস কঠিন মাটির মধ্যে চেষ্টা ক'রেও শিকড় গেড়ে পাকা হয়ে বসতে পারছিল না।

হুগলীর কথা প্রায়ই তার মনে পড়ত। সেই কারখানা, সেই হাসপাতাল, সেই বস্তি, সেই তার গুণমুগ্ধ ভক্তের দল—'দিদিমণি' বলতেই প্রতি বারেই চোখ যাদের ছলছল ক'রে আসত। মনে হ'লেই বুকটা তার টনটন করতে থাকত; মাঝে মাঝে তার অনুতাপ হ'ত—অন্তত শ্যামাচরণের কাছেও নিজের ঠিকানাটা যদি সে রেখে আসত তবে ওই সূক্ষ্ম সুতোটুকু অনুসরণ ক'রেই কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এখানেও তার সঙ্গে দেখা করতে আসত—হয়তো শ্যামাচরণ, হয়তো সুবোধ, হয়তো অরুণাংশুও,—কে জানে!

তার উপর আবার নিজের সমস্যা। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে তার অস্বস্তির অন্ত ছিল না। তারই দেহ থেকে তিল তিল ক'রে উপাদান আহরণ ক'রে তার জরায়ুর মধ্যে সন্তান তার ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে—নিজের

বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সেই অজাত শিশুর ছোট বুকের মৃদু স্পন্দনের শব্দও মাঝে মাঝে সে যেন স্পষ্ট শুনতে পায়; সঙ্গে সঙ্গেই তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজে সে শিক্ষিতা নার্স; তার উপর নিজস্ব একটা ঘর পেয়ে গিয়েছে ব'লে নিজের অবস্থাটা এখনও সে কমলার কাছ থেকেও গোপন রাখতে পেরেছে। কিন্তু এমন ক'রে আর যে বেশি দিন চলবে না, তা সে বেশ বুঝতে পারে। ধরা পড়বার আগেই কমলাকে সব কথা সে খুলে বলবে, না আর একটা ছুতা ক'রে এখান থেকেও আবার সে পালিয়ে যাবে, তা সে ঠিক করতে পারছিল না।

তথাপি দিনও কাটছিল,—দেখতে দেখতে দুটি মাসই কেটে গেল। কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। দুটি-একটি ক'রে কেসও তার জুটে যেতে লাগল। তার নিরলস কর্মপ্রবণতা আর ব্যাঙ্কের খাতাখানির উপর অপরিসীম অনুরাগ লক্ষ্য ক'রে অমন যে কমলা, তারও শেষ পর্যন্ত মনে হতে লাগল যে, সুভদ্রার সম্বন্ধে যা সে অনুমান করেছিল, হয়তো তা ঠিক নয়—হয়তো সুভদ্রা একেবারেই কাউকে ভালবাসে নি, অথবা বেসে থাকলেও কোনও কারণে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ সত্যই সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। শেষের দিকে কমলা ওই প্রসঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে রসিকতা করাও ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন একটা অসাধারণ ঘটনা কমলার মনের সুষুপ্ত কৌতুক-প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে আবার সচেতন ক'রে তুললে।

সকালে কমলা তাদের আপিস-ঘরে ব'সে বাইরের একটি লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। লোকটি কমলাকে কল্ দিতে এসেছে অথচ কমলার উপযুক্ত দক্ষিণা সে দিতে রাজী নয়। তার দর-কষাকষির ধরন দেখে অবশেষে কমলা ধৈর্য হারিয়ে স্পষ্ট ক'রেই ব'লে ফেললে, না, মশায়, আমার বাঁধা রেট,—যা বলেছি ওর এক পয়সা কম হ'লেও যেতে পারব না।

এতেও লোকটি অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক্, বরং আপ্যায়নের ভঙ্গিতেই মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা,—আর একটা টাকা না হয় বেশিই দেওয়া যাবে। আপনি যখন—

না, মশায়।—কমলা এবার আগুনের মত জ্ব'লে উঠে বললে, হবে না। এটা কি আপনি—

বাকি কথাগুলি তার মুখেই আটকে গেল; ঠিক সেই সময়েই বাইরের দিকের খোলা দরজা দিয়ে অপরিচিত একটি যুবক ঘরে এসে ঢুকল।

নিজেকে সামলে নিয়ে কমলা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কাকে চান আপনি?

যুবকটি কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সুভদ্রা দেবী কি এই বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন।—কমলা উত্তরে বললে, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

হুগলী থেকে।

হুগলী!

কমলার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অতিরিক্ত রকমে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এমন ভাবে যুবকটির দিকে সে তাকাল যেন চিড়িয়াখানা কি ওই রকমের একটা জায়গায় অদৃষ্টপূর্ব একটা জানোয়ারকে দেখে ওর কৌতুক আর কৌতূহল এক সঙ্গেই তীব্র হয়ে উঠেছে।

যুবকটি কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি কি তাকে কল্ দিতে এসেছেন?

আজ্ঞে না।

তবে?

অমনি একবার—

দেখা করতে এসেছেন বুঝি?—বলতে বলতে কমলার চোখের কোণে এবার দুষ্টামির হাসি চিক্‌চিক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

যুবকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে না; অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই বাড়িতেই থাকেন তো?

হ্যাঁ।—কমলা এবার প্রকাশ্যেই হেসে ফেলে বললে, ভুল হয় নি আপনার। তিনি এখানেই থাকেন এবং এখন বাড়িতেই আছেন; বসুন আপনি, আমি এক্ষুনি তাঁকে খবর দিচ্ছি। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না—

বলতে বলতে কমলা নিজেই উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু তখনই আবার তার চোখ গিয়ে পড়ল তার নিজের মক্কেলের উপর, লোকটি তখনও ঠায় ব'সে রয়েছে।

বিরক্তিতে কমলার মুখখানা আবার কালো হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে

মনোযোগের সঙ্গে শুনে ক'রে সে বললে, বেশ, যাব আমি। বিকেল তিনটায় যেতে হবে তো? দিন আপনার ঠিকানাটা, এই কাগজে লিখে দিন,—ও, কার্ড আছে আপনার? বেশ, ঠিক সময়েই যাব। আচ্ছা, নমস্কার।

লোকটিকে বিদায় ক'রেই কমলা আবার যুবকটির দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, মাপ করবেন, একটু দেরি হয়ে গেল আমার। বসুন আপনি, সুভদ্রাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নানের পর সুভদ্রা তখন নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করছিল। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে,—গায়ে ছিটের আঁট-সাঁট ব্লাউজ, পরনে ফুল-পাড়ের সাদা শাড়ি, আঁচলখানা বুক ঘিরে, বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে; তার উপর ছড়িয়ে পড়েছে আধ-ভিজে কালো চুলের রাশি; সদ্যস্নানের স্নিগ্ধতামাখা সম্পূর্ণ মুখখানি আয়নার বুকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে; প্রতিফলিত মুখখানি কমলা দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেলে।

পলকের জন্য এক বার থমকে দাঁড়াল সে; কিন্তু পরক্ষণেই পদ্মার প্রচণ্ড একটি ঢেউয়ের মত ছুটে এসে দুই হাতে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধ'রে সে বললে, শীগগির, শুভা, শীগগির।

সুভদ্রা চমকে উঠল; তার হাতের চিরুনি ঠক্ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল: সন্ত্রস্তের মত সে বললে, কি রে!

কিন্তু মুখ ফিরাতেই তার চোখ দুটি গিয়ে মিলল কমলার চোখের সঙ্গে, কৌতুকের হাসি সে চোখ থেকে তুবড়ির ফুলকির মত ছিটকে পড়ছে। সুভদ্রা কিছুই বুঝতে না পারলেও কেমন যেন লজ্জিত হয়ে বললে, আ মরণ, হ'ল কি তোর! হঠাৎ পাগল হয়ে গেলি নাকি?

কমলা উত্তর দিলে না, কিন্তু সুর ক'রে গেয়ে উঠল, শুভ দিন ভেলা—

আঃ, ছাড়্ না!—সুভদ্রা আরও বিব্রত হয়ে বললে, কি যে বলিস!

কিন্তু কমলা সুভদ্রাকে ছেড়ে দিলে না, বরং আরও জোরে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, একটা সু-খবর যদি দিই,—কি খাওয়াবি?

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য আর একবার চেষ্টা ক'রেও কোন ফল হ'ল না দেখে সুভদ্রা অগত্যা কাতর স্বরে বললে, যা তুমি খেতে চাও তা-ই খাওয়াব,—সু-খবরের জন্য যতটা, ছেড়ে দিলে তার চেয়েও বেশি।

কিন্তু এতেও কমলা তাকে ছেড়ে দিলে না ; কেবল তার বাহুবন্ধনটিকে ঈষৎ একটু আল্‌গা ক'রে সুভদ্রার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে, শীগগির যা, তোকে ডাকছেন।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কে ?

কে আবার ! কমলা ভ্রূভঙ্গি ক'রে উত্তর দিলে, তোমার উনি।

কে !

তোমার উনি গো, যার জন্ত যৌবনে তুমি যোগিনী হয়েছ।

ধেৎ ! সুভদ্রা মুখ লাল ক'রে একটা ঝটকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে, একটু দূরে স'রে গিয়ে বললে, বাজে ব৷কস নে বলছি।

বাজে নয় গো।—কমলা মুখ-চোখের বিশেষ একটা ভঙ্গি ক'রে বললে, সত্যি তোমার 'উনি' এসেছেন হুগলী থেকে,—আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। তাঁকে বসিয়েই তো আমি আসছি।

চক্ষের পলকে সুভদ্রার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল ; শরীরটা হয়ে গেল যেন পাথর ; উত্তরে একটি কথাও বলতে না পেরে পাথরের মূর্তির মতই নিষ্পলক চোখে কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

দেখে কমলাই মুচকি হেসে সুভদ্রার চিবুকটা আলগোছে একবার নেড়ে দিয়ে সকৌতুক কণ্ঠে বললে, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে ? যা শীগগির।

এতেই সুভদ্রার চৈতন্ত ফিরে এল। পাশের চৌকিখানার উপর ব'সে প'ড়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, যাও কমলা, এখন আমায় বিরক্ত ক'রো না। আমার কাজ আছে।

কমলার চোখ আর ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু আরও বেশি তীক্ষ্ণ, আরও বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল ; কিন্তু গাম্ভীর্যের ভাণ ক'রে সে বললে, আমিও কাজের কথাই তোমায় বলতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন তার সঙ্গে দেখা করবে না, তখন যাই, ভদ্রলোককে বিদায় ক'রে আসি।

ব'লেই মুখ ফিরিয়ে সে চলবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু সুভদ্রাই তাকে ডেকে ফিরিয়ে বললে, সত্যি ক'রে বল্‌ তো কমলা, কে এসেছে ?

কমলা হেসে ফেলে বললে; বললাম তো, 'কল্কি' দিতে আসেন নি, হুগলী

থেকে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আবার তোমার 'উনি' ছাড়া কে হবেন ?

সুভদ্রা আবার কুণ্ঠিত হয়ে বললে, যাও।

কমলাও তৎক্ষণাৎ আবার গাম্ভীর্যের মুখোস প'রে বললে, যাচ্ছিলামই তো, তুমিই তো ডেকে ফিরালে আমায়। বেশ, এবার যাচ্ছি ; তবে আগেই ব'লে যাচ্ছি, এবার ডাকলেও ফিরে আসব না।

কিন্তু এইটুকুতেই সুভদ্রা নিজেই উঠে গিয়ে কমলার হাত ধ'রে অনুনয়ের স্বরে বললে, ঠাট্টা নয়, ভাই, সত্যি বল্ তো, কেউ এসেছে ? কে ?

কমলা কৃত্রিম কোপের স্বরে বললে, কি জানি বাপু, তোমারই তো 'উনি', —খুলে কি কিছু বলেন ? শুধু বললেন, তোমাকে তাঁর চাই, আর কাউকে দিয়ে তাঁর কাজ হবে না। তাই তোমায় বলতে এসেছিলাম।

সুভদ্রা তথাপি সংশয়ের স্বরে বললে, তুমি বানিয়ে বলছ, নিশ্চয়ই কেউ আসে নি।

কমলা কণ্ঠস্বরে আরও একটু ঝাঁজ ঢেলে দিয়ে উত্তর দিলে, না, কেউ আসে নি, আমি ভূত দেখে এসেছি ! কিন্তু আমায় ছেড়ে দাও, ভাই, ভূতটাকে আমিই বিদায় ক'রে আসি।

কিন্তু সুভদ্রা কমলাকে কোণের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, না, তুমি এখানেই থাক, আমিই দেখে আসছি।

কমলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, তাই বল। তবে এতক্ষণ যা করছিলে তা বুঝি ঢঙ ?—বাব্বাঃ !—পেটে এত ক্ষিদে নিয়েও মুখে মানুষ এত লাজ দেখাতেও পারে !

সুভদ্রা উত্তর দিলে না ; আঁচলটা খুব ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে কমলার দিকে আর না তাকিয়েই চলতে শুরু করলে সে।

কিন্তু সে বারান্দা পার হতে না হতেই কমলা ভিতর থেকে বললে, একটু দাঁড়াও, সুভদ্রা। কাছে এসে আবার বললে, দেখি, দেখি, চুলটা একটু ঠিক ক'রে দিই ; আজ যে তোমার 'পিয়া মিলনকো'—

ধেৎ !—ব'লে সুভদ্রা আবার তাকে দূরে ঠেলে দিলে ; তার পর তার দিকে আর না তাকিয়েই তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

সুভদ্রা কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কমলার কাছ থেকে পালিয়ে এসেও সে স্বস্তি পেলে না। ব্যাপারটা অসাধারণ, তার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। অরুণাংশু তার সন্ধানে ওই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে, এ কথা মনে করতেও তার নাক-মুখ-কানের ভিতর দিয়ে যেন আগুনের হলকা ছুটে বের হতে লাগল। তার একবার মনে হ'ল যে, সে ঘরে ফিরে যাবে, আর কাউকে দিয়ে বাইরে ব'লে পাঠাবে যে, কারও সঙ্গেই দেখা করবার সময় বা ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু তখনই কমলার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি তার মনে প'ড়ে গেল। মাঝখানে একবার থমকে দাঁড়িয়েও সে আবার চলতে শুরু করলে, কমলার ওই কল্পিত চোখের দৃষ্টিই যেন পিছন থেকে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের খোঁচা দিয়ে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

বাইরের আপিস-ঘরে যেতে হ'লে সিস্টারের ঘরের সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়। সেখানে এসে সুভদ্রা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, সিস্টার ঘরে নেই, দরজায় তালা ঝুলছে। সেই ঘরের সামনে এসে আবার থমকে দাঁড়াল সে; দেয়ালে হেলান দিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল যেন বিশ্রাম করবার জন্য। তার পর পা দুটিকে টেনে নিয়ে গেল আপিস-ঘরের দরজার কাছে। কবাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরের মানুষটিকে একবার সে দেখতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। হতাশ হয়ে সে আবার একটু পিছনে স'রে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই উপর থেকে কমলার গলার আওয়াজ তার কানে এল—ঝি কি চাকর কাকে যেন কি নির্দেশ দিচ্ছে সে। সুভদ্রার বুকটা কেঁপে উঠল, কে জানে, ওই কাণ্ডজ্ঞানহীনা চপলা মেয়েটি এখনই আবার ছুটে নীচে নেমে আসবে কি না! পাছে কমলা এসে তাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আবার একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তোলে, এই ভয়েই নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে সে এক টানেই আপিস-ঘরের কবাট খুলে ফেললে।

ঘরের মধ্যে সুবোধকে দেখে তার বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না।

সুবোধ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত একত্র কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার।

নিজের শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে সুভদ্রা ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল; নমস্কারের প্রতিনমস্কার পর্যন্ত না ক'রে সে বললে, আমি সত্যি

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সুবোধবাবু, কে এসেছে তা বুঝতেই পারছিলাম না কিনা।

সুবোধ হাত গুটিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমায় মাপ করবেন, হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

ওমা, সে কি কথা!—সুভদ্রা নিজেও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, বিরক্ত করলেন কি বলছেন? আপনি এসেছেন, এ তো আমার সৌভাগ্য, কার মুখ দেখেই না জানি আজ উঠেছিলাম!—বলতে বলতে সুভদ্রার মুখখানি সত্যই আন্তরিক আনন্দের আভায় ঝলমল ক'রে জ্ব'লে উঠল। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সে আবার বললে, ও কি, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে! বসুন।

সুভদ্রার মুখের কঠিন গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে সুবোধ প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল; এবার কতকটা আশ্বস্ত হ'ল সে; আসনে বসবার পর আবার যখন সে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল, তখন সে মুখখানি আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সত্যি!—সুভদ্রাই আবার বললে, কমলা গিয়ে আমায় বললে, হুগলী থেকে কে এক জন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিশ্বাসই হ'ল না আমার, হবেই বা কেমন ক'রে? কেউ তো কখনও আসে না!

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনার ঠিকানাটা কেউ জানে না কিনা, তাই—

এবার সুভদ্রাই অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; বললে, সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গিয়েছে আমার। আসার সময় কিছুই তো ঠিক ছিল না, পরে লিখি লিখি ক'রেও চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু—

ব'লে আবার মুখ তুলে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই বা আমার ঠিকানা জানলেন কেমন ক'রে?

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, সে এক রকম গোয়েন্দাগিরি ক'রে। কেউ কিছু বলতে পারছে না দেখে গেলাম আন্দাজ ক'রে ডাক্তার চৌধুরীর কাছে। তিনিও প্রথমে কিছুতেই বলবেন না, অনেক পিড়াপিড়ি করতে তবে বললেন।

তা বটে!—সুভদ্রা আবার অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; ঢোঁক গিলে বললে, তাঁকেও আমি নিষেধ ক'রে এসেছিলাম, শরীরটা তখন খুবই খারাপ ছিল কিনা, নিরিবিলির দরকার ছিল আমার।

সুবোধ বললে, হ্যাঁ, শ্যামাচরণদাও তাই বলছিল বটে।

শ্যামাচরণদা!—ব'লে চমকে মুখ তুলে তাকাল সুভদ্রা; চোখ দুটি তার আবার জ্ব'লে উঠল; আগ্রহের স্বরে সে বললে, কেমন আছে শ্যামাচরণদা? বউদি কেমন? ছেলেমেয়েরা? বলুন, সুবোধবাবু, হুগলীর সব খবর বলুন।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সে তো এক মহাভারত, সুভদ্রা দেবী, শুরু করলে সারা দিনেও তো শেষ হবে না।

না, বলুন আপনি।—সুভদ্রা জিদের স্বরে বললে। তার পর নিজেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলে, কারখানার কথা, হাসপাতালের কথা, তার চেনা মেয়ে-পুরুষ, এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা, সকলের শেষে ইউনিয়নের কথা।

ওই ইউনিয়নের প্রসঙ্গেই অরুণাংশুর কথা এসে গেল। কিন্তু তাতেই আলোচনার স্রোতের মুখে হঠাৎ যেন একখানা জগদ্দল পাথর চাপা পড়ল। অরুণাংশুর নাম শুনেই সুভদ্রার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর, এমন ।ক, যেন কঠিন হয়ে উঠল। সে আর কোন প্রশ্ন করলে না, সুবোধও দু-একটি কথা ব'লেই আলোচনাটার উপর যবনিকা টেনে দেবার উদ্দেশ্যেই নিজে থেকেই বললে, থাক্‌, সুভদ্রা দেবী, রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে আপনি যখন চ'লেই এসেছেন, তখন এ সব নোংরামির কথা আপনি আর না-ই শুনলেন। আর এ সব কথা শোনাবার জন্য আমি আপনার কাছে আসিও নি। যে কথা বলতে এসেছি, তাই ব'লেই আমি বিদায় নিতে চাই।

অরুণাংশুর কথা উঠতেই সুভদ্রা মুখ নামিয়েছিল; কিন্তু শেষের কথাটা শুনে আবার মুখ তুলে বিস্ময়ের স্বরে সে বললে, কি কথা, সুবোধবাবু?

সঙ্গে সঙ্গেই সুবোধ উত্তর দিতে পারলে না। একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে, একবার নিজের পায়ের জুতার দিকে; তার পর আবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমায় মাপ করতে পারবেন, সুভদ্রা দেবী? সে রাত্রির অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্যে আমার নিজেরই লজ্জা আর অনুতাপের অবধি নেই।

চক্ষের পলকে সুভদ্রার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখের উপর ছুটে

এল ; চোখের পাতা দুটির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটাও নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল ; ডান হাতটা দিয়ে চৌকির একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরলে সে ; উত্তরে একটা কথাও তার মুখে ফুটল না।

সুবোধের নিজের গলাটাও শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল ; তবু সে-ই আবার বললে, অপরাধের অনুভূতি ভারী একখানা পাথরের মত আমার বুকের উপর চেপে রয়েছে, আপনার মার্জনা না পেলে তা কিছুতেই নামবে না। সেইজন্যই—

না।—সুবোধের কথার মাঝখানেই অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠল সুভদ্রা।

সুবোধের বিবর্ণ মুখখানি আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, পারবেন না মাপ করতে ? অবশ্য—

না।—সুভদ্রা আবার বাধা দিয়ে মাথা নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললে, না, তা বলি নি আমি।

তবে ?—সুবোধ উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রা উত্তরে বললে, আপনার কিছু দোষ হয় নি।

সুবোধ চমকে উঠল ; মুখে শুধু বললে, অ্যাঁ !

না, কিছু দোষ হয় নি আপনার।—আগের চেয়েও মৃদু স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, আমি কিছু মনে করি নি। আমি জানি, আমায় অপমান করবার ইচ্ছে ছিল না আপনার।

বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রায় মিনিটখানেক কাল সুবোধের মুখে কোন কথাই ফুটল না ; তার পর হঠাৎ তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, আমায় বাঁচালেন, সুভদ্রা দেবী ; আজ থেকে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব। এত দিন—

সুভদ্রা আবার বাধা দিয়ে বললে, আপনাকে আমি জানি, সুবোধবাবু। তা ছাড়া, আপনি হুগলীতে নেই শুনেই পরদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু—

বলতে বলতে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল ; অকুণ্ঠিত চোখে সোজাসুজি সুবোধের চোখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, এ সব কথা আর নয়। আপনি বসুন, আমি আপনার চায়ের কথাটা ব'লে আসি।

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, না না, চা চাই নে আমার।

সুভদ্রা বিব্রতের মত থমকে দাঁড়াল; সংশয়ের স্বরে বললে, সত্যি, চা খাবেন না আপনি?

সুবোধ উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলে, না, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন যাই।

সুভদ্রা তথাপি আরও কিছুক্ষণ সংশয়ের চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হেসে ফেলে বললে, এ তো আপনার চিরকালের রোগ। তা বেশ, চা না হয় না-ই খেলেন। কিন্তু তাই ব'লেই এক্ষুনি যেতে পাবেন না। বলুন আপনি, আপনার নিজের কথা কিছুই তো শোনা হয় নি এখনও; তাই বলুন এবার; বলুন আপনার বাড়ির খবর। সব ভাল তো সেখানে?

সুভদ্রার অনুরোধ সুবোধ ঠেলতে পারলে না। আবার বসতে হ'ল তাকে। সুভদ্রাও বসল; ব'সে আবার বললে, বাড়ির সবাই ভাল আছেন তো?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, বহুবচন আর কেন, সুভদ্রা দেবী? আমার তো বাড়িতে থাকবার মত এক ঠাকুরমা। তা তিনি এখন ভালমন্দের অতীত অবস্থায় চ'লে গিয়েছেন; বৈতরণীর তীরে খেয়া নৌকার অপেক্ষায় আছেন আর কি!

সুভদ্রার মুখ ম্লান হয়ে গেল; একটু চুপ ক'রে থেকে অনুতপ্তের মত সে বললে, সত্যি, কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

সুবোধ উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। একটু পরে সুভদ্রাই আবার জিজ্ঞাসা করলে, তা বাড়িতে কি তিনি একেবারে একা থাকেন? আর কেউ সেখানে নেই?

সুবোধ বললে, না।

কেন, সুবোধবাবু? সুভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করলে, এমন কেউ কি আপনাদের নেই, যিনি তাঁর কাছে থাকতে পারেন?

সুবোধ বললে, তা হয়তো আছে। আমি তাদেরই দু-একজনকে বাড়িতে রেখে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ঠাকুমাই রাজী হলেন না।

কেন?

আমার উপর অভিমান ক'রে আর কি! সুবোধ কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিলে।

সুভদ্রা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দেখে সুবোধ হেসে ফেলে আবার বললে, সে বারের মত এ বারও তিনি কাছে চেয়েছিলেন আমার বউকে; তা আমি দিতে পারলাম না ব'লেই তিনি রাগ ক'রে বললেন, তা হ'লে আর কাউকেও এনে দেবার দরকার নেই।

সুভদ্রাও হেসে ফেলে বললে, ঠিকই তো বলেছেন তিনি। তাঁর বয়সে নাত-বউকে কাছে পাবার শখ সব মেয়েমানুষেরই হয়।

সুবোধ হাসি চেপে গাম্ভীর্যের ভান ক'রে বললে, তা হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার ঠাকুরমার বেলায় মুশকিল হ'ল যে, তাঁর নাত-বউ নেই।

সুভদ্রা বললে, না থাকলেও হতে পারত তো!

তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটি সুবোধের চোখের সঙ্গে এসে মিলতেই সুবোধ কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে।

সুভদ্রা এবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, সত্যি, সুবোধবাবু, আগেও কত বার আপনাকে বলেছি, বিয়ে আপনি করছেন না কেন? বেশ হ'ত ঠাকুরমার কথামত বিয়ে যদি এবার ক'রে আসতেন।

সুবোধ হেসে ফেলে বললে, ক'রে না এলেও করবার আয়োজন করছি, সুভদ্রা দেবী।

সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, অ্যাঁ!

হ্যাঁ, সুভদ্রা দেবী।—সুবোধ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, কনে পর্যন্ত দেখা হয়ে গিয়েছে, বাকি রয়েছে, কেবল মালাবদলের প্রক্রিয়াটা।

সুভদ্রার মুখের হাসি এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল; বিহ্বলের মত সে বললে, ঠাট্টা করছেন না তো, সুবোধবাবু?

সুবোধ হো-হো ক'রে হেসে উঠল; হাসির ফাঁকে ফাঁকেই সে বললে, ঠাট্টা কেন করব, সুভদ্রা দেবী, সত্যি, শীগগিরই বিয়ে হবে আমার, মরণ-বঁধুর সঙ্গে আমার বিয়ের সব আয়োজন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

বাজে কথা!—ব'লে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিন্তু সুবোধ হাসির মাত্রাটা আরও বরং একটু বাড়িয়ে দিয়ে ব'লেই চলল,

বাজে কথা নয়। সত্যি বলছি আপনাকে, মরণ-বঁধুর সঙ্গে এবার মহাসমারোহে বিয়ে হবে আমার, নিজের হাতে ঘোমটা খুলে তার নীল ওষ্ঠের সবটুকু রস আমি নিঃশেষে পান করব।

সুভদ্রা আবার তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আবোল-তাবোল কি আবার বকতে শুরু করলেন, সুবোধবাবু?

আবোল-তাবোল কথা কেন হবে!—সুবোধ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, এ যে রীতিমত সত্য কথা।

তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরেই সে আবার বললে, না, সুভদ্রা দেবী, এ ঠাট্টাও নয়, আবোল-তাবোল কথাও নয়; সত্যি এবার হয়তো মরতেই হবে। স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা এত দিন মুখেই তো কেবল বলেছি, এবার আসল যুদ্ধ করতে হবে। তাতে মরণ হবে না, সে কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

সুভদ্রা চমকে উঠল। এবার কথাটা যেন বুঝতে পারলে সে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে ব'সে বললে, আন্দোলনের কথা বলছেন, সুবোধবাবু? সত্যি আন্দোলন এবার হবে নাকি?

সুবোধ মুচকি হেসে উত্তর দিলে, ঝড়ের আগের মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছেন না আপনি? হুগলী ছেড়ে এসেছেন ব'লে খবরের কাগজ পড়াও ছেড়ে দিয়েছেন নাকি? গান্ধীজীর লেখা পড়ছেন না?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, কিছু কিছু পড়ছি বটে।

সুবোধ সোজা হয়ে ব'সে দৃঢ় স্বরে বললে, তা হ'লে আপনারও তো বোঝা উচিত, ডাক এবার সত্যি এসেছে।

একটু থেমে সোজা সুভদ্রার চোখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, এখন তো বাঁধন ছেঁড়বার সময়, সুভদ্রা দেবী, নূতন বাঁধন পরবার সময় এ তো নয়।

তার পর আবার হাসি থামিয়ে সুবোধ অনর্গল অনেক কথাই ব'লে গেল, যা সে জেনেছিল, যা সে শুনেছিল আর যা সে কল্পনা করেছিল, তার কিছুই বলতে বাকি রাখলে না সে। জাগ্রত জাতির দীর্ঘকালব্যাপী স্বাধীনতা-

সংগ্রামের সার্থকতাসমুজ্জ্বল উপসংহারের ভীষণ মধুর একখানি ছবি কথায় ফুটিয়ে তুলে সে যেন সুভদ্রাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলে।

দুই বিস্ফারিত চোখের অচঞ্চল স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুবোধের মুখের উপর বিন্যস্ত রেখে সুভদ্রা নিঃশব্দে সব কথা শুনে গেল। কিন্তু সুবোধ নীরব হবার পর সে হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, কিন্তু, সুবোধবাবু, আন্দোলন আসবার আগেই যদি আপনি ম'রে যান, তা হ'লে মরণ-বঁধুর সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে কেমন ক'রে।

কথাটা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের স্বরে সুবোধ বললে, তার মানে?

সুভদ্রা হাসি থামিয়ে বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, বাড়িতে আপনার আয়না-চিরুনির বালাই তো নেই! যদি থাকত আর আরশিতে নিজের চেহারাটা নিজে যদি আপনি দেখতে পেতেন, তবে আমার কথার মানে আর আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হ'ত না।

সুবোধ অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওটা আমার দোষ নয়, সুভদ্রা দেবী, ম্যালেরিয়ার।

অ্যাঁ!—সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, ম্যালেরিয়া আপনার হয়েছে নাকি?

সুবোধ কিন্তু এবার হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, হ্যাঁ, সুভদ্রা দেবী, দেশে যাবার পুরস্কার আর কি! মনে হচ্ছে যে, আমার প্রতি ওর স্নেহ আমার ঠাকুমার স্নেহের চেয়েও বেশি। ঠাকুমাকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি নি; পরম স্নেহভরে উনি হুগলী পর্যন্ত সঙ্গেই এসেছেন।

সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল; তার পর হঠাৎ খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে ব্যাকুল স্বরে সে বললে, না, সুবোধবাবু, নিজের দেহের এমন অযত্ন করবেন না আপনি। ম্যালেরিয়া বড় খারাপ ব্যারাম, আপনি উপযুক্ত চিকিৎসা করান।

তা করাচ্ছি।—সুবোধ স্মিত মুখে উত্তর দিলে, দেশে কুইনাইন পাওয়া যায় না, তাই চিকিৎসা সম্ভব হয় নি। এখানে রোজ কুইনাইন খাচ্ছি।

আরও দু-চারটি কথার পর সুবোধ খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আজ তা হ'লে আমি আসি, সুভদ্রা দেবী, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

সুভদ্রা চমকে উঠল; বাইরের দিকে তাকিয়ে সে-ও বুঝতে পারলে যে, সত্যিই বেলা অনেক হয়েছে। ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, অত দূরে যাবেন, সুবোধবাবু, চা না খান, একটু জলখাবার—

না, না।—ব'লে সুবোধ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল; বললে, কিছু দরকার নেই।

সুভদ্রাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তবে আর কি বলব! আসুন তবে; কিন্তু শরীরটাকে আগের মত অযত্ন করবেন না।

সুবোধ কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ তুলে সে বললে, শ্যামাচরণদার বড় সাধ আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবে সে। তাকে আপনি আপনার ঠিকানা দিয়ে আসেন নি ব'লে তার দুঃখের অন্ত নেই, আর অভিমানও নিতান্ত কম নয়। তাকে আপনার ঠিকানাটা জানাতে পারি কি?

সুভদ্রা প্রথমে অপরাধীর মত মুখ নামিয়েছিল, পরে মুখ তুলে বললে, তাকে আপনি সঙ্গেই নিয়ে এলেন না কেন?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আজ আপনার সঙ্গে আমার নিজের কথা ছিল কি না, তাই তাকে আনি নি, কিছু ব'লেও আসি নি তাকে। এখন যদি আপনি অনুমতি—

তাকে পাঠিয়ে দেবেন আপনি।—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, বলবেন—আমি তাকে ডেকেছি।

একটু থেমে অসাধারণ রকমের গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু আর কাউকে কিছু জানাবেন না যেন, শ্যামাচরণদাকেও সতর্ক ক'রে দেবেন।

সুবোধ বিব্রতের মত কয়েক সেকেণ্ড কাল সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমার আর একটা কথার উত্তর দেবেন, সুভদ্রা দেবী?

সুভদ্রা কতকটা বিস্মিত, কতকটা শঙ্কিতের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা হয় আপনার?

তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সুভদ্রা বললে, না।

আবার কিছুক্ষণ সুবোধ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তার পর সুপ্তোত্থিতের মত বললে, আচ্ছা, আমি এখন তা হ'লে আসি, নমস্কার।

কিন্তু দোরের কাছে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল সে ; ফিরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, আপনার অনুমতি ছাড়াই আরও একটা কথা আপনাকে বলব, সুভদ্রা দেবী। আমি জানি যে, নিজের জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন আপনার নেই। কিন্তু আপনার মধ্যে যে আর একটি জীবনের সঞ্চার হয়েছে, তার জন্য কারও সাহায্যের দরকার যদি কোন দিন আপনার হয়, সে দিন দয়া ক'রে আমায় স্মরণ করবেন।

সুভদ্রার মুখে কোন উত্তর ফুটল না। সুবোধ চ'লে যাবার পরেও আরও মিনিট দশেক কাল ওই ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে। আসবার জন্য যেমন হয়েছিল, উপরে ফিরে যাবার জন্যও তেমনি নিজেকে তার চেষ্টা ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হ'ল। কিন্তু সহজ সে হতে পারলে না। তার মুখের দিকে চেয়ে কমলা ভড়কে গেল, সে মুখ যেমন গম্ভীর, তেমনি কঠিন। বাছা বাছা, চোখা চোখা যত সব কথা সে মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল, সে সব যেন তার গলায় আটকে গেল ; কোনও রকমে মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে সে শুধু বললে, কি গো, ঝগড়া মিটল তোমাদের ?

ভুরু কুঁচকে কমলার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা জলদ গম্ভীর স্বরে বললে, এ সব কথা নিয়ে অমন হালকা ঠাট্টা ক'রো না, কমলা।—ব'লেই তার পাশ কাটিয়ে সে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সুভদ্রার ভাব দেখে কমলা সে দিন আর সাহস ক'রে পরিহাস করতে পারে নি। খানিক পরে সুভদ্রা নিজেই তাকে সুবোধের নাম আর পরিচয় সংক্ষেপে শুনিয়ে দিয়েছিল ; ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছিল যে, সে তার বন্ধু। কিন্তু ওই বলার ধরনটাও ছিল এত বেশি গম্ভীর যে, ওই 'বন্ধু' কথাটার উপরেও কমলা আর কোন মন্তব্য করতে সাহস পায় নি। তার পর ওই প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে আর কোন কথাই হয় নি ; সে দিনের অসাধারণ ঘটনাটাকে ভুলতে না পারলেও কথা আর বাহ্যিক ব্যবহারে কমলা সেটাকে উপেক্ষা ক'রেই চলছিল।

তাই দিন সাতেক পর আবার যখন কমলার সাক্ষাতেই নিচের বৈঠকখানা থেকে সুভদ্রার কাছে খবর এল যে, হুগলী থেকে আবার কে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন কমলার স্বাভাবিক কৌতূহল আর কৌতুক-প্রবৃত্তি শাণ-দেওয়া ছুরির মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও আগের দিনের ইতিহাস স্মরণ ক'রে পরিহাস দূরে থাক্, অনুসন্ধানের একটা কথাও সে মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না।

এবার সুবোধ নয়, শ্যামাচরণ। সুভদ্রাও মনে মনে সেটা আন্দাজ ক'রে এসেছিল। শ্যামাচরণকে দেখেই চোখ-মুখ তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, আমি জানতাম যে, তুমি আসবে, শ্যামাচরণদা; দিদিমণির উপর রাগ ক'রে তার নিমন্ত্রণটাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তবু তোমার দেরি দেখে ভয় হচ্ছিল আমার।

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আরও আগেই আমি আসতাম, দিদিমণি, সুবোধবাবুর অসুখের জন্যই আসতে পারি নি।

অসুখ!—সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, কি অসুখ সুবোধবাবুর?

জ্বর।—শ্যামাচরণ ম্লানমুখে উত্তর দিলে, এখান থেকে ফিরে গিয়েই তিনি জ্বরে পড়েছেন।

জ্বর! কেমন জ্বর?

ওই ম্যালেরিয়া। এমন কম্প দিয়ে জ্বর এল—আটকা প'ড়ে গেলাম আমি। তাকে দেখবার আর কেউ তো সেখানে নেই।

না, না।—সুভদ্রা তাড়াতাড়ি বললে, বেশ করেছ তুমি। আমার এখানে তো আর দরকারী কোন কাজ নেই, কেবল দেখা করা; তার জন্য আরও দুদিন দেরি হ'লেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। তা সুবোধবাবু এখন বেশ ভাল হয়ে গিয়েছেন তো?

শ্যামাচরণের ম্লান মুখ আরও বেশি ম্লান হয়ে গেল; মাথা নেড়ে সে বললে, না তো, দিদিমণি, জ্বরটা বড্ড বেয়াড়া ঠেকছে এবার, রোজই জ্বর আসছে আর রোজই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

সুভদ্রা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, বল কি, শ্যামাচরণদা?

হাঁ, দিদিমণি, শ্যামাচরণ উত্তর দিলে, সেই জন্তই তো তোমার কাছে এলাম। নিজের বুদ্ধিতে কিছুই আমি ঠিক করতে পারছি নে।

একে একে সকল কথাই সে খুলে বললে। বাড়ি থেকে ফিরবার পরেই এক বার সুবোধের জ্বর হয়েছিল। সে জ্বরও এসেছিল কম্প দিয়ে। কিন্তু দুদিন কুইনাইন খেতেই সে জ্বর বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু এবার জ্বর মোটে ছাড়ছেই না। রাত্রে একটু কমলেও সকাল থেকেই আবার বাড়তে আরম্ভ করে। দুপুরের দিকে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, ভুলও বকতে থাকে। কদিনেই এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখন জ্বর কমলেও উঠে আর বসতেই পারে না। ইউনিয়নের আপিস ঘরে একা আর তাকে ফেলে রাখতে সাহস না পেয়ে শ্যামাচরণ অবশেষে তাকে নিজের বাসাবাড়িতেই তুলে এনেছে।

শুনতে শুনতে সুভদ্রা নিজেই যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল; শ্যামাচরণ নীরব হবার পর চেষ্টা ক'রে তবে সে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলে, চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হয়েছে, শ্যামাচরণদা?

শ্যামাচরণ সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে খেদের স্বরে বললে, কিছুই হয় নি, দিদিমণি, সুবোধবাবু কিছু করতেই দিচ্ছেন না। বলছেন, টাকা বাঁচাও শ্যামাচরণদা, আন্দোলনের সময় অনেক টাকার দরকার হবে।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল; তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি একটু ব'স, শ্যামাচরণদা, আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে আসছি, তোমার সঙ্গেই আমি হুগলী যাব।

শ্যামাচরণ এমন চমকে উঠল যেন হঠাৎ সে ভূত দেখেছে। রুদ্ধনিশ্বাসে সে বললে, তুমি সেখানে যাবে, দিদিমণি?

না গিয়ে কি করব!—সুভদ্রা উত্তরে বললে, যে রকম অসুখের খবর তুমি নিয়ে এসেছ!

কিন্তু ওরা যদি তোমায় অপমান করে?—শ্যামাচরণ নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, অপমান করবে! কে আমায় অপমান করবে, শ্যামাচরণদা?

শ্যামাচরণ ঢোক গিলে বললে, ওই—ওই—আগে যারা কুৎসা রটিয়েছে, ওই—

কি বলছ তুমি ?—সুভদ্রা বিহ্বলের মত বললে, কে কি কুৎসা রটিয়েছে ?

এবার শ্যামাচরণ নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়ল ; বার দুই ঢোক গিলে অপরাধীর মত সে বললে, সুবোধবাবু তোমায় কিছু বলেন নি, দিদিমণি ?

কই, না তো !—সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে।

কিন্তু পরক্ষণেই শ্যামাচরণকে চেপে ধরলে সে ; আগ্রহের স্বরে বললে, খুলে বল তো, শ্যামাচরণদা, আমার সম্বন্ধে কে কি কুৎসা রটিয়েছে ? না, লুকোতে পারবে না তুমি, সব কথাই খুলে বলতে হবে। না, আমার মাথার দিব্যি, বল, কি হয়েছে ? শেষের দিকে তার অনুরোধ আদেশ আর আবদারের সংমিশ্রণে একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল।

কিন্তু অতখানি আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেও কুণ্ঠিত শ্যামাচরণের ভাঙা ভাঙা কথার উত্তরটা শেষ পর্যন্ত শুনবার জন্য সে অপেক্ষা করলে না ; বর্ণনার মাঝখানেই হঠাৎ সে ভুরু কুঁচকে, মাথা ঝেঁকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল, থাক্, শ্যামাচরণদা, যার যা খুশি সে তা-ই বলুক গে। লোকে বললেই তো আর আমি মন্দ হয়ে যাব না।

শ্যামাচরণ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে তাকাল ; মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বললে, ঠিক, দিদিমণি, ঠিক। এ কথা বলবারও নয়, শোনবারও অযোগ্য। আর, আমি ঠিক জানি, দিদিমণি, কেউ এ কথা বিশ্বাসও করে নি।

কিন্তু তার পরেই মুখ নামিয়ে সে আবার কুণ্ঠিতের মত বললে, তবু এ রকম একটা কথা উঠেছে ব'লেই তোমায় ডাকবার সাহস আমাদের হয় নি।

অসহিষ্ণুর মত মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে সুভদ্রা বললে, কিন্তু আমার সাহস আছে, শ্যামাচরণদা ; সুবোধবাবুর শুশ্রূষার জন্য তোমার সঙ্গেই আমি হুগলী যাব।

আশায় ও আনন্দে শ্যামাচরণের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, সত্যি যাবে, দিদিমণি ?

হ্যাঁ, যাব।—সুভদ্রা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, আমার কর্তব্য আমায় করতেই হবে। তুমি চট ক'রে একখানা গাড়ি ডেকে আন, আমি তৈরি হয়ে আসছি।

কথাটা শুনেই কমলা হেসে ফেলেছিল ; কিন্তু তাড়াতাড়ি সেটা গোপন করে গম্ভীর স্বরে সে বললে, উনি বুঝি তোমায় কল্ দিয়ে পাঠিয়েছেন ?

না।—সুভদ্রা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কেউ আমায় কল্ দেয় নি। আমি নিজেই যাচ্ছি আমার বন্ধুর সেবা করতে।

চাকরের হাতে জিনিসপত্র নীচে পাঠিয়ে দিয়ে কমলাকে সে আবার বললে, আমার ফিরতে কদিন দেরি হতে পারে, কমলা ; এর মধ্যে যদি তেমন কোন দরকার উপস্থিত হয়, হুগলীতে আমায় একটা খবর দিও।

কমলার ঠোঁটের কোণে আবার একটু হাসি ফুটে উঠল ; কিন্তু সেটুকু ওখানেই চেপে রেখে সে বললে, খবর দিতে পারব ঠিকই, কিন্তু খবর দেব কোথায় ? খামের উপর সুভদ্রা দেবীর নাম লিখে চিঠি ছেড়ে দিলেই তা একেবারে তোমার কোলের উপর গিয়ে পড়বে নাকি ?

এবার সুভদ্রাও হেসে ফেলে বললে, না, তা পড়বে না। কিন্তু সে জন্য ভাবনা নেই তোমার। ঠিকানা আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি। তবে অকারণে ফিরবার তাগিদ দিয়ে চিঠি পাঠিও না যেন, আর দয়া ক'রে নিজে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ো না।

শ্যামাচরণের সঙ্গে সুভদ্রা যখন হুগলীতে তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছে। উঠানে ঢুকতেই তারার সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল।

ছোট্ট উঠানটুকুর মধ্যে একা একাই কি একটা খেলা জমিয়ে নিয়েছিল সে ; সুভদ্রাকে দেখে প্রথমে সে অবাক হয়ে গেল ; কিন্তু তার পরেই উল্লাসের স্বরে পিসিমা ব'লে ছুটে গিয়ে সে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

সুভদ্রাও হাসিমুখে তাকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল ; কিন্তু তার আগেই শ্যামাচরণ হাত ধ'রে তারাকে দূরে সরিয়ে দিলে ; বললে, না, মা, এখন গোলমাল ক'রো না ; আগে বল তো, তোমার কাকাবাবু কেমন আছেন ?

ভাল না।—মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে তারা উত্তর দিলে, কেবল ছটফট করছে আর বিড়বিড় ক'রে কি সব বকছে !

শ্যামাচরণ চোখ লাল ক'রে বললে, তবে তুই তার কাছে না থেকে বাইরে খেলা করছিস যে ?

আমার ভয় করে না বুঝি!—তারা কাঁদ কাঁদ হয়ে উত্তর দিলে।

থাক্ থাক্।—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, চল, শ্যামাচরণদা, আমরাই দেখি গে।

কিন্তু শ্যামাচরণ একলাই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল; সুভদ্রাকে ব'লে গেল, তুমি একটু দাঁড়াও, দিদিমণি, আমি আগে দেখে আসি।

শ্যামাচরণ চ'লে যেতেই তারা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে নিজে থেকেই আবার বললে, সত্যি, পিসিমা, বড্ড ভয় করছিল আমার। মা এসেছিল বার্লি নিয়ে; কিন্তু কাকাবাবু একটু খেয়েই সব হুড়হুড় ক'রে বমি ক'রে ফেললে।

সুভদ্রার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; শ্যামাচরণের ডাকের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রেই সে-ও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

খোলার ঘর, জানালা একটিও নেই, স্যাঁৎসেঁতে কাঁচা মেঝে, ভিতরটা অন্ধকার, তার উপর আবার কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। সুভদ্রার কাছে অবশ্য এ দৃশ্য নূতন নয়, তবু ঘরে ঢুকতেই মনটা তার দ'মে গেল। দেখবার জন্য চোখ দুটিকে বার বার ছোট-বড় ক'রে বেশ খানিকটা চেষ্টা করতে হ'ল তাকে। তার পর সুবোধের চেহারাটা যখন তার চোখে পড়ল, তখন তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দড়ির খাটিয়ার উপর খালি একখানা শতরঞ্চি পাতা; মাথার বালিশ নীচে মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে; খাটিয়ার মাঝখানটা ঝুলে পড়েছে জেলেদের জালের মত। সেই বিছানার উপর শুয়ে সুবোধ জ্বরের ঘোরে কেবলই ছটফট করছে। তার কোমর পর্যন্ত একখানা কাঁথা দিয়ে ঢাকা। একখানা কম্বল আগে বোধ হয় গায়েই ছিল, এখন পায়ের কাছে বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়ে রয়েছে। একটা পা খোলা, আর একটা পা কম্বলের একটা কোণের সঙ্গে খাটিয়ার পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। মাথার কাছে খাটিয়ার নীচে একটা পিতলের ঘটি কাত হয়ে প'ড়ে রয়েছে, তার চারদিকে কাঁচা মাটি জল পেয়ে কাদা হয়ে গিয়েছে।

খাটিয়ার দিকে তাকিয়েই সুভদ্রা থমকে দাঁড়িয়ে ছিল; তার মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রেই শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি আজ ছিলাম না কিনা, কিছুই আজ গোছগাছ করাও হয় নি।

সর তুমি।—সুভদ্রা মন্তব্যটাকে উপেক্ষা ক'রেই খাটের কাছে এগিয়ে গেল। আমি দেখছি।—ব'লে উপুড় হয়ে সুবোধের কপালের উপর হাত রাখলে সে; কিন্তু পরের মুহূর্তেই 'ইস্' ব'লে হাতখানা টেনে নিয়ে সে দু পা পিছনে স'রে গেল।

মানুষের কপাল তো নয় যেন জলন্ত একখণ্ড কয়লা। সুভদ্রার মনে হ'ল যে, তার হাতে যেন মস্ত একটা ফোস্কা প'ড়ে গিয়েছে; সে বুঝলে যে, জ্বর একশো পাঁচের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে। দুই চোখ বড় ক'রে সে ব'লেই ফেললে, কপালটা যে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে!

রোজই এই রকমই হচ্ছে, দিদিমণি।—শ্যামাচরণ অসহায়ের মত বললে।

খাটিয়াখানা ধর তো তুমি।—সুভদ্রা তাড়াতাড়ি পায়ের কাছে স'রে গিয়ে বললে, দরজার কাছে সরিয়ে নিয়ে যাই চল; এখানে না আছে আলো, না আছে হাওয়া।

কিন্তু উজ্জ্বলতর আলোকে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার সে শিউরে উঠল। সারা মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোয়ালের হাড় বের হয়ে পড়েছে, চোখ দুটি ঢুকে গিয়েছে যেন দুই গর্তের মধ্যে, নীচের ঠোঁটে বড় বড় দুটি ফোস্কা, দুই কষের কাছে শুকিয়ে রয়েছে—হয় মুখ-থেকে-ঝ'রে-পড়া লালা নয় তো বালির নোংরা ফেণা, এই কদাকার অজ্ঞান লোকটিকে সুবোধ ব'লে চেনাই যায় না।

কিন্তু সুভদ্রা তখনই নিজেকে শক্ত ক'রে নিলে; সুবোধের মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আবার তার কপালের উপর ডান হাতখানা রেখে সে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে, সুবোধবাবু, ও সুবোধবাবু!

সুবোধ যেন ভয় পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। দৃষ্টিহীন চোখ জবাফুলের মত লাল। সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়েই সুবোধ মাথার একটা ঝাঁকানি দিলে—বোধ করি সুভদ্রার হাতখানি নিজের কপালের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য; বাঁ হাতখানিকে বুকের উপর দিয়ে ডান দিকে এনে গায়ের কাঁথার একটা কোণ সে শক্ত ক'রে চেপে ধরলে; সঙ্গে সঙ্গেই সে অস্ফুট আর্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, মা, মাগো—

ও সুবোধবাবু!—এবার শ্যামাচরণ তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, দেখুন তো চেয়ে, দিদিমণি এসেছে যে!

সুবোধ অস্থির চোখে একবার শ্যামাচরণের মুখের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ বুজল; ঠোঁট নেড়ে একবার কি যেন সে বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু মুখে তার কথা ফুটল না; জিভ, ঠোঁট, দাঁত, সব একত্র মিলিয়ে তিন-চার বার অস্ফুট চুক চুক শব্দ ক'রে হঠাৎ সে পাশ ফিরল। গায়ের কাঁথাখানা এবার তার হাঁটুর নীচে চাপা প'ড়ে গেল; থুতনিটা গিয়ে মিলল প্রায় বুকের সঙ্গে।

একটু জল আন তো, শ্যামাচরণদা।—সুভদ্রা শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে বললে।

জল আসতে আসতে বিছানাটা সে ঠিক ক'রে দিলে; সুবোধের মাথাটা আলগোছে তুলে দিলে বালিশের উপর; কাঁথা আর কম্বল একত্র ক'রে বুক পর্যন্ত টেনে দিলে: তার পর নিজে তার বুকের কাছে ব'সে বাঁ হাত দিয়ে মাথাটাকে ঘিরে চিবুক ধ'রে ডান হাতে ছোট জলের গ্লাসটি তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে, জল খান তো, সুবোধবাবু, হাঁ করুন। এ কি, নড়ছেন কেন? খুলুন, মুখ খুলুন, হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে জল ঢেলে সুবোধের শুকনো ঠোঁট দুটিকে সে ভিজিয়ে দিলে; তার পর অল্প অল্প ক'রে মুখের মধ্যে সে জল ঢেলে দিতে লাগল; একটু পরেই সুবোধ নিজেই দুই হাত দিয়ে গ্লাসটির সঙ্গে সুভদ্রার হাতখানাকেও চেপে ধ'রে মাথাটা একটু তুলে সবটুকু জল এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেললে।

খালি গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে সুবোধের মুখ মুছে দিয়ে সুভদ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেমন লাগছে এখন?

সুবোধ কোন উত্তর দিলে না, কিন্তু তার অস্থির চোখ দুটি বার বার সুভদ্রার মুখের উপর গিয়ে পড়তে লাগল।

আমায় চিনতে পারছেন না আপনি?—সুভদ্রা আবার তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে।

এবারও সুবোধ উত্তর দিলে না; আরও কয়েক বার উদ্‌ভ্রান্তের মত

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে দেখবার পর আর একবার আর্ত কণ্ঠে 'মা—মাগো' ব'লেই চোখ বুজে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তার পরেই সে সুর ক'রে গেয়ে উঠল, মা আমায় ঘুরাবি কত—

একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা ; ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে শ্যামাচরণের হাতে দিয়ে বললে, তুমি ছুটে যাও, শ্যামাচরণদা, ছোট ডাক্তার-বাবুকে আমার নাম ক'রে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে এস। আর ফিরবার পথে দশ সের বরফ কিনে আনবে।

প্রথম দিন জ্বর আসতেই সুবোধ বুঝতে পেরেছিল যে, জ্বরটা ম্যালেরিয়া হ'লেও অবস্থাটা এবার সুবিধার নয়। আসলেও কাঁথা আর কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় গিয়ে শোবার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

ঠিক অজ্ঞান হয়তো বলা যায় না,—অবস্থাটা চৈতন্য আর চেতনাহীনতার মাঝখানের—কতকটা পৌরাণিক ত্রিশঙ্কুর নিরালম্ব অসহায় অবস্থার মত। জানার দেশ ছেড়ে সুবোধ যেন এক অজানার দেশে চ'লে গেল। সে যেন বাস্তব আর অবাস্তব রাজ্যের মাঝখানের নিয়মশৃঙ্খলাহীন, স্বল্পায়তন, অরাজক একটা দেশ। সে দেশের পথ-ঘাট, গাছপালা, নর-নারী সবই আলাদা, সে দেশের চন্দ্রসূর্যও যেন অন্য রকমের। জানার জগতের মেয়েপুরুষেরা অজানার জগতের লোকের সঙ্গে ভাব করবার জন্য কিম্ভূতকিমাকার সাজ ক'রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় ; অজানার জগতের অশরীরী জীবেরা আবার জানার জগতের মেয়ে-পুরুষের অনুকরণ করতে গিয়ে প্রত্যেকেই এক-একটি বামন বা নৃসিংহ অবতার হয়ে ওঠে। তার পর পথে-ঘাটে এই দুই দলের সম্মিলিত শোভাযাত্রা চলতে থাকে। সে দেশে কখনও বা বাঁশী বাজে, কখনও আবার যুদ্ধের বাজনা ; কখনও ভূত এসে ভয় দেখিয়ে যায়, কখনও আবার উর্বশীর মত রূপসীরা এসে নূতন আগন্তুকের গলায় চাঁপাফুলের মালা পরিয়ে দেয় ; কখনও অকারণে লক্ষ লক্ষ আলো জ্ব'লে ওঠে, আবার কখনও বা গোটা জগৎটাই মিশ-কালো অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি সেই অনৈসর্গিক জগৎটাতে সুবোধ সে দিন সারাটা দিনই যেন দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

তার পর রোজই তেমনি হয়েছে,—ভোরের দিকে জ্বর ছেড়ে গিয়েছে, আবার সকাল থেকেই জ্বর উঠতে শুরু হয়েছে। উপযুক্ত ওষুধ আর শুশ্রূষার অভাবে অবস্থাটা তার ক্রমেই মন্দের দিকে চলছিল।

তথাপি শ্যামাচরণের কাছে নিজের আসল অবস্থাটা গোপন করবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাই সে দিন সকালেও শ্যামাচরণের উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্নের উত্তরে মুখখানা হাসবার মত ক'রেই সে বলেছিল যে, শরীরটা সে দিন তার খুবই হালকা হয়ে গিয়েছে।

তার পর কখন যে শ্যামাচরণ কলকাতায় চ'লে গিয়েছিল, সুবোধ তা জানতেও পারে নি। জ্বর বাড়ছে বুঝতে পেরে পরে একবার সে শ্যামাচরণকে নাম ধ'রে ডেকেছিল। উত্তর দিয়েছিল তার ছোট মেয়ে তারা। বাইরে থেকেই নেড়া মাথাটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বলেছিল, বাবা বাড়ি নেই।

তোমার মা?

মা কাজে গিয়েছে।

সুবোধ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নি। একটু পরে তারাই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, জল খাবেন? জল দেব?

ক্লান্ত কণ্ঠে ছোট্ট একটা 'না' ব'লেই সুবোধ কাঁথা আর কম্বল কান পর্যন্ত টেনে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

সেটা যাত্রার আরম্ভ। তার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে আলো আর অন্ধকারের মাঝামাঝি ছায়ার জগতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তাকে ঘিরে আবার সব ছায়ামূর্তির উৎসব শুরু হয়ে গেল। কত রকম গঠনের, কত রকমের জীব যে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার ঠিকঠিকানা নেই; পট বদলাতে লাগল ঘড়ি ঘড়ি। প্রত্যেকটি দৃশ্যই কিম্ভূতকিমাকার। একবার তার মনে হ'ল যে, শ্যামাচরণের ছোট মেয়ে তারার ফুটবলের মত নেড়া মাথাটা বন্‌বন্ ক'রে তার চারদিকে ঘুরছে আর ওরই ঠিক মাঝখানে একটা চোখ স্থির হয়ে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। সেটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই এল শ্যামাচরণ,—মস্ত একটা লোহার হাতুড়ি দিয়ে সে যেন তার মাথায় বার বার ঘা মারতে লাগল; হাত জোড় ক'রে কত অনুনয় করলে সে, প্রাণপণে কত চীৎকার করলে, কিন্তু পিটুনির বিরাম নেই। শেষে যন্ত্রণা আর সহ্য

করতে না পেরেই যেন সে অজ্ঞান হয়ে গেল। আবার জ্ঞান যখন হ'ল, তখন শ্যামাচরণকে সে আর কাছে দেখতে পেলে না; দেখলে শ্যামাচরণের জায়গায় তার মজদুর-সংঘের সদস্য মহাবীরের জাঁদরেল স্ত্রী রামরতিয়া এসে দাঁড়িয়েছে; তার হাতে মস্ত একটা ঝাঁটা,—ওই ঝাঁটা দিয়ে রামরতিয়া তাকে ভয় দেখাচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো মুখের উপর সপাং ক'রে ঝাঁটার বাড়ি পড়বে।

ঝাঁটা নয়, একটা বাটি;—রামরতিয়া নয়, সারদা। ভয় পেয়ে চোখ মেলতেই সুবোধ দেখলে সারদা একটা বাটি হাতে নিয়ে তার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে; তাকেই ডেকে বলছে, বার্লি এনেছি, সুবোধবাবু, চট ক'রে খেয়ে ফেলুন তো।

কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত চেয়ে রইল সুবোধ; কিন্তু এটা যে স্বপ্ন নয়, তা ঠিক ঠিক বুঝতেই তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; বিরক্ত কণ্ঠে বললে, না, খাব না।

ওমা! না খেলে বাঁচবেন কি ক'রে!—সারদা সুর চড়িয়ে বললে, না না, সুবোধবাবু, বার্লিটুকু খেয়ে ফেলুন। নিন, লেবুর রস মিশিয়ে দিয়েছি, বেশ লাগবে খেতে, উঠে বসুন তো একবার।

সারদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই বুঝেই সুবোধ কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। কিন্তু এক চুমুকের বেশি সে খেতে পারলে না; আর সেটুকুও পরের মুহূর্তেই বমি হয়ে বের হয়ে গেল। সারদা হা-হা ক'রে উঠল, কিন্তু সুবোধ তার মুখের দিকে চেয়েও দেখলে না; জলের ঘটিটাকে মুখের কাছ থেকে হাত দিয়ে সরিয়ে মুখ না মুছেই তৎক্ষণাৎ সে আবার শুয়ে পড়ল। বার্লির বাটি আর সারদার মুখ কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, সে তার হদিসই পেলে না। চোখ বুজতেই অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল সে,—ভেসে উঠল গিয়ে সেই ছায়ার জগতে।

ঘরবাড়ি নেই, গাছপালা নেই, মাটিতে একগাছা সবুজ ঘাস পর্যন্ত নেই, আছে কেবল দিগন্তবিস্তৃত ধূসর, উষর, বন্ধুর একটা মাঠ। সুবোধের মনে হ'ল যে, সেই মাঠের এক দিকে সারিবন্দী অবস্থায় ট্যাঙ্কের মিছিল চলেছে, তাদের সবগুলি কামানের লক্ষ্য যেন সে নিজে। ভয় পেয়ে বিপরীত দিকে চোখ ফিরাতেই আবার সে দেখতে পেলে—ঝকঝকে সঙিন-পরা বন্দুক ঘাড়ে

নিয়ে উর্দি-পরা এক দল পদাতিক সৈন্ত সেখানে কুচ-কাওয়াজ করছে; এক জন অফিসার লম্বা একটা বেত আস্ফালন করতে করতে ক্রমাগতই কেবল ব'লে যাচ্ছে, লেফ্ট-রাইট, লেফ্ট-রাইট, লেফ্ট-রাইট; তার মুখখানা যেন অরুণাংশুর মত। সুবোধ সেই দিকে চোখ ফিরাতেই সে লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে হি-হি ক'রে হেসে উঠল। শিউরে উঠে সুবোধ উপরের দিকে তাকাল; সেখানে আকাশ নেই, কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন সোঁ-সোঁ শব্দ ক'রে উড়ে যাচ্ছে। সুবোধ উপরের দিকে তাকাতেই ওদেরই একটা প্লেন হঠাৎ ডুবুরীর মত মাথাটাকে নীচের দিকে ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উল্কার মত দ্রুতবেগে ঠিক তার দিকেই নেমে আসতে লাগল। সুবোধ চীৎকার করবারও অবসর পেলে না, বোমা না ফেলে গোটা প্লেনটাই যেন লক্ষ বজ্রের নির্ঘোষে তারই মাথার উপর ভেঙে পড়ল।

প্লেন নয়—কেবল কাঁথা আর কম্বল। ভয় পেয়ে চোখ মেলতেই সুবোধ বুঝতে পারলে—শীতে কাঁপতে কাঁপতে কখন কম্বল টেনে গোটা মাথাটাই সে ঢেকে দিয়েছিল, ওরই নীচে নিশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছে—ঘামে সারা শরীরটা গিয়েছে ভিজে।

মা গো!—ব'লে সুবোধ কাঁথা আর কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিলে। লম্বা একটা নিশ্বাসে অনেকখানি খোলা হাওয়া ভিতরে টেনে নেবার পর আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করলে সে। কিন্তু তৃষ্ণায় তখন তার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, মুখের মধ্যে এক ফোঁটা রসও অবশিষ্ট নেই। অনেক কষ্টে এক বার সে শ্যামাচরণের নাম ধ'রে ডাকলে। কিন্তু ভাল ক'রে তার গলায় আওয়াজই ফুটল না, কেউ সাড়াও দিলে না। বিহ্বল চোখের আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে সে চেয়ে দেখলে। কিন্তু ঘর খালি, কাউকেই সে দেখতে পেলে না। অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ ছটফট করবার পর আর থাকতে না পেরে নিজেই সে হাতড়ে হাতড়ে খাটিয়ার নীচে থেকে জলের ঘটিটি তুলে নিলে। এক নিশ্বাসে অনেকখানি জল খেয়ে ফেললে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার এমন কাঁপুনি শুরু হ'ল তার যে, হাতের ঘটিটিকে শক্ত ক'রে সে ধ'রেও রাখতে পারলে না। সেটি প'ড়ে গেল মাটিতে; খানিকটা জল ছিটকে এসে তার

গায়ের জামা ভিজিয়ে দিলে; নীচে জল প'ড়ে মেঝে গেল ভিজে; ঘটিটা গড়িয়ে কোথায় যে চ'লে গেল, তা সে দেখতেও পেলে না। দেখবার জন্য কোন চেষ্টাও করলে না সে; কাঁথাটাকে গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে চোখ বুজে আবার সে শুয়ে পড়ল।

আবার সেই ছায়ার জগৎ, কিন্তু এবার একেবারেই আলাদা। ফৌজ নেই, ট্যাঙ্ক নেই, এরোপ্লেন নেই। উপরে নির্মল নীল আকাশ ঝলমল ক'রে জলছে, নীচে সবুজ ধানের ক্ষেত, দূরের দিগন্তে খেজুর আর নারিকেলের কুঞ্জ। রঙ-বেরঙের কাপড় প'রে জোড়া জোড়া মেয়েপুরুষ চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদেরই একটি জোড়ার উপর চোখ পড়তেই সুবোধ চমকে উঠল, অরুণাংশু আর সুভদ্রা পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে দূরের দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুবোধ চঞ্চল হয়ে উঠল; গায়ের কাঁথা আবার সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে সে ডাকলে, সুভদ্রা দেবী!

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। দূরের নারিকেল-কুঞ্জের আড়ালে যুগল মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই সব আলো গেল নিবে, আকাশ মাঠ পথ ঘাট কিছুই আর তার চোখে পড়ল না।

অন্ধকার, সূচিভেদ্য অন্ধকার। নিশ্বাসে নেবার জন্য একটু হাওয়াও যেন কোথাও নেই। সুবোধের বুকটা আবার যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দুই চোখ বড় ক'রে চেয়ে দেখলে সে; কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কেবল দূরে—অনেক দূরে আলকাতরার মত কালো আকাশের বুকে একটিমাত্র তারা জল-জল ক'রে জলছে। সেখান থেকে সুবোধ চোখ আর ফিরাতে পারলে না। চেয়ে চেয়ে তার মনে হতে লাগল যে, তারাটি ক্রমেই যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। অবশেষে সেটি তারই মাথার কাছে এসে যেন স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—তারা নয়, মানুষের চোখ। সে চোখ সুভদ্রার। সুবোধ অবাক হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল।

কেবল দৃশ্য নয়, শব্দও। সুবোধ শুনতেও পেলে, সুভদ্রারই গলার আওয়াজ, জল খাবেন, সুবোধবাবু?

ওর সঙ্গে আবার স্পর্শও, সুবোধের শুকনো ঠোঁট দুটির উপর ফোঁটায়

ফোঁটায় জল পড়ছে। হাঁ করতেই জিভও ভিজে গেল, তার পর গলা। ঢক্-ঢক্ ক'রে অনেকটা জল খেয়ে ফেললে সে। তার পর সে চোখ মেললে,—চোখের সামনে অবিকল সুভদ্রার মুখ।

নিজের চোখকে সুবোধ বিশ্বাস করতে পারলে না। তার মনে হতে লাগল যে, এও স্বপ্ন, এ ক'দিন কত রকমের স্বপ্নই তো সে দেখেছে! হয়তো স্বপ্নেই চোখ মেলে চেয়েছে সে। বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর আর এক বার আর্তকণ্ঠে 'মা—মাগো' ব'লেই চোখ বুজে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তার পরেই আবার সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার।

ভোরের দিকে সুবোধের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলবার আগেই সে বুঝতে পারলে যে, তার জ্বর ক'মে এসেছে; দেহের সে গ্লানি আর নেই, মনের সে আচ্ছন্ন ভাবটাও কেটে গিয়েছে।

কিন্তু চোখ মেলবার পর তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ঘরের কোথায় যেন একটা আলো জ্বলছিল, উপরে খড়ের চালের বাঁশের বরগা, এমন কি কালির ঝুল পর্যন্ত সে স্পষ্ট দেখতে পেলে। যে ঘরে দিনের বেলাতেও কোন জিনিসই ভাল দেখা যায় না, সেই ঘরেই শেষরাত্রে আলোর ওই প্রাচুর্য তাকে বিহ্বল ক'রে দিলে। এক বার তার সন্দেহ হ'ল যে, হয়তো সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম; এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই সে দেখতে পেলে না। তার পর পাশ ফিরে দেখলে, অনেক দূরে বেড়ার কাছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সারদা শুয়ে রয়েছে; তার পাশে তারা, ছোট মেয়ের নেড়া মাথাটা সারদার বুকের কাপড়ের নীচে প্রায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। দেখেই মনে মনে সুবোধকে মানতে হ'ল যে, সময়টা সন্ধ্যা বা তার কাছাকাছি কোন সময় নয়। তার বিস্মিত চোখ দুটি তখন ওই অসাধারণ আলোর উৎসটির খোঁজ করতে শুরু ক'রে দিলে। সেটা তখনই তার চোখে পড়ল না; কিন্তু খানিকটা ঘুরেই তার চোখ দুটি যেখানে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে আর নড়তে পারলে না।

খাটিয়ার খুব কাছেই মাটির উপর একটা মাদুর পেতে তারই উপর সুভদ্রা

ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালিশ নেই, মাথাটা আশ্রয় পেয়েছে একখানা হাতের উপর; পরনের কাপড় এলোমেলো, খোঁপাটা খুলে গিয়েছে; মুখের খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা দেখা যায় না; স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ অল্প আলোকে পাণ্ডুর মনে হচ্ছে। তথাপি ওই মুখের উপর চোখ পড়তেই সুবোধ চিনতে পারলে; সে মুখ সুভদ্রার।

কিছুক্ষণ সুবোধের চোখে পলকই পড়ল না। মনটা তার আবার বিকল হয়ে গেল, এও কি স্বপ্ন! কিছুক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতই সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে অস্থির হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে; দুই হাতে বার বার চোখ রগড়ালে সে; ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের পিঠে দু-তিনবার চিমটি কাটলে নিজের চেতনাকে পরখ ক'রে দেখবার জন্য। তার পর আবার সে ফিরে তাকাল। সুভদ্রা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

তথাপি নিজের চেতনা আর নিজের চোখকে সুবোধ বিশ্বাস করতে পারলে না। আবার চিত হয়ে শুয়ে ক্ষীণ কিন্তু ব্যাকুল স্বরে সে ডাকলে, শ্যামাচরণদা—ও শ্যামাচরণদা!

শ্যামাচরণ উত্তর দিলে না, কিন্তু সুভদ্রা নিজেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। উঠেছেন আপনি?—বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে। চট ক'রে মাথার চুল আর পরনের কাপড় ঠিক ক'রে নিয়ে খাটিয়ার কাছে এগিয়ে এসে সে আবার বললে, কেমন আছেন এখন?

সুবোধ কোন উত্তর দিলে না; সুভদ্রা নিজেই সুবোধের কপালে হাত দিয়ে বললে, জ্বরটা একটু কমেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু ঘামে একেবারে ভিজে গিয়েছেন যে! সঙ্গে সঙ্গেই নিজের আঁচল দিয়েই সে সুবোধের মুখ মুছিয়ে দিলে; তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলে, একটু ভাল মনে হচ্ছে এখন?

সুবোধ এবারও কোন উত্তর দিলে না, তার চোখে তখনও সেই বিহ্বল দৃষ্টি।

সুভদ্রাই আবার বললে, দাঁড়ান, আলোটা আনি আগে।

উল্টো দিকের কোণে একটা তোরঙ্গের আড়ালে আলোটা রাখা ছিল; সুভদ্রা সেটা হাতে ক'রে খাটিয়ার কাছে নিয়ে এল,—ঝকঝকে নূতন একটা

টেবিল-ল্যাম্প। সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কেমন আছেন?

সুবোধ এবার অস্ফুট স্বরে বললে, ভাল।

হেঁট হয়ে আলোটা নীচে নামিয়ে রেখে সুভদ্রা হাসিমুখে বললে, ভালই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এখনও আমায় চিনতে পারছেন না নাকি? কাল তো একেবারে সাড়াই দেন নি!

সুবোধ ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলে, বিশ্বাস হয় নি। এখনও মনে হচ্ছে যে, স্বপ্ন দেখছি।

সুভদ্রা এবার শব্দ ক'রেই হেসে উঠল; হাসতে হাসতেই বললে, না, স্বপ্ন নয়। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্। দাঁড়ান, এদের তুলে দিই আগে, ভোরও হয়ে গিয়েছে।

তার পরেই সারদার কাছে গিয়ে তার গায়ে একটা ঠেলা দিয়েই সে বললে, ও বউদি, কত ঘুমোবে আর? ওঠ, আজ কাজে যেতে হবে না নাকি?

শ্যামাচরণ চোখ মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে ছুটে এল; স্মিতমুখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, এখন কেমন মনে হচ্ছে, সুবোধবাবু?

সুবোধ উত্তর দিলে, ভাল।

দিদিমণিকে দেখেই জ্বর পালিয়ে গিয়েছে—শ্যামাচরণ উল্লাসের স্বরে বললে, আর আসতে সাহস পাবে না।

শ্যামাচরণ আরও কি বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, তুমি থাম, শ্যামাচরণদা; ফটিককে ডাক, দুজনে ধরাধরি ক'রে খাটিয়াখানাকে বাইরে নিয়ে চল তো—খোলা হাওয়া একটু গায়ে লাগুক। আর তুমি, বউদি, চট ক'রে উনোনটা ধরিয়ে মুখ ধোবার জন্য একটু জল গরম ক'রে দাও।

মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সুবোধ যখন পরিচ্ছন্ন হয়ে বসল, তখন অল্প অল্প রোদ উঠেছে। সুভদ্রা থার্মোমিটারটা সুবোধের হাতে দিয়ে বললে, এটা মুখে দিন তো, জ্বরটা আগে দেখি; তার পর একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে, জ্বরটাকে আজই আমি ঠেকাতে চাই।

থার্মোমিটারে দেখা গেল, জ্বর আছে, তবে খুব কম। সুভদ্রা তখন ছুঁচ দিয়ে অনেকখানি কুইনাইন তার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। প্রক্রিয়াটা

শেষ করবার পর সে হাসিমুখে বললে, কালই আপনার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি আমি, রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু পাওয়া গিয়েছে। আপনি উপেক্ষা ক'রেই রোগটাকে এত বাড়িয়েছেন।

সুবোধ উত্তর না দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, কখন এলেন আপনি?

সুভদ্রা বিব্রতের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেন? আগেই তো বলেছি আপনাকে—কাল দুপুরের পর।

শ্যামাচরণদা আপনাকে ডেকে এনেছে বুঝি?

না।—সুভদ্রা চোখ নামিয়ে উত্তর দিলে, আমি নিজেই এসেছি। শ্যামাচরণদা আমায় খবর দিয়েছেন মাত্র।

শ্যামাচরণ কাছেই ছিল, সে হেসে উঠে বললে, আমি আগেই বলেছিলাম, সুবোধবাবু, খবর পেলে দিদিমণি না এসে থাকতেই পারবে না।

থাম তুমি।—সুভদ্রা কুণ্ঠিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে ধমক দেবার মত ক'রে বললে, এখানে ব'সে বক্‌বক্ না ক'রে হাসপাতালে একবার যাও—দেখে এস বড় ডাক্তারবাবু এসেছেন কি না!

শ্যামাচরণ বিস্ময়ের স্বরে বললে, কদিনেই সব কথা ভুলে গেলে নাকি দিদিমণি? এত সকালে বড় ডাক্তারবাবু কোন দিন আসেন?

তবু যাও তুমি।—সুভদ্রা যুক্তিটাকে উপেক্ষা ক'রেই রীতিমত হুকুমের স্বরে বললে, ওখানে গিয়েই ব'সে থাক গে; তিনি এলেই আমায় খবর দেবে।

শ্যামাচরণের সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল; সুবোধ বললে, একটু দাঁড়ান, সুভদ্রা দেবী।

শ্যামাচরণ বের হয়ে যাবার পর সে কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আপনি এখানে যে এলেন? ভয় করল না আপনার?

ভয়!—সুভদ্রা সত্যই বিস্মিত হয়ে বললে।

ভয় করবারই তো কথা।—সুবোধ উত্তরে বললে, কেন—শ্যামাচরণদা কিছু বলে নি আপনাকে? আমরা চ'লে যাবার পর এখানে অনেক রকমের কথা হয়েছে যে!

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে বললে, তা আমি জানি। কিন্তু পরের

মুহূর্তেই মুখ তুলে হেসে ফেললে সে ; সুবোধের মুখের দিকে চেয়েই সে আবার বললে, না, আমার ভয় করে নি—একটুও না।

কিন্তু সুবোধ মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, না, এসে ভাল করেন নি আপনি। এই নিয়ে আবার হয়তো কথা উঠবে।

উত্তরে সুভদ্রা শব্দ ক'রেই হেসে উঠে বললে, কেন, সুবোধবাবু? কথা যারা রটনা করেছে, তারা তো আমার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি! আজ আর কোন্ নূতন কুৎসা রটনা করবে তারা?

সুবোধ কোন উত্তর ভেবে পেলে না। একটু পরে সুভদ্রাই হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার বললে, না, সুবোধবাবু, যা মিথ্যে তাকে আমি ভয় করি নে।

কিন্তু আমাকে?—আমাকে ভয় হ'ল না আপনার? সেই রাত্রির কথা মনে উঠল না?—কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সুবোধ হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল।

এবার কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে সুভদ্রা ; মৃদু স্বরে বললে, এ কথা আবার কেন বলছেন? সেদিন আমার মেসেই তো এ কথা শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুবোধ আর কোন কথা বললে না ; একটা নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে।

সুভদ্রা আড় চোখে এক বার সুবোধের দিকে চেয়ে দেখলে ; তার পর নিজের শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, সুবোধবাবু, আমি স্নানটা সেরে আসি গে।

সে ফিরে এল আধঘণ্টাখানেক পর। তার দিকে চেয়ে সুবোধ মুগ্ধ হয়ে গেল। তার পরনে কালো পাড়ের ধবধবে সাদা একখানা শাড়ি ; ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, মুখে সদ্যস্নানের শুচিস্নিগ্ধ ভাব, ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি একটু হাসির রেশ, হাতে বড় একখানি থালার উপর এক বাটি গরম দুধ।

থালাখানি সুবোধের সামনে রেখে সুভদ্রা হাসিমুখে বললে, লক্ষ্মী ছেলের মত এখন এই দুধটুকু খেয়ে ফেলুন তো।

বিস্ময়ে দুই চোখ বন্ধ ক'রে সুবোধ বললে, দুধ কোথায় পেলেন, সুভদ্রা দেবী?

সুভদ্রা সংক্ষেপে উত্তর দিলে, বাজারে।

কিন্তু এ যে বড্ড দামী পথ্য!—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আর তা-ও এতটা? এ বাড়িতে ওই এতটুকু তারাও তো কোন দিন দুধ খেতে পায় না।

ঠোঁটের কোণের ফুটন্ত হাসিটুকু ছদ্ম গাম্ভীর্যের নীচে চাপা দিয়ে সুভদ্রা বললে, দুধটুকু আগে খেয়ে ফেলুন, বক্তৃতা পরে দেবেন।

তথাপি সুবোধ অবাক চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুভদ্রা শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলেই আবার বললে, অনিচ্ছুক লোককে রবারের নলের সাহায্যে কেমন ক'রে দুধ খাওয়ানো যায় তা আমি জানি, সুবোধবাবু—আর সে নল আমার ব্যাগের মধ্যেই আছে।

সুবোধ আর আপত্তি করলে না; বাটিটা তুলে নিয়ে এক চুমুকেই অর্ধেকটা দুধ সে খেয়ে ফেললে; তার পর বাটিটা আবার সে থালার উপর নামিয়ে রাখবার উপক্রম করতেই সুভদ্রা উদ্বেগের স্বরে বললে, ও কি—রেখে দিচ্ছেন কেন?

আর খেতে পারব না, সুভদ্রা দেবী।—বাটিটা নামিয়ে রেখে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, গায়ে এখনও জ্বর রয়েছে তো—আর বোধ হয় এখন থেকেই বাড়তেও শুরু করছে।

সুভদ্রা আর অনুরোধ করলে না; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর বাটিটা তুলে নিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

ফিরে এসে ম্লান মুখখানাকে হাসবার মত ক'রে সে বললে, জ্বর এলেও ভাবনার কোন কারণ নেই, ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইনের জোরে বন্ধ হবেই।

কিন্তু উত্তরে সুবোধ কাতর স্বরে বললে, আমি বলি কি, সুভদ্রা দেবী, একটু চেষ্টা ক'রে আমায় চুঁচুড়া কি শ্রীরামপুর হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিন। কত দিন ভুগতে হবে কে জানে!

সুভদ্রার মুখ হঠাৎ অসাধারণ রকমের গম্ভীর হয়ে উঠল; এক দৃষ্টে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, ডাক্তারবাবু তো আগেই আপনাকে হাসপাতালে যেতে বলেছিলেন। তখন যান নি কেন?

চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুবোধ উত্তর দিলে, তখন ভেবেছিলাম যে, সামান্য জ্বর দু-এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

এখনও সে কথা ভাবতে বাধা নেই।—ব'লে সুভদ্রা হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, আপনার এই জ্বরটুকু এখানেই আমি সারিয়ে দিতে পারব, এ জন্য হাসপাতালে যেতে হবে না আপনাকে।

উত্তরে সুবোধ আর একটা কি কথা বলবার উপক্রম করতেই সুভদ্রা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বললে, থাক্, কথা বলবার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে। এখন শুয়ে বিশ্রাম করুন আপনি, আমি ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

সেদিনও কম্প দিয়ে সুবোধের জ্বর এল; আগের দিনের মতই অজ্ঞান হয়ে গেল সে। পরদিনও জ্বর এল, কিন্তু তাপ খুব বেশি উঠল না; রাত্রে জ্বর একেবারেই ছেড়ে গেল। তৃতীয় দিন জ্বর আর এল না। নির্দিষ্ট সময়টা কেটে যাবার পর সুভদ্রা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসিমুখে বললে, কালও যদি জ্বর না আসে, তবে পরশু ভাত খেতে পাবেন।

মুখখানা হাসবার মত ক'রে সুবোধ ক্ষীণ স্বরে বললে, পরশু পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তবে তো! ক্ষিদের জ্বালায় এখনই যে ম'রে যাচ্ছি!

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি ক্ষিদে পেয়েছে আপনার? পরে হেসে ফেলে সে আবার বললে, এটা ভাল লক্ষণ। বসুন আপনি, আমি দুটো লেবু ছাড়িয়ে আনছি।

ফলের রেকাবিটা সুবোধের সামনে এগিয়ে দিয়ে সুভদ্রাও একটু দূরে আসন পেতে বসল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে সুবোধের খাওয়া দেখবার পর হঠাৎ সে বললে, শরীরটা একটু সারলেই আপনি বাড়ি ফিরে যান, সুবোধবাবু।

সুবোধ চমকে উঠে বললে, কেন, বলুন তো?

আপনার শরীরটা সত্যি ভাল নেই।—সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, আপনার ভাল রকম চিকিৎসা আর যত্নের প্রয়োজন।

তা হয়তো ঠিক।—সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু বাড়িতে গেলে কি লাভ হবে আমার? একবার বাড়িতে যাবার পুরস্কারই তো এই ম্যালেরিয়া!

সুভদ্রা লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তা হ'লে আর কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় যেতে হবে আপনাকে।

সুবোধ হাসতে হাসতেই বললে, কিন্তু সেখানে আমার শুশ্রূষা আর যত্ন কে করবে? সুভদ্রা দেবী দূরে থাক্, শ্যামাচরণদাকেও তো সেখানে পাওয়া যাবে না!

সুভদ্রার কুণ্ঠিত মুখখানিতে এবার একটু লালের ছোপ দেখা দিল। সেটা চোখে পড়তেই সুবোধ তৎক্ষণাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, না, সুভদ্রা দেবী, তেমন কোন শক্ত অসুখ আমার হয় নি। আর হ'লেও এ সময়ে কাজকর্ম ফেলে আমি যেতে পারতাম না।

কাজকর্মের জন্য প্রাণ দেবেন আপনি?—সুভদ্রা মুখ তুলে সোজা সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে করুণ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

কিন্তু সুবোধ হাসিমুখেই উত্তর দিলে, দরকার হ'লে তা-ও দিতে হবে বইকি!

সুভদ্রার চোখ দুটি নত হয়ে পড়ল, সে কোন উত্তর দিলে না।

একটু পরে সুবোধই আবার বললে, না, সুভদ্রা দেবী, শরীরটা আমার একটু কাহিল হয়ে থাকলেও প্রাণ এখনও যাবার নোটিশ দেয় নি। এ বারের জ্বরের ধাক্কা পাঁচ-সাত দিনেই আমি সামলে নিতে পারব।

শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে সুভদ্রা বললে, তার পর অত্যাচার-অনিয়ম ক'রে আবার জ্বরে পড়বেন তো?

না।—সুবোধ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, কথা দিচ্ছি আপনাকে, জ্বরের কথা ঠিক বলতে পারি নে, তবে অত্যাচার-অনিয়ম করব না।

তার পর সুবোধ কাজের কথা বলতে শুরু করলে, নূতন ইউনিয়নের সদস্য কেমন হচ্ছে, পুরানো ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কি রকম চলেছে, পুলিসের তৎপরতা কতটা বেড়েছে—এই সব কথা। সুবোধ দুঃখ করলে

তার কর্মী আর অর্থের অভাবের কথা নিয়ে। সেই প্রসঙ্গেই হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, আচ্ছা, সুভদ্রা দেবী, নূতন নার্স যিনি এখানে এসেছেন, তাঁর তো শুনেছি অস্থায়ী চাকরি। তা আপনি এখানে ফিরে আসতে পারেন না?

সুভদ্রার মুখখানা হঠাৎ একটু লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। সবেগে মাথা নেড়ে সে প্রায় আর্ত কণ্ঠেই বললে, না, না, সুবোধ-বাবু, এখানে আর আমায় টানবেন না আপনি। হুগলীর সঙ্গে সব সম্বন্ধই আমি চুকিয়ে দিয়ে গিয়েছি। আপনি এখানে এসে এ রকম ব্যারামে না পড়লে কেউ হয়তো এখানে আর আমায় দেখতেই পেত না।

সুবোধের নিজের মুখখানাও বিবর্ণ হয়ে গেল। কাজের কথা বলতে বলতে সে এতই মেতে উঠেছিল যে, অতীতের কথা, সুভদ্রার জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। হঠাৎ গোটা ইতিহাসটাই এক সঙ্গে তার মনে প'ড়ে গেল। সে বুঝলে যে, ঝোঁকের মাথায় অত্যন্ত নির্মম একটা অবিমৃষ্যকারী কাজ ক'রে ফেলেছে সে। লজ্জায় সেদিন সুভদ্রার মুখের দিকে ভাল ক'রে আর সে তাকাতেই পারলে না।

তৃতীয় দিন ভাত খাবে সুবোধ। বেলা দশটার আগেই সুভদ্রা তার কাছে এসে বললে, উঠুন, সুবোধবাবু, মাথাটা ধুইয়ে দিই, আমার রান্না হয়ে গিয়েছে।

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, এত শিগগির রান্না হয়ে গেল!

বাঃ রে!—সুভদ্রা হাসিমুখে উত্তর দিলে, এত দিন পর ভাত খাবেন, তা একটু সকাল সকাল হবে না? আর বেলাও নিতান্ত কম হয় নি, দশটা প্রায় বাজে।

আধ ঘণ্টাখানেক পর থালার দিকে তাকিয়ে সুবোধ ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, এরই মধ্যে এত আয়োজন কেমন ক'রে হ'ল, সুভদ্রা দেবী?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, হ্যাঁ, ভারি তো আয়োজন! রোগীর পথ্য, তার আবার—

সত্যই রোগীর পথ্য। সরু চালের অল্প কটি ভাত, উচ্ছে আর পেপে সিদ্ধ,

হেলেঞ্চার সুক্ত, মাগুর মাছের ঝোল আর কটি কমলালেবুর কোয়া। তথাপি সুবোধ পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। সিদ্ধ তরকারিগুলিকে সে কেবল নুন মাখিয়েই খেয়ে ফেললে; একটি চুমুকেই সুক্তের ঝোলটুকু সে শেষ ক'রে দিলে; হেলেঞ্চার ডাঁটা আর পাতাগুলিকে এমন ক'রে চিবোলে যে, ছোবড়ার মধ্যে এক ফোঁটা রসও আর অবশিষ্ট রইল না। তার পর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে একটি গ্রাস মুখে পুরেই আবার সে ছেলে-মানুষের মত উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, চমৎকার হয়েছে, সুভদ্রা দেবী, এমন আর কোন দিন খাই নি।

সুভদ্রা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, আঃ, বড্ড বাড়িয়ে বলছেন আপনি!

কক্ষনো না।—সুবোধ প্রতিবাদ করলে, যা বলেছি তা খাঁটি সত্য কথা। আচ্ছা, বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজেই একটু খেয়ে দেখুন তো!

আঃ!—সুভদ্রা আরও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এমন যদি করেন তো আমি উঠে যাব।

সুবোধ হেসে বললে, তা হ'লে আমি মোটে খাবই না। যান তো উঠে, দেখি কেমন!

সুভদ্রাও হেসে ফেললে; কিন্তু তখনই হাসি থামিয়ে অনুনয়ের স্বরে সে বললে, খান, সুবোধবাবু, শুধু তো আদা আর হলুদের রান্না, জুড়িয়ে গেলে আর মুখে তুলতে পারবেন না।

সুবোধ ভাল ছেলের মত আবার খেতে আরম্ভ করলে; কিন্তু কয়েক গ্রাস খেয়েই আবার মুখ তুলে বললে, সত্যি বলছি, আদার রান্নাই হোক আর গরম মশলার রান্নাই হোক, হয়েছে যেন অমৃত।

ওই, আবার শুরু হ'ল আপনার!—সুভদ্রা আবার লাল হয়ে উঠে বললে।

তোষামোদ নয়, সুভদ্রা দেবী!—সুবোধ হাসিমুখে উত্তর দিলে, সত্যি, জিভে এত ভাল লাগছে যে, মুখ সেটা প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারছে না।

সুভদ্রা লজ্জিত স্বরে বললে, অনেক দিন পরে খাচ্ছেন কিনা, তাই এত ভাল লাগছে।

উহুঁ।—সুবোধ মাথা নেড়ে বললে, কেবল অনেক দিন পরে খাচ্ছি ব'লে নয়, অনেক দিন পরে সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি ব'লেই জিভে এত ভাল লাগছে।

না, এবার উঠতেই হ'ল আমাকে।—বলতে বলতে সুভদ্রা সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়াল। সুবোধ চমকে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই সে ভ্রূভঙ্গী ক'রে আবার বললে, দোহাই আপনার, এখন মুখ বুজে ওই ভাত কটা খেয়ে ফেলুন। কিন্তু খাওয়া হ'লেই উঠে পড়বেন না যেন—আমি দুধ আনছি।

খাওয়ার পর মুখ মুছতে মুছতে হঠাৎ তোয়ালেখানি নামিয়ে রেখে সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আজ সকাল থেকে শ্যামাচরণদাকে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

সুভদ্রা উত্তরে বললে, আমি তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছি ক'টা ওষুধ কেনবার জন্য।

ওষুধ!

হ্যাঁ, একটা ইন্‌জেক্‌শনের আর দুটো খাওয়ার টনিক ওষুধ—ডাঃ চৌধুরী আপনার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। বলেছি তো, এখন কিছু দিন আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

সুবোধ বিহ্বলের মত বললে, কিন্তু আপনি ওষুধ আনতে পাঠালেন কেন?

সুভদ্রা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, আপনাকে আমার বিশ্বাস হয় না, তাই। চিরদিনই তো দেখে আসছি, নিজের জন্য কোন কিছু কেনবার দরকার হ'লেই আপনার পয়সার অভাব হয়। তাই পয়সার অভাব হ'লেও ওষুধের অভাব যাতে না হয়, তার ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

সুবোধের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। একটু পরে সুভদ্রাই আবার বললে, শ্যামাচরণদা এখনই হয়তো ফিরে আসবে। তা ছাড়া ঘরে দু-চুখানা খবরের কাগজ আছে। তাই নিয়ে একটু সতর্ক হয়ে থাকবেন, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কথাটার মর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরেই যেন সুবোধ অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমায় এখুনি বাইরে যেতে হবে—দুপুরে আমার খাবার নিমন্ত্রণ রয়েছে।

নিমন্ত্রণ!

হ্যাঁ, মিসেস সরকার আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন—ওই যে আমার জায়গায়

[illegible] হয়ে এসেছেন—তাঁর সঙ্গে সে দিন পরিচয় হ'ল, কিনা, [illegible] আন্তরিক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

না, না।—সুবোধ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বললে, সে কি কথা! অস্বীকার কেন করবেন? বেশ করেছেন আপনি। তা যান, আমার শরীর তো বেশ ভালই আছে আজ।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।—সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, কথা দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু আপনিও কথা দিয়ে যান আমায়। আমাকে পাহারা দেবার জন্য আধপেটা খেয়ে ছুটে আসবেন না যেন।

পরদিন খাওয়ার পর ঠিক ওই কথাটাই স্মরণ ক'রে সুবোধ পরিহাসের স্বরে বললে, আজ কোথাও নিমন্ত্রণ নেই আপনার?

সুভদ্রা হেসে ফেলে বললে, ছিল, কিন্তু আর একটা তাগিদে নিমন্ত্রণটাকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল।

সে আবার কি?

কাজের তাগিদ।

সুবোধ বিস্মিতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুভদ্রা হাসি থামিয়ে নিজেই আবার বললে, ভালই হ'ল কথাটা আপনি তুললেন, আজ আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই।

সুবোধ চমকে উঠে বললে, আজই?

চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, অনেক দিন হয়ে গিয়েছে কিনা—প্রায় এক সপ্তাহ।

সুবোধ আবার চমকে উঠল, এত দিন হয়ে গিয়েছে, তা তার খেয়াল ছিল না। ঢোক গিলে সে বললে, তা বটে।

শ্যামাচরণ আজ কাছেই ছিল; সে কতকটা ক্ষোভ, কতকটা অনুনয়ের স্বরে বললে, আর দুটো দিন যদি থেকে যেতে, দিদিমণি!

না, না, কিছু দরকার নেই।—বলতে বলতে সুবোধ ন'ড়ে-চ'ড়ে সোজা হয়ে বসল। সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কখন যেতে চান?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর দিলে, এখুনি—খাওয়াটা সেরেই রওনা হব ঠিক করেছি।

সুবোধ বললে, তবে আর দেরি করবেন না—যান, আপনার স্নানও তো হয় নি!

যাবার আগে শ্যামাচরণকে একটা রিক্‌শা আনতে পাঠিয়ে সুভদ্রা সুবোধের কাছে এসে বললে, শরীরের অযত্ন করবেন না, সুবোধবাবু, ওষুধপত্র নিয়ম মত খাবেন। আমায় কথা দিয়েছেন, তা মনে আছে তো?

সুবোধ হেসে বললে, আছে, আর তা থাকবেও। এবারের মত আবার যাতে আপনাকে বিব্রত না হতে হয়, সেই জন্যই এবার আমার অসুখ হওয়াটাকে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমার একটা কথা আপনি রাখবেন?

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কি?

সুবোধ হাসিমুখেই উত্তর দিলে, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে আপনি তো আমায় অষ্টপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন। শুধু ওর একটা প্রতিশ্রুতি থেকে আজ আমায় মুক্তি দিয়ে যাবেন?

সুভদ্রা বিহ্বলের মত বললে, কি বলছেন, সুবোধবাবু? কবে আবার কোন্ প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছি আমি?

সুবোধ প্রশ্নের উত্তর দিলে না; একটু ইতস্তত ক'রে পরে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আপনার অনুমতি পেলে আপনার বিষয় নিয়ে অরুণাংশুর সঙ্গে আমি এক বার কথা বলতে চাই।

সুভদ্রার মুখখানি অল্প একটু লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেল। দুই চোখ বড় ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে সে বললে, না, সুবোধবাবু—কক্ষনো না; আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তাকে আপনি বলতে পাবেন না, আমার ঠিকানাটা পর্যন্ত নয়।

সেই রাত্রির কথা সুবোধের মনে প'ড়ে গেল, তখনও তার এই প্রস্তাব শুনে সুভদ্রা এই রকমেই প্রতিবাদ করেছিল। এ শুধু প্রতিবাদ নয়, এ যেন আর্তনাদ। সুবোধের নিজের মুখখানাও কালো হয়ে গেল।

একটি নিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; মৃদু স্বরে বললে, বেশ, কথা

তো অনেকেই জেনেছে [illegible]। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখ থেকে সে কিছু জানতে পারবে না।

শুভদ্রা যখন কলকাতার বাসায় ফিরে এল, বেলা তখন প্রায় তিনটা। [illegible] বাসায় নেই; আর সব মেয়েরা যার যার ঘরে বিশ্রাম করছে। যে দু-একজনের সঙ্গে তার দেখা হ'ল, তাদের সঙ্গে দু-একটি মামুলী কথা ব'লেই সে তালা খুলে তার নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

তখন তার শরীর আর মন দুইই বড় বেশি ক্লান্ত। একাদিক্রমে প্রায় সাতটি দিন তার উপর দিয়ে যেন প্রচণ্ড একটা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে। এত দিন সে ভাল ক'রে ঘুমোতে পারে নি, খেয়েছে না-খাওয়ার মত; ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মধ্যে তাকে রোগীর বিছানার ধারে ব'সে রোগের সঙ্গে, যমের সঙ্গে, এমন কি, রোগীর সঙ্গেও লড়তে হয়েছে। ওই সঙ্গেই লোকচক্ষুর অগোচরে ভিতরে ভিতরে নানা রকম প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যে লড়াই তাকে করতে হয়েছে, তার তীব্রতা আরও বেশি। কত রকম উদ্বেগ আর আশঙ্কা যে পুনঃ পুনঃ তাকে আক্রমণ করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। ওই সঙ্গে আবার নানা রকমের কামনা—কখনও বুদ্বুদের মত উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে, কখনও ঢেউয়ের মত ফুলে উঠে বুকের তটে আছাড় খেয়ে পড়েছে। ওর কোন্‌টা যে কি, ভাল ক'রে সে তা বুঝতেও পারে নি। শুধু বুঝেছে যে, কামনা হোক, আশঙ্কা হোক, উদ্বেগ হোক,—ওর কোনটাকেই তার আমল দেওয়া চলবে না,—সন্দিগ্ধ চোখ, সাগ্রহ জিজ্ঞাসা, তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি আর সনির্বন্ধ অনুরোধকে সুকৌশলে এড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে কলকাতার অজ্ঞাতবাসে ফিরে যেতে হবে। সে-ও লড়াই; এক দিন ঘুমের মধ্যেও সে রেহাই পায় নি।

কিন্তু জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আজ তার শরীর ও মন দুইই আবার অবসাদে একেবারে এলিয়ে পড়ল। ঘরে ঢুকেই তার মনে হ'ল যে, হাতের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও তার ফাঁকা হয়ে গিয়েছে,—আজ আর তার কোন কাজও নেই, কাজ করবার ইচ্ছাও নেই। হাতের ব্যাগটাকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখেই সে বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

অসহ্য গরম। কাপড়ের নীচে দরদর ক'রে ঘাম ছুটছে। কিছুক্ষণ ছটফট করবার পর জামাকাপড় আর গায়ে রাখতে না পেরে সুভদ্রা শেমিজ পর্যন্ত খুলে ফেলে দিলে। তার পর হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তা সে জানতেও পারলে না।

তার ঘুম ভাঙল কমলার ডাকে—সুভদ্রা, ও, সুভদ্রা,—কত ঘুমোবে আর? সন্ধ্যে যে হয়!

সুভদ্রা চমকে চোখ মেলেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল; বুকের কাপড় টেনে দিয়ে লজ্জিত স্বরে বললে, তাই তো, কি ঘুমই ঘুমিয়েছি! ছিঃ ছিঃ, দোরটা পর্যন্ত—

ভয় নেই, আর কেউ দেখে নি।—কমলা তিক্ত কণ্ঠে বললে, উঠে ভাল ক'রে কাপড় সামলাও এখন।

সুভদ্রা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, যন্ত্রচালিতের মতই বুকের উপর আঁচলখানা সে আরও একটু ক'ষে টেনে দিলে। কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগেই কমলা জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলে তুমি?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, এই দুপুরের পর।

কেন?—কমলার কণ্ঠে কঠিন বিদ্রূপ বেজে উঠল, এলে কেন? নদীতে জল ছিল না ওখানে? ডুবে মরতে পারলে না?

সুভদ্রা হেসে ফেলে বললে, না ভাই, পারলাম না; আর ইচ্ছেও হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই আলনার উপর থেকে কাপড় জামা আর একখানা তোয়ালে টেনে নিয়ে সে আবার বললে, তবে এখন স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার, সেটা আগে সেরে আসি। তুমি ততক্ষণে একটু চায়ের ব্যবস্থা যদি কর, প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দেব।

অনেক রকমের পরিহাস আর শক্ত জেরার জন্য তৈরি হয়েই সুভদ্রা স্নানের পর কমলার কাছে এসে বসল। কিন্তু কমলার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল সে,—সে মুখ অসাধারণ রকমের গম্ভীর। চা খেতে খেতে যে দু-চারটি কথা সে বললে, তা নিতান্তই মামুলী এবং অবান্তর। খাওয়ার পরেও সে রসিকতা করলে না; বরং আগের চেয়েও যেন বেশি গম্ভীর হয়ে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, ঠিক ক'রে বল তো সুভদ্রা, তোমার কি হয়েছে?

হবে আবার কি ?—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কি বলছ তুমি ?

ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে কমলা বললে, আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ কথা এত দিন গোপন করেছ কেন ?

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় সুভদ্রার বুকের ভিতরটা দুরদুর ক'রে উঠল। বিহ্বল স্বরে সে বললে, ওমা, কি আবার তোমার কাছ থেকে গোপন করেছি ! কি বলছ তুমি ?

কমলা এবার তার চোখের দিকে চেয়ে স্বরটা একটু নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছি বোঝ না তুমি ? ঠিক ক'রে বল, ক'মাস হয়েছে ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠল সুভদ্রা ; এক মুহূর্তেই তার মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল ; চোখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সে শুধু বললে, না।

কমলা বিস্ময়ের স্বরে বললে, 'না' কি বলছিস ?

সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, না, কিচ্ছু হয় নি।

হয় নি!—কমলার কণ্ঠস্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে তুমি ? মাতৃত্বের প্রত্যেকটি চিহ্নই তো তোমার গায়ে ফুটে উঠেছে।

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু মরিয়ার মতই মুখ তুলে তাকাল সে ; খুব জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, কমলা, তুমি কিচ্ছু জান না। কি সব যা-তা কথা বলছ !

কমলা কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; তার পর হঠাৎ তার ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত নীরস, নিতান্তই অদ্ভুত রকমের ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠল ; ঘাডটা আরও একটু হেলিয়ে, ভুরু বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, দেখ্, সুভদ্রা, তোর মত আনাড়ী মেয়ে আমি নই। আমি তো কেবল নার্সই নই, সন্তানও আমি পেটে ধরেছিলাম। আমার শুকনো মাই টিপলে আজও হয়তো দু-চার ফোঁটা দুধ বের হবে। দেখবি তুই ?

ধেৎ!

ওই অবস্থার মধ্যেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠে চোখ বুজে হাত তুলে সুভদ্রা বললে, থাক্ থাক্, ও আমি দেখতে চাই নে।

তাই মনে রাখিস!—কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, আমার চোখকে ফাঁকি

দেওয়া অত সোজা নয়। আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তার উপর আজ তোর শরীরের অনেকখানিই আমার চোখে পড়েছে। আজ আর আমার জানতে কিছুই বাকি নেই।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মাথাটা আবার নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, বার দুই ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, না, কমলা, তুমি ভুল করেছ। আমার কিচ্ছু হয় নি।

কমলা আবার কিছুক্ষণ অভিভূতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার একখানি হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে গাঢ় স্বরে সে বললে, সুভদ্রা, লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার কাছে গোপন ক'রো না; সত্যি বল তো, বিয়ে তোমাদের হয়েছে, না, নিজের সর্বনাশ করেছ তুমি ?

সুভদ্রার সারা শরীরটাই এক বার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; একটু দূরে স'রে গিয়ে বললে, কিছুই হয় নি, কমলা, তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়। বার বার সব হালকা ঠাট্টা করছ তুমি, এবার তো একেবারে চরম। কেউ শুনতে পেলে কি ভাববে, বল তো!

কমলার চোখ দুটি এক বার যেন জ্ব'লে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। একটু চুপ ক'রে থেকে একটি নিশ্বাস ফেলে সেও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, আর কোন দিন বলব না। কিন্তু, সুভদ্রা, মনে রেখো, যা আজ আমার চোখে পড়েছে তা আরও দশ জনের চোখে পড়া অসম্ভব নয়,—আর দু-এক মাস পর চোখে তাদের পড়বেই। শত চেষ্টা ক'রেও তোমার এ অবস্থা চির কাল তুমি গোপন রাখতে পারবে না।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না। কি উত্তর দিবে সে? ও যে তার নিজের অন্তরের আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি! তা-ও অনিশ্চিত আশঙ্কা আর নয়, সুদূরের সম্ভাবনা আজ বর্তমানের রূঢ় বাস্তব হয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে সচেতন ক'রে তুলেছে। আচরণের সতর্কতা আর ক্ষীণ কণ্ঠের অন্তঃসারশূন্য প্রতিবাদের নিরর্থকতার উপলব্ধিই আজ তাকে একেবারে নির্বাক ক'রে দিলে।

কমলা আর তাকে জেরা করলে না; দিন আবার আগের মতই কাটতে

লাগল। কিন্তু দুর্ভাবনার কালো ছায়াখানি সুভদ্রার মুখের উপর ঘন হয়ে, পাকা হয়ে চেপে ব'সে রইল। মনে মনে নিঃসংশয়েই সে অনুভব করলে যে, তার জীবনের জটিল সমস্যাটির মধ্যে গত কয় দিনে আরও কয়েকটি গ্রন্থি পড়েছে; যে উদ্দেশ্যে মাস তিনেক আগে হুগলী থেকে সে অমন পাগলের মত পালিয়ে এসেছিল, সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হয় নি; ধরা সে পড়েছে, যাদের কাছ থেকে নিজেকে সে সরিয়ে এনেছিল তারা তার গোপন আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছে; নিজের যে অবস্থাটা অপরের কাছ থেকে সে গোপন রাখতে চেয়েছিল, সেটাও অন্তত এক জনের চোখে ধরা প'ড়ে গিয়েছে। অদূর-ভবিষ্যতে ওই কমলার মতই আরও অনেকে যে খালি চোখেই তার অবস্থাটা স্পষ্ট দেখতে পাবে এবং তখন অস্বীকৃতির একটা কথাও সে মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না, সে সম্বন্ধেও তার মনে কোন সন্দেহ রইল না।

অথচ এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান যে কি, তা-ও সে ভেবে স্থির করতে পারলে না। এক এক বার তার মনে হতে লাগল যে, কমলার কাছেই আগাগোড়া সমস্ত ইতিহাস সে খুলে বলবে, তারই পরামর্শ নেবে নিজের কর্তব্য নির্ধারণ করবার জন্য। কিন্তু সে দিন যে কথাটা প্রশ্নের উত্তরেও সে মুখ ফুটে বলতে পারে নি, সেই কথাটাই আবার নিজে থেকে খুলে বলবার কল্পনা মাত্রেই মনটা তার বেঁকে বসতে লাগল। অবস্থাটা অগ্নিপরীক্ষার মতই ভয়ঙ্কর, মনে মনে নিজের কথাগুলি মহড়া দিতে আরম্ভ করলেই নির্জন ঘরের মধ্যেও দুই চোখ তার জলে ভ'রে ওঠে, মুখ শুকিয়ে যায়, ঘৃণা ও লজ্জায় গোটা শরীরটাই যেন রি-রি করতে থাকে। কোন বারই সঙ্কল্পটাকে শেষ পর্যন্ত সে খাড়া রাখতে পারলে না। শেষের দিকে আর এক বার পালিয়ে যাবার ইচ্ছাটাই তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। সে ভাবলে যে, মেস ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে এমন এক জায়গায় সে চ'লে যাবে, যেখানে চেনা-জানা স্ত্রী-পুরুষ কোন মানুষের সঙ্গেই তার দেখা হবার সম্ভাবনা না থাকে,—কারও কাছেই কোনও রকমে তাকে জবাবদিহি না করতে হয়। গোপনে গোপনে নিজের সঞ্চিত অর্থের হিসাবও ক'রে দেখলে সে।

তার পর এক দিন তার মনের ওই ইচ্ছাটা কমলার কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সেদিনের সেই ঘটনার পর সাক্ষাৎভাবে দূরে থাকুক পরোক্ষভাবেও কমলা ওই সম্বন্ধে তাকে আর একটি কথাও বলে নি। কিন্তু দিন-পনরো পর সে দিন দুপুর বেলায় আবার সে সুভদ্রার খুব কাছে ঘেঁষে ব'সে কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই জিজ্ঞাসা করলে, একটা আলাদা বাসার খোঁজ করব?

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কেন—বল তো? কিন্তু তার পরেই চমকে উঠে জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে আবার বললে, না, না, কিচ্ছু দরকার নেই।

কিন্তু কমলা একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেবল তোমার জন্য নয়, সুভদ্রা, আমিও সেখানেই থাকব। মেসে থাকতে আমারও আর ভাল লাগছে না।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, না, আমার বাসার দরকার নেই।

কমলা এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কেন? এখানে এসে অবধিই তো তুমি কেবলই খুঁতখুঁত করছিলে। এখন আবার মেস তোমার এত ভাল লাগল কেন?

ভাল লাগার কথা নয়।—সুভদ্রা মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু বাসা দিয়েই বা আমি কি করব? মানে—কলকাতাই যখন আমি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি।

ছেড়ে যেতে চাচ্ছ!—কমলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে। চোখের দৃষ্টিও তার অকস্মাৎ অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সুভদ্রা আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, ভাই, এখানে আর ভাল লাগছে না। ভাবছি, আবার পশ্চিমেই ফিরে যাব।

মুখ তুলে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে কথাটাকে সে শেষ করলে, ব্যবসার সুবিধেও তো এখানে তেমন হচ্ছে না, এখানে থেকেই বা কি করব!

কিন্তু যাবে কোথায়?—কমলা বিহ্বলের মত বললে।

সুভদ্রা বার দুই ঢোক গিলে আমতা আমতা ক'রে উত্তর দিলে, আবার আশ্রমেই ফিরে যাব মনে করছি, স্বামীজীকে চিঠিও লিখেছি।

কথাটা মিথ্যা; তথাপি সুভদ্রা ওই কথাটাই সব চেয়ে বেশি জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে।

কমলার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত কালো হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এ সব কথা আমায় আগে বল নি কেন?

অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে সুভদ্রা মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, কিছুই তো ঠিক হয় নি এখনও। ভেবেছিলাম যে—মানে—ওদের জবাব পেলে পরে তোমায় বলব ঠিক করেছিলাম।

কৈফিয়ৎ শুনেও কমলার মুখের ভাবের কোনই পরিবর্তন হ'ল না। আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, বেশ, তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়—যেয়ো। কিন্তু—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে; একদৃষ্টে সুভদ্রার আনত মুখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে কথাটাকে সে শেষ করলে, কিন্তু ঠিক জেনো, সুভদ্রা, আশ্রমেই যাও আর যেখানেই যাও, এই কমলার কাছে যে আশ্রয় তুমি পেতে তা হয়তো আর কোথাও তুমি পাবে না।

কথাটা শেষ ক'রেই সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর নীচের তলা থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে উপরে এসে উৎফুল্ল স্বরে সে সুভদ্রাকে বললে, ব্যবসার সুবিধে হয় না বলছিলে, সুভদ্রা, দেখ সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান তোমার কথাটাকে মিথ্যে প্রমাণ ক'রে দিলেন। নীচে গিয়ে শোন গে,—তোমার একটা কল্ এসেছে—খুব মোটা দক্ষিণে পাবে।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।—কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে উত্তর দিলে, আমার কথা তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি নে আমি—নীচে গিয়ে নিজের কানে শোন গে—ডক্‌টর বোস নিজে ওদিকে টেলিফোন ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন—তোমাকেই তাঁর চাই। নীচে যাও শীগগির—অনেক টাকার কল্।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচে সিস্টারের ভারী ভাঙা গলার আওয়াজ শোনা গেল—শীগগির এস, সুভদ্রা, ডক্‌টর বোস তোমায় ডাকছেন।

৪

রমেনবাবু আর মহামায়া দেবীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অরুণাংশু নিজের বাসায় ফিরবার উপক্রম করেছিল; কিন্তু প্রতুলবাবু বাধা দিয়ে বললেন, তা হবে না, অরুণ, চল আমার বাড়িতে—রাতের খাওয়াটা আজ আমার ওখানেই সেরে যেতে হবে।

বাড়িতে ফিরবার পর ওই কথাটারই জের টেনে তিনি আবার বললেন, খালি বাড়িতে তোমার হয়তো খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, বাবা।

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, না, কাকাবাবু, কিছু কষ্ট হবে না। একটা মানুষের জন্য মা তো আধ ডজন লোক রেখে গিয়েছেন।

কথাটা মিথ্যা নয়; তথাপি প্রতুলবাবু অনুনয় ক'রেই বললেন, আমি বলি কি, অরুণ, কাছাকাছিই যখন বাড়ি তখন খাওয়া-দাওয়াটা তো তুমি এখানেই করতে পার।

অরুণাংশু আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না, কাকাবাবু, তার কিছু দরকার নেই, বাসায় আমার কোন অসুবিধে হবে না।

এর পর প্রতুলবাবু আর পীড়াপীড়ি করতে পারলেন না। কিন্তু অরুণাংশুকে একা পেয়েই অনামিকাও একটু যেন অভিমান ক'রেই বললে, বাবার কথাটা সরাসরি অগ্রাহ্য করলে তুমি? কেন—তিনি মন্দটা কি বলেছিলেন?

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, আমি তো বলি নি যে, তিনি মন্দ বলেছেন? শুধু বলেছি যে, দরকার নেই।

কেন?—অনামিকা প্রায় উদ্ধত স্বরে বললে, খালি বাড়িতে কষ্ট হবে না তোমার?

অরুণাংশু মাথা নেড়ে বললে, না, একটুও না। ওঁরা চ'লে যাওয়াতে আমি বরং হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বাপ—এত দিন ছিলাম যেন জেলখানায়। এবার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে কাজকর্ম করতে পারব।

আসল কথাটা ওই ভাবে চাপা প'ড়ে গেল। অরুণাংশু তখন দেশের কথা শুরু করলে। ওই প্রসঙ্গে এল রাজনীতি, এল যুদ্ধ, এল তার দলের কার্যকলাপের কথা। অরুণাংশু নিজে কি কি কাজ শুরু করেছিল অথচ মাঝে

নানা রকম গোলমালের জন্য ওদের কতগুলি অসম্পূর্ণ র'য়ে গিয়েছে, তার একটা ফিরিস্তিও দিয়ে ফেললে সে। কথায় কথায় কতকটা পরিহাস, কতকটা অনুতাপের স্বরে সে বললে, তুমি জান না তো, অনু, পার্টির লোকেরা এমন চ'টে গিয়েছে—দল থেকে আমার নাম কেটে দেয় আর কি।

অনামিকা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে বললে, দেওয়াই তো উচিত—যা করেছ এত দিন!

কিন্তু তার পরেই সে গম্ভীর হয়ে বললে, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি ক'রো না যেন। আমায় সেদিন কথা দিয়েছ—তা মনে আছে তো?

অরুণাংশু ঘাড় কাত ক'রে উত্তর দিলে, আছে।

কিন্তু স্রোত তাকে টেনে নিয়ে চলল।

সেটা ১৯৪২ সালের মে মাস। দেশের তথা জগতের পরিস্থিতি তখন অসাধারণ; যুদ্ধের অবস্থা সঙীন। এক দিকে রোমেলের জার্মান-বাহিনী তখন মিশরের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এক দিকে বর্মা গিয়েছে, সিঙ্গাপুর গিয়েছে, ভারতবর্ষের জঙ্গীলাট নিজে ঘোষণা করেছেন যে, যে কোন মুহূর্তেই ভারতের যে কোন উপকূলে জাপানী ফৌজ যুদ্ধের সব রকম মালমশলা নিয়ে অবতরণ করতে পারে। ভারতের রাজনৈতিক আকাশেও কালো মেঘ তখন ঘন হয়ে জ'মে উঠেছে—অল্প কিছু দিন আগেই মহাত্মা গান্ধী 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' ধুয়া তুলেছিলেন। তার পর প্রতি সপ্তাহেই 'হরিজন' কাগজে ওই মন্ত্রের ব্যাখ্যা চলেছে। ইংরজেকে তিনি স'রে যেতে বলছেন, ভারতের জন্য দাবি করছেন পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্জন করবার জন্য অদূরভবিষ্যতে জনগণের সক্রিয় চেষ্টার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও মাঝে মাঝে তার লেখায় ফুটে উঠছে। অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকেরা বলছে যে, একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলন আর তিরিশ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে ছাড়া গান্ধীজীর মুখ থেকে এমন আবেগ আর প্রেরণাময়ী বাণী আর বের হয় নি। ওই সব কথাই কতক বুঝে, কতক না বুঝে দেশের লোক কি যেন একটা অসাধারণ ও অনৈসর্গিক ঘটনার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।

সত্যিই দেশের অবস্থা তখন অসাধারণ। হাওয়ার মধ্যেই যেন তড়িৎ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাণে প্রাণে চলেছে তার প্রবাহ। ছোট-বড় সকলের

অবস্থাই অস্বাভাবিক রকমে উত্তেজিত। কেউ বলছে স্বাধীনতা, কেউ বলছে অরাজকতা, কেউ বলছে আসন্ন জাপানী আক্রমণের কথা। গান্ধীজীর লেখা আর টোকিও-রেডিয়োর প্রচারিত রূপকথা একত্র মিলিয়ে মহামূল্য রাজনৈতিক জ্ঞান হিসাবে জনসাধারণের পাতে পরিবেশন করা হচ্ছে। সরকারী বড় কর্তা থেকে পথের ভিখারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই আশঙ্কা করছে যে, জাপান অন্তত বাংলা দেশটা নিয়ে নিলে আর কি! মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু ক'রে কংগ্রেসের সব লোকই বলছে—এ যুদ্ধ আমাদের নয়।

তাতেই অরুণাংশু ক্ষেপে উঠল। সর্বান্তঃকরণেই এ যুদ্ধকে সে জনযুদ্ধ ব'লে বিশ্বাস করে; দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সঙ্গে একযোগে জাপানের আক্রমণকে সে প্রতিরোধ করতে চায়। দেশের লোকের যুদ্ধবিরোধী মনোবৃত্তিকে সে প্রতিরোধ প্রবৃত্তির অন্তরায় ব'লে মনে করতে লাগল। তার উপর আবার গান্ধীজীর লেখায় গণ-সত্যাগ্রহের আভাস পেয়ে সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠল। তার মনে হতে লাগল যে, ভ্রান্ত আদর্শবাদের কুহকে মুগ্ধ হয়ে গোটা জাতিটাই যেন উন্মত্তের মত অন্ধ আবেগে আত্মহত্যার পথে ছুটে চলেছে।

কমরেড চ্যাটার্জির সঙ্গে অনেক কথা বললে সে। মিঃ মজুমদারের সঙ্গেও তার কথা হ'ল। সে ঠিক করলে যে, কংগ্রেস দেশে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন যদি করে তো সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আন্দোলন প্রতিরোধ করবে। বিশেষ ক'রে মজদুর ক্ষেপিয়ে কংগ্রেসের লোক যুদ্ধের মালমশলা উৎপাদনে যাতে কোন রকমের বাধা দিতে না পারে, তারই জন্য মজদুরদের মধ্যেই বেশি ক'রে কাজ করবার একটা পরিকল্পনাও সে ঠিক ক'রে ফেললে। চ্যাটার্জি তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে যে, যে সময়টা সে নষ্ট করেছে তার ক্ষতিপূরণের জন্যই এখন কিছু দিন ডবল ক'রে খাটতে হবে তাকে। তার উপর হুকুম হ'ল সফরে বের হবার। অরুণাংশু অস্বীকার করতে পারলে না।

কিন্তু খবর শুনে অনামিকার মুখ ম্লান হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, ওঁরা চ'লে যেতে না যেতেই তোমার এই বেরিয়ে পড়াটা ভাল দেখায় না। কাছারিরও তো ছুটি নেই এখন। না গেলে হয় না?

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, না, অনু; ওরা কিছুতেই শুনলে না।

খবর শুনে প্রতুলবাবু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; তার পর শুধু বললেন, তা বেশ।

সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবার পর অরুণাংশু নিজের সফরের সম্পূর্ণ একটা তালিকা অনামিকার হাতে দিয়ে বললে, এটা কেন তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, জান? যেদিন যেখানে থাকব, সেখানেই তোমার চিঠি যাতে পাই, সেই জন্য। রোজ একখানা—বুঝলে?

অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, ব'য়ে গিয়েছে আমার চিঠি লিখতে। ও সব পারব না আমি।

কিন্তু তালিকাটা সে আগাগোড়া মন দিয়ে পড়লে। তার পর কাগজখানা ভাঁজ ক'রে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে বললে, তুমি যাবে তো পরশু সকালে। কাজেই কালকের দিনটা সব আমায় দিতে হবে।

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, বল তো?

অনামিকা হাসিমুখেই উত্তর দিলে, দিনের বেলায় 'ক্যাপিটালে'র বাকি অংশটুকু আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে; আর রাত্রে আমাদের এখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

অরুণাংশুর মুখখানা একবার উজ্জ্বল হয়েই পরক্ষণেই আবার ম্লান হয়ে গেল। মাথা নেড়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, তা তো হবে না, অনু,—কাল যে আমার অনেক কাজ!

অনামিকা কতকটা বিস্মিত, কতকটা আহতের মত বললে, কাল আবার কি কাজ পড়ল তোমার?

অরুণাংশু বললে, কাল রাত্রে আমাদের পার্টির মীটিং রয়েছে, আর দিনের বেলায় কলকাতায় থাকবই না আমি।

সে কি! কোথায় যাবে?

হুগলী।

হুগলী!—অনামিকা চমকে উঠে বললে। চোখ দুটি তার অকস্মাৎ যেন শাণিত তীরের ফলার মতই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অরুণাংশু বোধ করি সেটা লক্ষ্য করলে না, কথার টানেই সে ব'লে চলল,

হ্যাঁ, হুগলী। প্রবীরদা চাপ দিয়েছেন, বাইরে যাবার আগেই ও জায়গাটা এক বার ঘুরে আসতে হবে, অনেক দিন ওখানে যাওয়া হয় নি কিনা!

তার পর অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে; এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। নইলে—

থাক্।—অনামিকা বাধা দিয়ে বললে, কিচ্ছু তোমায় বদলাতে হবে না। কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। তা পারবে তো?

অরুণাংশু সবিস্ময়ে বললে, তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব? কোথায়?

কেন, হুগলী।

অ্যাঁ!

সত্যি।—অনামিকা মুচকি হেসে উত্তর দিলে, চল না নিয়ে, সুভদ্রা দেবীকে এক বার দেখে চোখ দুটিকে সার্থক ক'রে আসি।

দু-তিন সেকেণ্ড কাল অরুণাংশুর মুখে কোন কথাই ফুটল না; তার পর হঠাৎ সে শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললে, ও, সেই কথা! তোমার উপর সুভদ্রা দেবী যে যাদু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা এখনও কাটে নি দেখছি!

কিন্তু মন্তব্যটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই অনামিকা বললে, সত্যি বলছি, তাঁকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আমার। নিয়ে যদি যাও, বাবাকে ব'লে রাজী করাব আমি।

অরুণাংশু এবার হাসি থামিয়ে বললে, তোমায় নিয়ে যেতে পারলে আমার তো ষোল আনাই লাভ। কিন্তু যাকে তুমি দেখতে চাচ্ছ, সেই সুভদ্রা দেবী তো ওখানে নেই,—কি করবে গিয়ে?

নেই!—অনামিকা চমকে উঠে বললে, কোথায় গিয়েছেন তিনি?

অরুণাংশু উত্তর দিলে প্রায় মিনিটখানেক পর। অনামিকার দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যমনস্কের মত সে বললে, ঠিক বলতে পারি নে। এলাহাবাদ থেকে আসবার পর তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় নি। আমি ফিরবার আগেই উনি ওখানকার চাকরি ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন।

বল কি!—অনামিকা উত্তেজিত স্বরে বললে, এত দিন, কই, এ কথা তো বল নি আমায়!

অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, খবরটা আগেই আমি তোমায় বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, মানে, সাহস হয় নি।

সাহস হয় নি!—অনামিকা বিস্মিত হয়ে বললে, কেন?

অরুণাংশু আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল; তার পর সোজা হয়ে ব'সে বললে, আসল কথা কি জান, অনু? আমারই এক বন্ধু ও সহকর্মী সুবোধের কথাও তো তোমায় বলেছি, খুব ভাল কর্মী এবং আমারই এক বিশিষ্ট বন্ধু তিনি। কিন্তু ইদানীং তার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছিল না। দলাদলি যা হচ্ছিল, তাতে সুভদ্রা দেবী ওরই দিকে ভিড়ে পড়ছিলেন। অনেক আগে থেকেই, মানে, আমি হুগলীতে কাজ করতে যাবার আগে থেকেই ওঁরা দুজনে ওখানে একত্র কাজ করছিলেন। আমি এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে শুনলাম যে, ওঁরা দুজনেই ওখান থেকে চ'লে গিয়েছেন। হয়তো,—এক বার ঢোক গিলে অরুণাংশু কথাটাকে শেষ করলে,—এত দিনে তাদের বিয়েও হয়ে গিয়েছে।

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে অরুণাংশুই মুখখানা হাসবার মত ক'রে আবার বললে, সে দিন এলাহাবাদে এই সম্ভাবনার কথাটা তোমায় বলতেই যে রকম চ'টে গিয়েছিলে তুমি, তাতে সত্য খবরটা তোমায় শোনাবার সাহস আর আমার হয় নি,—মানে, ভয় হয়েছিল, পাছে তুমি মনে কর যে, আমি কোন অভিসন্ধি নিয়ে কথাটা তোমায় শোনাতে এসেছি।

দূর!—অনামিকা অল্প একটু লাল হয়ে উঠে উত্তর দিলে, তা কেন মনে করব! কিন্তু—। ব'লে বিব্রতের মত কিছুক্ষণ সে চুপ ক'রে রইল; তার পর হঠাৎ সোজা হয়ে ব'সে সে আবার বললে, থাক্ তবে, উনি যখন ওখানে নেই তখন আমি আর গিয়ে কি করব! তুমি একাই যাও।

অরুণাংশুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইদানীং অনেক দিন সুভদ্রার কথা তার মনে পড়ে নি। কিন্তু বৈকালের ছোট্ট ঘটনাটির উপলক্ষ্যে অতীতের সকল কথাই তার মনে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই এল একটা অনুশোচনার ভাব,—সুভদ্রাকে এমন ভাবে ভুলে যাওয়া, একেবারে তার কোন খোঁজ-খবর না নেওয়া উচিত হয় নি তার। অনেক রাত পর্যন্ত চোখে তার ঘুম এল না।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিকই ক'রে ফেললে যে, সুভদ্রা আর সুবোধের সন্ধান ক'রে এক দিন সে নিজে গিয়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আসবে, সম্ভব হ'লে তাদের দুজনকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে অনামিকার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবে।

পরদিন হুগলীতে গিয়ে অরুণাংশু যে খবর পেলে তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ওখানে আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন খাড়া হয়েছে; তার পাণ্ডা যে-সে লোক নয়, স্বয়ং সুবোধ। নিজে সে হুগলীতে ফিরে এসেছে, নূতন ইউনিয়নের সদস্য করেছে প্রায় হাজার খানেক; ছোট একটা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে কেতাদুরস্ত রকমে সেখানে একটা আপিস খুলে বসেছে; বিমলের ইউনিয়নের সঙ্গে সুবোধের ইউনিয়নের ঠোকাঠুকি চলছে হরদম; বিমল নিজেও একটু যেন ভয় পেয়ে গিয়েছে।

অরুণাংশু ঘাবড়ে গেল,—সুবোধ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন খাড়া করেছে সে জন্য ততটা নয়, তার সম্বন্ধে আর যে খবর সে পেলে সেই জন্য। সুবোধ হুগলীতে রয়েছে, অথচ সুভদ্রা এখানে নেই। সুবোধ তার চির কালের অভ্যাস মত যেখানে-সেখানে খায় আর ইউনিয়নের আপিস-ঘরে ঘুমায়। সে থাকে একা। মাঝে এক বার তার নাকি খুব শক্ত অসুখ করেছিল। সেই সময়ে কেউ কেউ নাকি সুভদ্রাকে এখানে দেখতে পেয়েছিল। তা ছাড়া সুভদ্রা আর কোন দিন এখানে আসে নি। কোথায় যে সে থাকে, তাও কেউ জানে না।

অরুণাংশুকে এ সব খবর দিলে বিমল। অরুণাংশু আর সুভদ্রার সম্বন্ধের শেষের ইতিহাসটা তার জানা ছিল না। কাজেই সঙ্কোচ কাটিয়ে সুভদ্রার যেটুকু খবর অরুণাংশুকে সে বললে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। অরুণাংশুও ওই রকম একটা সঙ্কোচের জন্যই সুভদ্রার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলে না,—বিমলকেও নয়, অন্য কাউকেও নয়। কিন্তু যেটুকু সে শুনলে তাতে তার তৃপ্তি হ'ল না। অবস্থাটা কেমন যেন খাপছাড়া মনে হ'ল তার। একটা সন্দেহও হ'ল—হয়তো বুঝতে তাদের সকলেরই ভুল হয়েছে, ঘটনার গতি হয়তো সরল রেখার গতিপথে অগ্রসর হচ্ছে না। সে ঠিক করলে যে, রহস্যটাকে ভেদ করবার জন্য খোদ সুবোধের সঙ্গেই দেখা ক'রে কথা বলতে হবে।

সুবোধের সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল। দুপুরে জনসভা ছিল। ইউনিয়নের সভাপতি আর প্রধান বক্তা হিসাবে সভায় খুব জোর গলায় বক্তৃতা দিলে সে; বেশ স্পষ্ট ক'রেই বললে, জাপানকে রুখতে হবে, রুশিয়াকে বাঁচাতে হবে, সমরপ্রচেষ্টায় কোন রকমেই বাধা দেওয়া চলবে না, কারখানার প্রত্যেকটি মজদুর এমনভাবে খাটবে যাতে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সব জিনিস তারা উৎপাদন করতে পারে। গান্ধীজীর 'কুইট-ইণ্ডিয়া' ধুয়ার তীব্র সমালোচনা ক'রে আসন্ন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে মজদুরকে সাবধান ক'রে দিলে সে; সুবোধ আর তার ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে সে অনেক কথাই ব'লে গেল।

সভা ভাঙবার পর ভীড থেকে বাইরে আসতেই সুবোধের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার পাশে তখন বিমল; সুবোধ একা। অরুণাংশুকে দেখেই সে তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তোমার বক্তৃতা বেশ মন দিয়েই শুনলাম, অরুণাংশু, কিন্তু এ সব কি বলছ তুমি? আমাকে আর আমার ইউনিয়নকে যত খুশি গাল দাও তুমি। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য জাতি যে সংগ্রামের আয়োজন করছে, তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

সভার উত্তেজনা তখনও মদের নেশার মত অরুণাংশুর মনটাকে মাতিয়ে রেখেছে; সে মুখ লাল ক'রে বললে, সংগ্রাম মাত্রই স্বাধীনতার সংগ্রাম হয় নাকি, সুবোধ?

না, তা হয় না।—সুবোধ অল্প একটু হেসে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, কিন্তু কংগ্রেস যে সংগ্রামের আয়োজন করছে, সে তো স্বাধীনতারই সংগ্রাম!

অরুণাংশু বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, এই—যার মূলমন্ত্র 'কুইট-ইণ্ডিয়া' সেই সংগ্রাম তো?

তথাপি সুবোধ হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলে, মূলমন্ত্রটির বিরুদ্ধেও তোমার আপত্তি আছে নাকি?

আলবৎ আছে।—অরুণাংশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, এত দিন কোথায় ছিল এ মন্ত্র আর কোথায় ছিলেন এ মন্ত্রের ঋষি? যুদ্ধ যত দিন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল, জাতি যখন স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, আমরা যখন 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' ব'লে তাঁর পায়ে ধ'রে সেধেছিলাম, তখন তাঁর মূলমন্ত্র ছিল ইংরেজকে বিব্রত না করা; আর যেই যুদ্ধের রূপ বদলাল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

হয়ে উঠল জনযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ত জাপান তার সমস্ত সশস্ত্র আয়োজন নিয়ে ভারতের পূর্বদ্বারে এসে ওত পেতে দাঁড়াল, তখন মন্ত্র হ'ল 'কুইট-ইণ্ডিয়া'। একে তুমি স্বাধীনতার মন্ত্র বল, সুবোধ, জাপানের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য ইংরেজ আর মিত্রশক্তির স'রে যাওয়ার এই নির্দেশকে? আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণের প্রাক্কালে দেশব্যাপী অরাজকতার এই উন্মত্ত আহ্বানকে? কিন্তু আমি একে মন্ত্র বলি নে—বলি বুলি, যে বুলি শোনা গিয়েছিল জয়চাঁদের মুখে, যে বুলি শোনা গিয়েছিল মীরজাফরের মুখে। তাই আমার আজকের কাজ সম্বন্ধে আমার মনে একটুও দ্বিধা নেই। আমি যা প্রতিরোধ করছি, তা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের আয়োজন নয়, তা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের হীন ষড়যন্ত্র।

শুনতে শুনতে সুবোধের মুখখানাও এবার লাল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটি কামড়ে ধ'রে নিজেকে সামলে নিলে সে; তার পর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তোমার মুখেও এমন কথা আমি শুনবার আশা করি নি, অরুণাংশু।

অরুণাংশুও এবার অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু পরের মুহূর্তেই আবার মুখ তুলে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে খপ ক'রে তার একখানা হাত চেপে ধরলে সে; কুণ্ঠিতের মত হেসে সে বললে, আমিও বলতে চাই নি, সুবোধ। তোমার সম্বন্ধে আমার নিজের কেমন একটা দুর্বলতা আছে। তোমার ইউনিয়ন আমি কেড়ে নিতে পারি, প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তোমার নীতি, তোমার মতের প্রতিবাদ করতে পারি; কিন্তু সামনাসামনি তোমার সঙ্গে এই ধরনের আলোচনা, তা আমি পারি নে। না, সুবোধ, আমাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য তোলা থাক্;—বাইরে আমরা বন্ধু।

কিন্তু সুবোধ নিজের হাতখানা টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে বললে, তা হয় না, অরুণাংশু।

খুব হয়।—অরুণাংশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, আমি কম্যুনিস্ট,—যারা বলে, যে আমাদের সঙ্গে নয় সে আমাদের বিপক্ষে, তাদেরই একজন আমি। তবু আমি যদি আমার বিরুদ্ধ দলের লোককে বন্ধু ভাবতে পারি, তুমি পারবে না?

সুবোধ উত্তর দিলে না। তথাপি একটু চুপ ক'রে থেকে অরুণাংশুই আবার বললে, রাজনীতি থাক্, সুবোধ,—তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে আমার; চল, আর কোথাও যাওয়া যাক।

বিমলের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, তুমি যাও, বিমল, আপিসেই থেকো,—আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসছি।

দুজনে একলা হতেই অরুণাংশু আবার সুবোধের হাত চেপে ধ'রে বললে, ব্যাপার কি, সুবোধ? তুমি এখানে একলা কেন? তোমার শরীরও তো শুনছি খুব ভাল নেই।

সুবোধ কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে উত্তর দিলে, শুনেছ ঠিকই। কিন্তু একলা না থেকে আর কি করব—জানই তো,—"বন্ধু যে যত, স্বপ্নের মত, বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ" !—আর, তা ছাড়া, চির কালই তো আমি একলাই থেকেছি।

চির কালের কথা ছাড়।—অরুণাংশু উত্তরে বললে, এখন ঠিক ক'রে বল তো—সুভদ্রা কোথায়?

সুবোধ চমকে উঠল। অরুণাংশুর প্রশ্নের গূঢ় অর্থটা হঠাৎ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের সকল কথাও তার মনে প'ড়ে গেল। এমন অভিভূত হয়ে পড়ল সে যে, কিছুক্ষণ মুখে তার কোন কথাই ফুটল না।

কিন্তু তাতেই যেন বেশ একটু কৌতুক অনুভব ক'রে অরুণাংশু সোজা সুজিই জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, সুভদ্রা কোথায়?

এবারও সুবোধ কোন উত্তর দিলে না; দেখে অরুণাংশুই আবার বললে, তাকে দূরে রেখেছ কেন?

এবার সুবোধ হেসে ফেললে,—ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ, কঠিন, হিংস্র সেই হাসি। নিজের হাতখানা অরুণাংশুর মুঠার ভিতর থেকে টেনে নিয়ে সে বললে, তোমার নিজেরই তো ভাল বোঝা উচিত্, অরুণাংশু, গোপন মিলনের অমৃত গন্ধই তো সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে এসেছে।

তা জানি।—অরুণাংশু হেসেই উত্তর দিলে; কিন্তু তার পর হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, জানি, ওতে লাভ অনেক; তবে এ কথাও বুঝেছি যে,

ওতে লোকসানও হয়। কোন্‌টা পরিমাণে বেশি, তা অবশ্য এখনও ঠিক্ করতে পারি নি, হিসাবটা খতিয়ে দেখবার সময় হয় নি এখনও।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মত চুপ ক'রে থাকবার পর সে হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে আবার বললে, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা এখন থাক্, সুবোধ। কাজের কথাটাই আগে বল—সুভদ্রা কোথায়?

এবার সুবোধের মুখের হাসি নিবে গেল; অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আচ্ছা, অরুণাংশু, জানি, দলাদলি করতে হ'লে প্রতিপক্ষীয়ের নিন্দাও করতে হয়। কিন্তু এই যে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটনা করা, এও কি দলাদলি-শিল্পের নিতান্তই অপরিহার্য একটা পদ্ধতি?

কথা এবং ওর সুর—দুটিই অরুণাংশুর কাছে এমনি অপ্রত্যাশিত যে, শুনে চমকেই উঠল সে; উত্তরে একটি কথাও তার মুখে ফুটল না।

সুবোধই আবার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, অরুণাংশু, আমাদের সম্বন্ধে যে সব কথা এখানে রটেছে, তা বিশ্বাস করেছ তুমি?

অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি তো এখানে ছিলাম না, সুবোধ। সেই মাস-দুয়েক আগে এক দিন এখানে এসেছিলাম, তার পর এই আজ। কেবল গুজব ছাড়া আর কিছুই তো শুনি নি আমি।

সুবোধ বললে, সেই গুজবের কথাই তো বলছি। আমার নামে যে কুৎসা এখানে রটনা করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করেছ তুমি?

কুৎসা!—ব'লে অরুণাংশু চমকে মুখ তুলে তাকাল,—কে কি কুৎসা রটিয়েছে, সুবোধ?

সুবোধ বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে। আমার আর সুভদ্রা দেবীর নাম একত্র মিলিয়ে যা এখানে রটনা করা হয়েছে, তা শোন নি তুমি?

কিন্তু সে তো কুৎসা নয়!—অরুণাংশু প্রতিবাদের স্বরে বললে, ও যদি কুৎসা হয়, তা হ'লে আমার আর সুভদ্রার নাম একত্র মিলিয়ে আগেও তো কুৎসাই রটেছিল বলতে হবে।

দু-তিন সেকেণ্ড কাল সুবোধের মুখে কোন কথাই ফুটল না; তার পর

সেই আগের মত অদ্ভুত হাসি হেসে সে বললে, থাক্ থাক্, অরুণাংশু, আমার পোড়া ঘায়ে মলম আর লাগাতে হবে না তোমায়। সোজাসুজি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তো,—কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছ?

উত্তর না দিয়ে অরুণাংশু পাল্‌টা প্রশ্ন করলে, কথাটা কি তা হ'লে সত্য নয়?

সুবোধ উত্তর দিলে না; একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে হঠাৎ অরুণাংশুর কাছ থেকে অনেকটা দূরে স'রে গেল।

অরুণাংশু ব্যাকুল স্বরে বললে, কি সুবোধ, কথা বলছ না কেন?

সুবোধ এবার বললে, কারণ আমার বলবার কিছু নেই।

অরুণাংশু এগিয়ে গিয়ে সুবোধের হাত চেপে ধরলে; কাতর স্বরে বললে, আমার মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, সুবোধ! কথাটা কি তা হ'লে একেবারেই সত্য নয়? আর না যদি হয়, তবে তোমরা দুজনে হঠাৎ এখান থেকে অমন ক'রে চ'লে গেলে কেন?

উত্তর দিবার আগে সুবোধ জোর ক' নিজের হাতখানা ছড়িয়ে নিলে; বললে, তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলতে পারব না, অরুণাংশু।

অরুণাংশু বিহ্বল স্বরে বললে, কেন?

সুভদ্রা দেবীর নিষেধ আছে।—সুবোধ উত্তরে বললে।

অরুণাংশুর মুখ এবার একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পব সে সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ, কিছু না বললে তুমি। কিন্তু তার ঠিকানাটা আমায় দাও।

সুবোধ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, না তা-ও দিতে পারব না।

অরুণাংশু চমকে উঠে বললে, ঠিকানা জান না তুমি?

সুবোধ মৃদু স্বরে বললে, জানি।

তবে? তবে সেটা বলতে পারবে না কেন?

একটু চুপ ক'রে রইল সুবোধ; তার পর অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বললে, ঠিকানা দিতেও সুভদ্রা দেবীর নিষেধ আছে। তা অমান্য করবার জন্য তুমি আমায় পীড়াপীড়ি ক'রো না। আচ্ছা—বাই বাই!

অরুণাংশু বিহ্বল হয়ে পড়ল। মাস-দুই আগে এই হুগলী থেকেই

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে তার মনে হয়েছিল যে, তার বুকের উপর থেকে মস্ত ভারী একটা বোঝা নেমে গিয়েছে। কিন্তু আজ সেই পথ দিয়েই স্টেশনে যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল যে, সেই বোঝাটাই যেন দ্বিগুণ, ভারী হয়ে আবার তার বুকের উপর চেপে বসেছে। বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জ'মে উঠছিল; সে গাড়িতে গিয়ে বসতেই চেপে জল এল; দিন থাকতেই দিনের আলো গেল নিবে। প্রায়ান্ধকার গাড়ির মধ্যে ব'সে অরুণাংশুর মনে হতে লাগল যে, দুই মাস আগে মুক্তির আনন্দ আর পাওয়ার আশায় যে আলো তার মনের মধ্যে অমন উজ্জ্বল হয়ে জ্ব'লে উঠেছিল, তা আজকের দিনের আলোকের মতই অকালে নিবে গিয়েছে; রূপ আর রসের যে বিচিত্র কল্পলোক সে দিন সকালেও অত সুস্পষ্ট ইশারায় বার বার তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, তা এখন আব একেবারেই চোখে পড়ে না; এমন কি, তার চলার পথটাও হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

রাত্রে পার্টির সভায় সে এক রকম বোবা হয়েই ব'সে রইল। তার অন্যমনস্কতা সকলের চোখেই ধরা প'ড়ে গেল। দু-এক জন উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে তার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে। শরীব ভাল আছে শুনে কমরেড চ্যাটার্জির মত গম্ভীর লোকও টিপ্পনি কেটে বললে, তোমার শরীরের আর সব ভাল থাকলেও স্নায়ুগুলোর অবস্থা ভাল নেই, অরুণাংশু। আমার মতে কোর্টশিপটাকে সংক্ষেপ ক'রে বিয়েটা তোমার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা উচিত।

উত্তরে অরুণাংশু কি যে বললে, তা কেউ শুনতেই পেলে না। আগের মত সহজ ভাবে পরিহাসে যোগ দিতে পারলে না সে।

বাসার কাছে ট্রাম থেকে নেমে প্রতুলবাবুর বাড়ির দিকে সে চেয়ে দেখলে, সে বাড়িতে তখনও অনেক ঘরেই আলো জ্বলছে। কিন্তু সে দিকে একবার পা বাড়িয়েও নিজেকে সামলে নিলে সে।

পরদিনও অনামিকাব সঙ্গে দেখা না ক'রেই সে সফরে বের হয়ে গেল। চাকবের কাছে রেখে গেল শুধু অনামিকার নামে দু ছত্রের একখানা চিঠি।

সে দিন সারাটা দিনই অনামিকা উন্মনা হয়ে রইল। কোন কাজেই সে মনোযোগ দিতে পারলে না; থেকে থেকেই তার মনে হতে লাগল যে,

অরুণাংশু আজ আর কলকাতায় নেই ; বাড়িটাই তার মনে হতে লাগল যেন খালি হয়ে গিয়েছে।

অরুণাংশু তাদের বাড়িতে খুব যে বেশি আসত তা নয়। অনেক দিন নিমন্ত্রণ করলেও সে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করত। তবু প্রায়ই সে আসত, কোন দিন খেতে, কোন দিন গল্প করতে ; শেষের দিকে অনামিকাকে 'ক্যাপিটাল' পড়াবার জন্য। তার আসার নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না ব'লেই অনামিকা সব সময়েই তার আসার প্রতীক্ষা করত। সেই প্রতীক্ষার অবসান হওয়াতেই বাড়িটাও যেন অনামিকার কাছে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

অরুণাংশু যে তার ভিতরে ও বাইরে এতখানি জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে, এ সংবাদ এত দিন অনামিকার নিজের জানা ছিল না। আজ সেটা বুঝতে পেরে নিজের কাছেও তার নিজের যেন লজ্জা করতে লাগল। পাছে বাপের চোখেও তার অসাধারণ অবস্থাটা ধরা প'ড়ে যায়, এই ভয়ে প্রতুলবাবু কোর্ট থেকে ফিরে আসতেই সে একটু অতিরিক্ত আবদারের স্বরেই বললে, চল, বাবা, আজ সিনেমা দেখে আসি।

সে কি, অনু!—প্রতুলবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, সিনেমা দেখলে তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে না ?

যাও।—অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, অমন যদি কর তো আমি আড়ি করব। সোজাসুজি বল না কেন যে, তোমার যাবার ইচ্ছে নেই।

প্রতুলবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, না, না, তা কেন বলব আমি! আমি শুধু বলছিলাম—

বলতে বলতে তিনি চুপ ক'রে গেলেন ; তার পর হেসে ফেলে আবার বললেন, চল যাই। কিন্তু কাপড়খানা বদলে নাও, মা, আর খান-দুই গয়না—

আচ্ছা, আচ্ছা।—অনামিকা আরও একটু লাল হয়ে উঠে বললে, সে আমি দেখব 'খন। তুমি গাড়িখানা ঠিক করতে বল তো আগে।

ফিরে এসেও অনেক রাত পর্যন্ত সে তার বাপের সঙ্গে ওই সিনেমার গল্পই করলে।

কিন্তু পরদিন প্রতুলবাবু কোর্টে চ'লে যাবার পর বাড়িখানা আবার তার

কাছে খালি হয়ে গেল। এ রকম অনুভূতি তার একেবারেই নূতন। কলেজ ছাড়বার পর অধিকাংশ দিনই দুপুরবেলাটা সে খালি বাড়িতে একা একা কাটিয়েছে। দিনের বেলায় ঘুমাবার অভ্যাস তার নেই। রোজই সে হয় বই প'ড়ে, নয় ছবি এঁকে, নয়তো সেলাই নিয়ে এমন মেতে ওঠে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন ক'রে যে কেটে যায় সে তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু আগের দিনের মতই সে দিনও দুপুরে কোন কাজেই তার মন বসল না, এক-একটা মিনিট তার মনে হতে লাগল যেন এক একটা ঘণ্টার মত দীর্ঘ।

বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে সে দিন সে ঘুমাবার চেষ্টা করলে। অনুকূল অবস্থার অভাব যে ছিল, তা নয়। রাজপথের কোলাহল তখন বন্ধ; যেটুকু আছে তারও ঘরে আসবার পথ নেই। বাড়িখানি নিস্তব্ধ, নিঝুম। মাথার উপর হু-হু ক'রে পাখা চলছে, তার একটানা আওয়াজে ঘুমপাড়ানী গানের সুর।

তথাপি অনামিকার চোখে ঘুম এল না। অরুণাংশুর কথাই বার বার তার মনে উঠতে লাগল; কোথায় এখন সে আছে, কি করছে, এই সব চিন্তা আর কল্পনা। ঘণ্টাখানেক ছটফট করবার পর বিছানা ছেড়ে উঠে অরুণাংশুর দেওয়া সেই সফরের তালিকাটাকে সে খুঁজে বের করলে; আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু-ছত্রের সেই চিঠিখানাও। দুখানা কাগজই হাতে নিয়ে সে তার লেখবার টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই নীচে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আওয়াজটা তাদেরই বাড়ির গাড়ির আওয়াজের মত। অনামিকা চমকে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল, সবে তখন তিনটা বেজেছে। এত সকালে তাদের গাড়ি কেন বাড়িতে ফিরে আসবে তা সে বুঝতে পারলে না। ভাবলে, শুনতে তার ভুল হয়েছে। কিন্তু তখনই আবার শব্দ শোনা গেল, এবার গাড়ি থামবার শব্দ। অনামিকা বিস্মিত হয়ে জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকাল।

ঠিক তাদের গাড়ি, দাঁড়িয়েছে গাড়িবারান্দার নীচে; দরজা খোলা, পাশেই জন তিনেক লোক, এক জন তার চেনা, তার বাপেরই এক উকিল বন্ধু। অনামিকা তার নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলে না, ওই কজন

লোক ধরাধরি ক'রে কার যেন একটা অসাড় দেহ গাড়ির ভিতর থেকে নীচে নামাচ্ছে। আর একটু ঝুঁকে সেই জড় দেহটির দিকে তাকিয়েই হঠাৎ সে 'বাবা' ব'লে কেঁদে উঠল। তার পরেই পাগলের মত ছুটে নীচে নেমে গেল সে।

সত্যই প্রতুলবাবু। এজলাসে বক্তৃতা করতে করতে হঠাৎ তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুরা ছুটে এসে ধরাধরি ক'রে তাকে লাইব্রেরি-ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, খবর দিয়ে ডাক্তারও এনেছিলেন এক জন। ওই সময়ে আর ওই অবস্থায় যা চিকিৎসা সম্ভব, তার ত্রুটি হয় নি। কিন্তু চৈতন্য তাতে ফিরে আসে নি। বন্ধুরা পরামর্শ ক'রে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে এক জন ডাক্তারও এসেছেন। তিনিই অনামিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই; হৃদ্‌যন্ত্রটা হঠাৎ বিগড়ে গিয়েছে, সেটা ঠিক হ'লেই রোগী ভাল হয়ে উঠবে।

ডাক্তার বোসের কাছে তখনই খবর গেল। আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব রকম সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনিও এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রোগীকে পরীক্ষা করবার পর তাঁর মুখখানা অতিরিক্ত রকমে গম্ভীর হয়ে উঠল। অনামিকা এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু ডাক্তার বোসের চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই সে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে বললে, কি হবে জ্যেঠামশায় ?

ও কি!—ডাঃ. বোস অসহিষ্ণুর মত উত্তর দিলেন, তুমি এত অধৈর্য হ'লে তো চলবে না, অনু; তোমাকে শক্ত হতে হবে। কান্না থামাও, চোখ মোছ আগে। হ্যাঁ, এখন চল আমার সঙ্গে ও ঘরে। এখানে এঁরা যে কজন আছেন তা-ই যথেষ্ট।

পাশের ঘরে গিয়ে অনামিকাকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, অনু।

অনামিকার চোখে আবার জল উথলে উঠছিল, কিন্তু তা সে চোখের মধ্যেই চেপে রেখে গাঢ় স্বরে বললে, কিন্তু জ্ঞান যে এখনও হ'ল না।

ডাক্তার বোস তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, হবে, হবে, আমি আশা করছি যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু আমার কথাগুলি তুমি শান্ত হয়ে শোন তো, এ বাড়িতে তুমি অধৈর্য হ'লে চলবে কেমন ক'রে ?

তার পর গম্ভীর স্বরে তিনি আবার বললেন, রোগটা তো তোমার বাবার নতুন নয়, তবে এবারের আক্রমণের জোরটা হয়েছে বেশি। তা হ'লেও চিকিৎসার চেয়েও রোগীর শুশ্রূষার প্রয়োজনই বেশি। কিন্তু সেটা তো একা তোমার দ্বারা হবে না, মা।

সে কি, জ্যেঠামশায়!—অনামিকা বিস্মিত, ঈষৎ যেন বিরক্ত হয়েই বললে, বাবার শুশ্রূষা চির কালই তো আমিই ক'রে এসেছি।

ডাক্তার বোস অল্প একটু হেসে বললেন, এবারের আক্রমণটা একটু অন্য রকমের; ব্যবস্থাটাও সেই জন্য অন্য রকমের হওয়া দরকার। আমার স্ত্রীকে আমি বরং এখনই আসতে ব'লে দিচ্ছি। আর তা ছাড়াও— বলতে বলতে চুপ ক'রে গেলেন তিনি; একটু পরে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, আচ্ছা, অনু, একটি ভাল শিক্ষিতা নার্স যদি ডেকে দিই, তোমার আপত্তি আছে কিছু?

অনামিকা উৎফুল্ল হয়ে বললে, তা কেন থাকবে, জ্যেঠামশায়? সে তো খুব ভাল হবে।

আচ্ছা, দেখছি ফোন ক'রে।—ডাক্তার বোস উত্তরে বললেন, তুমি এখন ও ঘরে যাও। কিন্তু সাবধান, কান্নাকাটি ক'রো না যেন।

আধ ঘণ্টাখানেক পর আবার তিনি অনামিকাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, নার্স একটি পেয়েছি, অনু; বেশ ভাল মেয়েই পেয়েছি; দেখলেই তোমায় মানতে হবে, একেবারে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। তবে বাইরে মেয়েটি একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির; তার জন্য আলাদা একটি ঘর আর আলাদা স্নানের ঘর চাই, নইলে কিছুতেই সে দিনরাত এখানে থাকতে রাজি হচ্ছিল না। তা কথা আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি, তোমাদের বাড়িতে তো ও-সবের অভাব নেই, তুমি ঝিকে একটা ঘর ঠিক করতে ব'লে দাও। সেও বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে যাবে।

সুভদ্রা এসেছিল সন্ধ্যার একটু আগে। পরিচয়ের সময়ে ডাক্তার বোসের মুখে তার নাম শুনেই অনামিকা চমকে উঠেছিল। কিন্তু তখনও প্রতুলবাবুর জ্ঞান হয় নি, এক তাঁর কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ভাববার সময় অনামিকার ছিল না, কোন রকম অনুসন্ধান করবার সময় বা প্রবৃত্তি তো মোটেই নয়।

সুভদ্রার সঙ্গে দু-একটি কথা বলবার পরেই সে ফিরে গিয়ে বাপের শিয়রে বসেছিল ; সুভদ্রাও লেগে গিয়েছিল তার নিজের কাজে।

সে কাজের ভিতর দিয়ে অনামিকা সুভদ্রার যে পরিচয় পাচ্ছিল, তাতে সে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারে নি। মনে মনে মানতে হয়েছিল তাকে যে, ডাক্তার বোস নার্সের গুণপনার কথা বাড়িয়ে বলেন নি। সত্যই অনবদ্য তার সেবা, অসাধারণ তার কর্মকুশলতা। ক্লান্তি নেই, বিরক্তিও নেই। সাধারণত সে অসাধারণ রকমের গম্ভীর। কিন্তু রোগীর সামনে গেলেই সে যেন আর এক মানুষ, সেখানে মুখে তার হাসি লেগেই আছে। কোমলে আর কঠিনে মিশিয়ে তার যে ব্যক্তিত্ব, তার প্রকাশ সূর্যের আলোর মত, আকর্ষণ চুম্বকের আকর্ষণের মতই অপ্রতিরোধ্য। ডাক্তারের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে নিজে পালন করে, রোগীকে দিয়েও পালন করিয়ে নেয়। অথচ জোর বা জবরদস্তির প্রয়োগ তাকে করতে হয় না। অনামিকা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, এ বাড়ির দাসদাসীরাও যেন ওই মেয়েটির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়ছে, যেন সে-ই বাড়ির গৃহিণী, যেন চির দিনই এ বাড়িতে সে কর্তৃত্ব ক'রে এসেছে।

প্রতুলবাবুর সঙ্কটের অবস্থাটা সেই রাত্রেই কেটে গিয়েছিল। মানসিক উদ্বেগের অবসান হবার পর মনোযোগ দিয়ে সুভদ্রাকে দেখবার অবসর পেয়ে অনামিকা ক্রমেই মুগ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। পরিশ্রমে তার ক্লান্তি নেই, তার শরীরটা যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া। দিনরাতের মধ্যে ঘণ্টাতিনেকের বেশি তার ঘুমাবার দরকার হয় না ; বাকি সময়টার অধিকাংশই সে রোগীর ঘরে কাটায়। সে খায় এক রকম না খাওয়ার মত, অনামিকা অনুরোধ করলে এমন ভাবে সে মুখ তুলে তার মুখের দিকে চায় যে, লজ্জা ও কুণ্ঠায় অনামিকার নিজের মাথাটাই নত হয়ে পড়ে। রোগীর সেবায় তার দক্ষতা দেখে অনামিকার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ডাক্তার বোস রোগীর জন্য পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন, কোন রকম নড়াচড়া নয়, মুখের কোন কথা পর্যন্ত নয়। সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে, রোগীর শক্তির বিন্দুমাত্রও অপচয় না করিয়ে এতই সহজ কৌশলের সঙ্গে সুভদ্রা তার নাওয়া-খাওয়ার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে লাগল যে, দেখে অনামিকার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। পরের দিন সুভদ্রার নিপুণ হাতের সুষ্ঠু পরিচর্যা দেখতে দেখতে এক সময়ে আর

থাকতে না পেরে অনামিকা ব'লেই ফেললে, কি চমৎকার, সুভদ্রা দেবী! আমি তো এমন পারি নে!

সুভদ্রা প্রথমে চমকে উঠল; কিন্তু পরে লজ্জিতভাবে মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আপনার পারবার কথাও তো নয়, আমি যে অনেক দিন ধ'রে এ কাজ শিখেছি।

অনামিকা ক্ষোভের স্বরে বললে, আমারও এ কাজ শেখা উচিত ছিল। কি কোমল আপনার হাত, আর কি সুষ্ঠু আপনার কাজ!

কি যে বলেন, ও তো কেবল অভ্যাস!—সুভদ্রা আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে।

একটু চুপ ক'রে থেকে নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে অনামিকা আবার বললে, আমি বাবার কিছুই করতে পারলাম না। বুকে একটু মালিশ করা, তা-ও আমি পারি নে, হাত কেঁপে যায়, বাবার লাগে। অথচ আমি তার মেয়ে।

সুভদ্রা সান্ত্বনার স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপনি মেয়ে ব'লেই পারেন না, আপনার মনটা বড্ড উতলা হয়েছে কিনা—তাই হাত আপনার কেঁপে যায়। আমি কাজ করি চলতি একটা যন্ত্রের মত, আমার তো মনের বালাই নেই!

না, সুভদ্রা দেবী।—অনামিকা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ও কথা আমি বিশ্বাস করি নে। দরদ না থাকলে কেউ কি আপনার মত এমন কাজ করতে পারে!

কি যে বলেন!—ব'লে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে যে প্রশ্নটা অনামিকার মনে জেগে উঠেছিল, সেটাই আবার মাথা তুলে খাড়া হয়ে উঠল, এই কি সেই সুভদ্রা দেবী?

এ দুদিন প্রায়ই এই প্রশ্নটা তার মনে উঠেছে, কিন্তু সংশয় দূর হয় নি। কল্পনার তুলি দিয়ে সুভদ্রার যে মূর্তি সে তার মনের পটে এঁকে রেখেছিল, তার সঙ্গে রক্তমাংসের এই সুভদ্রার যেন মিল নেই, অসাধারণ হ'লেও এ মেয়েটি অত অনন্যসাধারণ যেন নয় যাতে অরুণাংশুর মত পুরুষকে সে জয় করতে পারে। এ মেয়েটির রূপ নেই। এর রঙ কালো, গঠন শ্রীহীন,—একে কুৎসিত বললেও যেন এর নিন্দা করা হয় না। অথচ নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে এ যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন। এ কাপড় পরে ঘাঘরা

উৎফুল্ল স্বরে বললেন, এস, অনু, এস, আমার কাছে এসে ব'স। আর তুমিও এস তো, মা, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি। ও কি, অত দূরে কেন? কাছে এস—এই, এই খানে।

দুজনেই বসল। সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু ঈষৎ একটু উদ্বেগের স্বরেই বললেন, তোমার মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে। এ কদিন তোমার বড্ড খাটুনি গিয়েছে, না, মা?

তা আর বলতে!—অনামিকাই তার বাপের মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, প্রথম রাতে উনি তো একেবারেই ঘুমোন নি। তার পরেও দিনরাতই উনি খাটছেন! একটু থেমে লজ্জিতের মত মুখ নামিয়ে অনামিকা আবার বললে, সত্যি, বাবা, উনি না এলে কি যে হ'ত, ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। এমন সেবা করবার সাধ্য আমার হ'ত না।

প্রতুলবাবু গদগদ স্বরে উত্তর দিলেন, যা বলেছ, মা। চোখ বুজে অসাড়ের মত বিছানায় প'ড়ে ছিলাম, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, স্বর্গ থেকে আমার মা'ই বুঝি নেমে এসে আবার আমার মাথার কাছে বসেছেন।

সুভদ্রা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, ও কি, মিঃ গুপ্ত, অত কথা কেন বলছেন আবার?

প্রতুলবাবু হেসে ফেলে বললেন, না, মা, আধ ঘণ্টা তো তোমার হুকুম মেনে চুপ ক'রে ছিলাম, এখন একটু কথা বলতে দাও। তোমার নামটা যেন কি?

সুভদ্রা মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে, সুভদ্রা।

বেশ নাম।—প্রতুলবাবু স্মিত মুখে বললেন, মানুষের সঙ্গে নামটি বেমালুম মিলে গিয়েছে। যে মেয়ে সারথি হয়ে অর্জুনের রথ চালাতে পেরেছিল, তুমি তারই মত বটে।

একটু থেমে আড়চোখে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, সে কালের এই নামগুলি এত ভাল লাগে আমার যে, মাঝে মাঝে আমার দুঃখ হয়, কেন আমার অনুর এই রকম একটা নাম রাখলাম না!

সুভদ্রা হাসিমুখে অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কেন, ওঁর নামও তো বেশ।

নাম কোথায়, সুভদ্রা?—প্রতুলবাবু স্বর চড়িয়ে উত্তর দিলেন, ওর তো নাম নেই!

সুভদ্রার মুখের বিহ্বল ভাবটা লক্ষ্য ক'রে তিনি কৌতুকের স্বরে আবার বললেন, অনুর নামকরণের একটা ইতিহাস আছে। শোন তবে—তোমায় বলছি।

আঃ!—অনামিকা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, কি যা-তা বলছ, বাবা!

কিন্তু তার প্রতিবাদটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই প্রতুলবাবু ব'লে চললেন, সে একটা হাসির কথা, সুভদ্রা। আমি যত নাম বলি, তার একটাও ওর মায়ের পছন্দ হয় না। আর তিনি যে নাম বলেন তা আমার অপছন্দ। শেষে চ'টে গিয়ে আমি বললাম, থাক্, ওর নামকরণেরই দরকার নেই। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, তাই ভাল, ও আমাদের অনামিকা। সেই থেকেই অনামিকাই ওর নাম হয়ে গেল।

অনামিকার আনত, আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, বেশ নাম, যেমন অসাধারণ, তেমনি মিষ্টি।

সুভদ্রাকে কিছু বলতে না পেরে অনামিকা প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়েই আবার রাগের ভাণ ক'রে বললে, তুমি থামবে কি না বল। নইলে আমি এক্ষুনি উঠে যাব।

আচ্ছা, আচ্ছা।—প্রতুলবাবু স্মিত মুখে বললেন, থাক্ এখন তোমার কথা। সুভদ্রার কথাই আগে শুনি। বল তো মা, কোথায় থাক তুমি? এই কলকাতাতেই বুঝি তোমাদের বাড়ি?

সুভদ্রা মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, না, আমি মেসে থাকি।

প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, মেসে?

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে কোমল স্বরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোমার বাড়ি কোথায়, মা? তোমার আপনার জন, তোমার পিতামাতা যেখানে থাকেন?

সুভদ্রার মুখখানা নীচের দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ল; অস্ফুট স্বরে সে উত্তর দিলে, আমার বাপ-মা নেই।

অঁ্যা!—প্রতুলবাবু আবার চমকে উঠলেন। তাঁর রোগশীর্ণ বিবর্ণ মুখখানি

আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সুভদ্রার একখানা হাত নিজের কোলের উপর টেনে এনে ব্যাকুল স্বরে তিনি আবার বললেন, তোমার মা-বাপ নেই? এ যে— তা আমায় সব কথা খুলে বল তো, মা, পর মনে ক'রো না আমায়। ওঁরা কত দিন গত হয়েছেন?

প্রতুলবাবুর মুঠার মধ্যে সুভদ্রার হাতখানি কেঁপে উঠল। সেটা অনুভব ক'রে প্রতুলবাবু আবার বললেন, বল, মা, তোমার মাকে কবে হারিয়েছ তুমি?

সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে, মাকে আমি দেখি নি। শুনেছি যে, আমাকে জন্ম দিয়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

কি সর্বনাশ! আর তোমার বাবা?

তাঁকেও আমার মনে নেই, তিনি মারা যান যখন আমার বয়স চার-পাঁচ বছর।

তার পর?

তার পর প্রতিবেশীরা আমায় আর্য সমাজের এক আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি।

এর পর কিছুক্ষণ প্রতুলবাবুর মুখে আর যেন কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু কুণ্ঠিতা সুভদ্রা আলগোছে তার নিজের হাতখানা টেনে নিতেই তিনি সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে আবার বললেন, কিন্তু তোমার বিয়ে? ।বয়েও তো তোমার হয় নি মনে হচ্ছে।

এবার সুভদ্রা আর মুখে কোন উত্তর দিলে না, শুধু মাথাটা একটু নেড়েই সে বুঝিয়ে দিলে যে, বিয়ে তার হয় নি। তার পরেই উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আমি আসছি।—ব'লেই তৎক্ষণাৎ সে বের হয়ে গেল।

অনামিকা এতক্ষণ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুভদ্রা চ'লে যেতেই সে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললে, তোমার কি একেবারেই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাবা?

প্রতুলবাবু বিব্রত ভাবে বললেন, কেন মা?

ছিঃ ছিঃ!—অনামিকা ভুরু কুঁচকে বললে, অজানা, অচেনা ভদ্রমহিলা, আমাদের সঙ্গে দুদিনের মাত্র পরিচয়। অথচ তারই ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তুমি কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে!

তিরস্কারটা প্রতুলবাবু গায়েই মাখলেন না। গভীর সমবেদনার স্বরে তিনি বললেন, আহা, মেয়েটি বড় দুঃখী!

হোক দুঃখী।—অনামিকা ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে, দুঃখী ব'লেই তো তার দুঃখের কথা নিয়ে তাকে জেরা করা তোমার উচিত হয় নি। ছিঃ ছিঃ! ভদ্রমহিলা তাঁর দুঃখের মধ্যেও কি লজ্জাই না আজ পেয়েছেন!

প্রতুলবাবু এবার অপরাধীর মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আচ্ছা, মা, আর বলব না। তুমি যাও তো, তাকে ডেকে নিয়ে এস।

পরের দিন ডাক্তার বোস এলেন দুপুরের পর। রোগীকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করবার পর হাসিমুখে বললেন, যাক্, তুমি সেরে উঠেছ, প্রতুল। দু-চার দিনের মধ্যেই হাঁটা-চলা করতে পারবে আশা করি।

তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।—প্রতুলবাবুও হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, শুয়ে শুয়ে গায়ে আমার ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, শুনলে তো ডাক্তারের কথা? এবার আমায় তুলে বসিয়ে দাও তো, সমেরুদণ্ডীর মত চারদিকটা এক বার তাকিয়ে দেখি।

পর পর কয়েকটি বালিশ সাজিয়ে নিরাপদ একটা দুর্গের মত ক'রে ওরই মাঝখানে প্রতুলবাবুকে বসিয়ে দিলে সুভদ্রা। তার পর ডাক্তার বোসের কাছে গিয়ে সে বললে, সার্, আমি ফিরে যেতে চাই।

কথাটা কানে যেতেই প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, কি বলছ, সুভদ্রা?

সুভদ্রা তার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমি আজ যেতে চাই মিঃ গুপ্ত, আপনার শরীর তো এখন বেশ ভাল হয়ে গিয়েছে।

অসম্ভব! প্রতুলবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, কে বললে ভাল হয়ে গিয়েছে?—কি হে ডাক্তার, ও অনু, সুভদ্রা বলে কি? আমার শরীর নাকি ভাল হয়ে গিয়েছে?

অনামিকা হাসিমুখে উত্তর দিলে, হ্যাঁ, বাবা, আজ তোমার মুখের দিকে চাইলে তোমায় রোগী ব'লে আর মনেই হয় না।

না।—প্রতুলবাবু আগের মত উত্তেজিত স্বরেই বললেন, তোমরা কিছু জান না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার অসুখ এখনও সারে নি। আর সারলেও তুমি এখন যেতে পাবে না, সুভদ্রা,—না, কিছুতেই না।

ডাক্তার বোস সহাস্যমুখে একবার সুভদ্রা ও একবার প্রতুলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলেন ; এবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আজ থাক্, সুভদ্রা, ওর যখন এত আপত্তি তখন আর দু-এক দিন পরেই যেয়ো তুমি।

ওই কথাটাই চলল ডাক্তার বোস চ'লে যাবার পরেও। সুভদ্রার মনের ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে না পেরেই যেন প্রতুলবাবু তার হাতখানি সাগ্রহে নিজের কোলের উপর টেনে এনে গলার স্বরটাকে একেবারে বদলে দিয়ে বললেন, আমার রোগের কথাটাই বার বার তুমি বলছ কেন, সুভদ্রা ? আমার রোগ যদিও বা সারে, জরা তো আমায় ছাড়বে না। পণ্ডিতেরা বার্ধক্যকে বলেছেন দ্বিতীয় শৈশব। এ বয়সে শিশুর মতই আমার এক জন মায়ের দরকার আছে যে! তুমি চ'লে গেলে আমার সে প্রয়োজন কে মেটাবে, বল তো, মা ?

আড়চোখে অনামিকার মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ও কথা কেন বলছেন, মিঃ গুপ্ত ? অনামিকা দেবী থাকতে আপনার আবার ভাবনা কিসের ?

অনামিকা মুচকি হেসে বললে, আপনি জানেন না বুঝি, সুভদ্রা দেবী ? আমায় নিয়ে বাবার যে আর মন উঠছে না !

প্রতুলবাবু শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতেই বললেন, আমার নামে নালিশ করছ তুমি, অনু ? তবে আমিও তোমায় ছাড়ব না। শোন তবে, সুভদ্রা। অনুর উপর এখন আর আমি ভরসা করতে পারছি নে,—ও যে এখন যাওয়ার পথে !

অনামিকা লাল হয়ে উঠে বললে, আঃ, আবার কি বলছ তুমি, বাবা !

প্রতিবাদটাকে একেবারেই উপেক্ষা ক'রে বিস্মিতা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে প্রতুলবাবু হাসতে হাসতেই আবার বললেন, তোমায় তো বলা হয় নি এখনও, অনুর যে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সাধে কি আর ওর আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি !

অনামিকা এবার আর প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু তার মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। স্মিত মুখে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে শীগগিরই হবে বুঝি?

'হবে' কি বলছ!—প্রতুলবাবু উত্তরে বললেন, বল 'হয়েই গিয়েছে'। সব ঠিক, কেবল দিনক্ষণের গোলমালের জন্যই যা দেরি।

একটু থেমে, এক বার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি আবার বললেন, তাই তো বলি, মেয়ে আমার পর হয়ে যাবে। আর যাবে কি বলছি, পর হয়েই গিয়েছে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, ওর মনের মধ্যে আমার স্থান আর নেই, সবটুকু জায়গাই অধিকার ক'রে নিয়েছে সেই আমার ভাবী বাবাজীবন।

আঃ, বাবা!—অনামিকা মুখ তুলে বললে; ব'লেই আবার মুখ নামিয়ে নিলে সে।

হাসি-ভরা চোখে সুভদ্রা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতুলবাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, না, মিঃ গুপ্ত, তা কখনও হয় না। মেয়ে কি বাপকে কখনও ভুলতে পারে!

নিশ্চয়ই পারে।—প্রতুলবাবু যেন প্রতিবাদ ক'রে বললেন, অন্তত এক জন যে পেরেছে, সে তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত বাড়িয়ে অনামিকাকে জড়িয়ে ধরলেন; তাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে আবার হাসিমুখে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে পরিহাসের স্বরে তিনি বললেন, শোন তবে, তোমায় বলছি। বাবাজী আমার উৎকট কম্যুনিস্ট, দিনরাত প্রলেটারিয়েট নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে বেড়াচ্ছেন, সব রকমেই সে আমার উল্টো। অথচ আমারই ঘরে, আমারই স্নেহে, আমারই এই প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেও অনু বিয়ের আগেই সেই দিগম্বর সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সহধর্মিনী হবার জন্য উমার মত তপস্যা শুরু ক'রে দিয়েছে,—খাওয়া কমিয়েছে, গায়ের গয়না বাক্সে বন্ধ করেছে, ভাল কাপড়-খানা পর্যন্ত পরা ছেড়ে দিয়েছে। কেমন?—কথাটা প্রতুলবাবু অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে শেষ করলেন, ঠিক বলছি নে?

যাও।—ব'লে অনামিকা বাপের বাহুর পিছনে মুখ লুকিয়ে ফেললে।

প্রতুলবাবু আবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমি কিছু বললে অনু আমায় বলে কি, জান? বলে যে, স্বপ্নের সঞ্চিত এই মণিমুক্তোর মধ্যে লক্ষ বাঞ্চতের দীর্ঘনিশ্বাস গাঁথা রয়েছে।

অনামিকার আরক্ত মুখখানির সবটুকু তখন আর দেখা যাচ্ছিল না; তথাপি সে মুখের দিকে চেয়েই সুভদ্রা সস ম বিস্ময়ে একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রতুলবাবু সুভদ্রার চোখের সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলেন। গর্বে ও আনন্দে তাঁর নিজের সহাস্য মুখখানা আরও যেন বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ তাঁরও মুখে কোন কথা ফুটল না।

কিন্তু তার পর পরিহাসের স্বরেই তিনি আবার বললেন, তা হ'লেই, বল তো, সুভদ্রা, যে মেয়ে এমনি ক'রেই সর্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে সর্বহারাদের সঙ্গে পথে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, বঞ্চকের দলের তার বুড়ো বাপ তার কাছ থেকে কি আর প্রত্যাশা করতে পারে?

সুভদ্রা স্মিত মুখে অনামিকার দিকে চেয়েই স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপনার মুখ থেকেই অনামিকা দেবীর এই পরিচয় পাবার পরেও কি মেয়ের প্রতি আপনার এই অবিচারে আমি সায় দিতে পারি?

প্রতুলবাবু এবার শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন; হাসতে হাসতেই বললেন, তুমিও যদি ওরই দলে ভিড়ে যাও, মা, তবে আমি বেচারা আর কি করতে পারি, বল তো?

কিছু আপনাকে করতে হবে না।—সুভদ্রা সহাস্য কণ্ঠে উত্তর দিলে, আপাতত কেবল এক বাটি দুধ খেতে হবে।—ব'লেই আড়চোখে আর এক বার অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

সেই মুহূর্তেই নীচে মোটর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। প্রতুলবাবু কান খাড়া ক'রে বললেন, গাড়ি আমাদের বাড়িতেই এল ব'লে মনে হচ্ছে না?

সুভদ্রা বা অনামিকা কেউ উত্তর দিলে না। একটু কান পেতে থাকবার পর প্রতুলবাবু আবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, জামাই বাবাজীর আসবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, গাড়ির আওয়াজ শুনলেই মনে হয়, ওই বুঝি সে এল।

অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা এবার হেসেই ফেললে ; কিন্তু তখনই আবার হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আপনি বসুন, আমি দুধ নিয়ে আসি গে।

কিন্তু সুভদ্রা দোর পর্যন্ত যাবার আগেই সশব্দে কবাট খুলে গেল। ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল অরুণাংশু।

প্রতুলবাবু উৎফুল্ল স্বরে বললেন, এই যে অরুণ !

কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই সুভদ্রার সঙ্গে অরুণাংশুর চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রায় এক সঙ্গেই দুজনেই এক এক পা পিছনে স'রে গেল ; তার পর আবার এক সঙ্গেই দুজনেই যেন পাথর হয়ে গেল।

সাদর সম্ভাষণের যে কথাটা প্রতুলবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, তা আর তাঁর মুখে ফুটল না। অরুণাংশুর শক্ত বিবর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়েই তিনি উদ্বেগের স্বরে বললেন, এ কি অরুণ, কি হ'ল তোমার ? কোনও অসুখ করল নাকি ? আর সুভদ্রা, তোমার আবার কি হ'ল ? ও অনু, এ কি ব্যাপার ! কি হ'ল এদের ?

অনামিকা উত্তর দিলে না ; সুভদ্রাও পাথরের মূর্তির মতই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল অরুণাংশুর অসাড় দেহটাই অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্পের তাড়নায় থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সুভদ্রার মুখের উপর থেকে নিজের বিহ্বল চোখ দুটিকে সরিয়ে নিয়ে সে প্রথমে অনামিকার ও পরে প্রতুলবাবুর মুখের দিকে তাকাল ; খাটের দিকে দু'পা এগিয়েও গেল সে ; কিন্তু তখনই হুমড়ি খেয়ে পড়বার মত থেমে গিয়ে ডান হাতে কপালের উপরের চুলগুলিকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে থেমে থেমে সে বললে, আপনারা বসুন, আমি এই এলাম কিনা, একটু পরে আবার আসছি—

কথা শেষ হতে না হতেই মুখ ফিরিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে সে বের হয়ে গেল।

কি ব্যাপার এ সব ! প্রতুলবাবু উদ্‌ভ্রান্তের মত চীৎকার ক'রে উঠলেন, ও অরুণ, কোথায় যাচ্ছ তুমি ? আহা—কথাটা— ও সুভদ্রা—তোমার আবার কি হ'ল, সুভদ্রা ?

প্রতুলবাবু দু-তিন বার সুভদ্রাকে ডাকবার পর তবে যেন তার চৈতন্য

হ'ল। সুপ্তোত্থিতের মতই চমকে উঠল সে। বিহ্বল অস্থির চোখে সে-ও এক বার প্রতুলবাবুর, এক বার অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর নিজের শরীরটাকে খুব জোরে এক বার নাড়া দিয়ে প্রতুলবাবুর কাছে এসে সে বললে, আমি আর থাকতে পারব না, মিঃ গুপ্ত, এক্ষুনি আমায় যেতে হবে।

দুই চোখ বড় ক'রে প্রতুলবাবু শুধু বললেন, অ্যাঁ!

হ্যাঁ, মিঃ গুপ্ত।—সুভদ্রা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, আমার কাজ আছে। আমার ফীসের টাকাটা আপনি ডাক্তার বোসকে দেবেন, তা হ'লেই আমি পাব। আচ্ছা, নমস্কার, আমি তবে এখন আসি।

দু-তিন মিনিট তো মোটে সময়, অথচ ওইটুকুর মধ্যেই ঘরের ভিতরে কি যেন একটা প্রলয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। একটু আগেই লজ্জা ও আনন্দে অনামিকার যে মুখখানি সিঁদুরের মত টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিল, সেই মুখখানিই একেবারে যেন কাগজের মত সাদা হয়ে গেল; শরীরটা বার কয়েক থরথর ক'রে কেঁপে উঠবার পর হঠাৎ একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। প্রতুল-বাবুর অবস্থা হ'ল ওর চেয়েও খারাপ। দুই চোখ বড় ক'রে সম্মোহিতের মত তিনি দোরের দিকে চেয়ে রইলেন। সুভদ্রা চ'লে যাবার পর প্রায় মিনিট খানেক কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। দেয়ালের বড় ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শব্দের ভারে ভিতরের স্তব্ধতা প্রতি মুহূর্তেই আরও যেন ভারী হয়ে উঠতে লাগল।

তার পর প্রতুলবাবুই কথা বললেন। কথা তো নয়, যেন আর্তনাদ,—এ কি কাণ্ড! সুভদ্রাও চ'লে গেল যে! আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে! ও অনু!

অনামিকা চমকে উঠল,—প্রতুলবাবুর দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখের উপর ছুটে এসেছে, চোখের তারা দুটি যেন গর্ত থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে। অনামিকা মুখ তুলতেই তিনি ব্যাকুল স্বরে আবার বললেন, ও অনু, কি হ'ল এদের? আমি যে—

অনামিকা মাথা ঝোঁকে অস্ফুট স্বরে বললে, না বাবা, কিছু হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে এক হাতে বাপের গলা জড়িয়ে ধ'রে আর এক হাতে তাঁর মুখে ও বুকে হাত বুলাতে বুলাতে সে আবার বললে, তুমি শান্ত হও, বাবা। কই, কিছুই তো হয় নি! শোও তুমি, ভাল হয়ে শোও দেখি!

কিন্তু—। প্রতুলবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ওরা অমন ভাবে চ'লে গেল কেন? ডাক না একবার সুভদ্রাকে, ওরা কি—

তুমি আগে শান্ত হও তো, বাবা।—অনামিকা এবার বাপের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বললে, তোমার যে অসুখ শরীর। আমি বলছি, ভয়ঙ্কর কিছু হয় নি। যা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।

অ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ তুমি? কি বুঝেছ? ওরা পরস্পরের চেনা-জানা নাকি?

বোধ হয় তাই।

অ্যাঁ!—কেমন ক'রে জানলে তুমি? সুভদ্রা তোমায় কিছু বলেছে নাকি?

না, বাবা।

তবে?

অনামিকা এবার চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, তুমি আগে শান্ত হয়ে শোও, বাবা; আমি পরে তোমায় বলছি।

না, না।—প্রতুলবাবু অসহিষ্ণুর মত বাধা দিয়ে বললেন, পরে নয়, এক্ষুনি বল। কি জান তুমি? কার সম্বন্ধে কি জান তুমি? কার কাছে জেনেছ? না শুনলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব আমি।

বাবা!—অনামিকা আবার তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বললে, এমন ছেলেমানুষি কেন করছ তুমি? তুমি শোও আগে, তার পর বলছি।

প্রতুলবাবু পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু আগের মতই অসহিষ্ণু স্বরে তিনি বললেন, না, অনু, আগে তুমি আমায় বল। কি জান তুমি? কার কাছে কি শুনেছ?

প্রতুলবাবুর ভাব দেখে অনামিকা কথাটা আর গোপন করতে সাহস পেলে না। কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, উনিই আমায় বলেছেন।

প্রতুলবাবু চমকে উঠে বললেন, কে বলেছে—অরুণাংশু?

হ্যাঁ, বাবা।

কিন্তু কি ক'রে বললে সে? কবে বলেছে? সে তো এল সবে এই এখন।

আগেই তিনি সুভদ্রা দেবীর কথা আমায় বলেছিলেন।—অনামিকা মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, সুভদ্রা দেবীকে দেখেই আমারও সন্দেহ হয়েছিল। এখন বুঝলাম যে, ইনিই সেই সুভদ্রা দেবী।

অ্যাঁ!—প্রতুলবাবু বিহ্বলের মত বললেন, তাই নাকি? কিন্তু—তা হ'লেও ও রকম হবে কেন?

অনামিকা উত্তরে বললে, হঠাৎ দেখা হয়েছে কিনা!

আহা-হা!—প্রতুলবাবু অসহিষ্ণুর মত ব'লে উঠলেন, দুজন চেনা-জানা মানুষের হঠাৎ দেখা হওয়া তো খুশির কথা। তার জন্য দুজনেই অমন চোরের মত চমকে উঠে পালিয়ে যাবে কেন?

অনামিকার মুখে এবার আর উত্তর ফুটল না। কি বলবে সে? ঠিক এই প্রশ্নটাই তারও মনে জেগেছিল; কিন্তু উত্তর সে ভেবে ঠিক করতে পারে নি। বাপের মুখে নিজের সংশয়েরই প্রতিধ্বনি শুনে অপ্রতিভের মত মাথা নামিয়ে নিলে সে।

দেখে প্রতুলবাবুই আবার ব্যাকুল স্বরে বললেন, ও অনু, কথা বলছ না যে? অমন চোরের মত ওরা পালিয়ে গেল কেন? কেমন চেনা-জানা ছিল ওদের? ও অনু—

বলতে বলতে তিনি আবার উঠে বসলেন। অনামিকার একখানা হাত চেপে ধ'রে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে তিনি আবার বললেন, কথা বলছ না কেন? কি জান তুমি? কেমন সম্বন্ধ ছিল ওদের?

অনামিকা অসহায়ের মত তার বাপের মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এ সব কথা এখন থাক্, বাবা; আমি আর এক সময়ে তোমায় সব কথা খুলে বলব।

না।—প্রতুলবাবু আবার তার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, এক্ষুনি বল। সব কথা এক্ষুনি তোমায় বলতে হবে।

অনামিকা আবার চোখ নামিয়ে নিলে; কতকটা বিরক্ত, কতকটা ক্ষোভের স্বরে সে বললে, তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ, বাবা। ওঁরা দুজনেই হুগলীতে

থাকতেন, এক সঙ্গে দেশের কাজ করতেন। ওঁদের পরস্পরের পরিচয় ছিল, ভাবও হয়েছিল। এ সব কথা উনিই আমায় বলেছেন। তার পর উনি ওখান থেকে চ'লে আসবার পর সুভদ্রা দেবী নাকি ওখান থেকে চ'লে গিয়ে বিয়ে করেছেন।

অ্যাঁ!—প্রতুলবাবু আবার দুই চোখ বড় ক'রে বললেন, এ কথা আবার কে বললে?

এ কথাও উনিই আমায় বলেছেন।

কিন্তু সুভদ্রা যে বললে যে, তার বিয়ে হয় নি!

অনামিকা চমকে তার বাপের মুখের দিকে তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলে। এবার আর তার মুখে উত্তর ফুটল না।

প্রতুলবাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন, না, না, এ তো ভাল কথা নয়, নিশ্চয়ই নয়। কিছু একটা গলদ এর মধ্যে আছেই। নইলে অমন চোরের মত—

কথাটা তাঁর শেষ হ'ল না; হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি আগুনের মত জ্ব'লে উঠল; মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, এ সব কথা জেনেও এত দিন আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ কেন, অনু? কেন—কেন এ সব কথা আমায় খুলে বল নি?

অনামিকা আহতের মত মুখ তুলে বললে, বলবার তো কোনও উপলক্ষ হয় নি বাবা! আর, তা ছাড়া ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছুও তো নয়!

গুরুতর নয়!—প্রতুলবাবু প্রায় চীৎকার ক'রে বললেন, এমন একটা ব্যাপারকে তুমি গুরুতর মনে কর না অনু? দিন দিন কি হচ্ছ তুমি?

কিন্তু তার পরেই অবসন্নের মত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি; সুর বদলে আবার বললেন, না, তোমাকে দোষ দিয়ে আর কি হবে! চোখ থাকতেও আমি নিজেই যখন অন্ধ হয়ে ছিলাম!

অনামিকা কোন উত্তর দিলে না; নত মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার দুধটা আমি নিয়ে আসি বাবা, দুধ খাবার সময় অনেকক্ষণ তো পার হয়ে গিয়েছে।

না, দুধ নয়।—বলতে বলতে প্রতুলবাবু আবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন; বিস্মিতা অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললেন, শোন, অনু, অরুণাংশুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারবে না।

নির্দেশটা আকস্মিক; কিন্তু কথার সুরে কেবল কর্তৃত্ব নয়, চরম সিদ্ধান্তের দৃঢ়তাও এতই স্পষ্ট হয়ে বেজে উঠল যে, উত্তরে অনামিকার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হ'ল না; বোধ করি, অমন স্পষ্ট ও অমন নিশ্চিত হ'লেও কথাটা সে বুঝতেই পারলে না।

কিন্তু এক বার একটু দম নিয়েই প্রতুলবাবু আবার বললেন, চরম দুর্ঘটনা ঘটবার আগে সত্যকে আমার চোখের সামনে ধরিয়ে দিয়ে ভগবান তোমাকেও বাঁচিয়েছেন, আমাকেও মহাপাতকের দায় থেকে রক্ষা করেছেন। যা হবার সে তো হয়েই গিয়েছে, কিন্তু আর কিছু হবে না,—বিয়ে কিছুতেই নয়।

অনামিকা এবার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না; মুখে কথা ফুটতে না চাইলেও বেশ একটু চেষ্টা ক'রেই সে বললে, কি বলছ, বাবা?

কিন্তু প্রতুলবাবু গলার স্বর আরও এক পরদা উঁচুতে চড়িয়ে উত্তর দিলেন, না, মা, না; আমি অনেক কিছুই উপেক্ষা করেছিলাম। সে কম্যুনিস্ট,—দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, সংস্কৃতির শত্রু, ধর্মের শত্রু। তবু এ সব ত্রুটিই আমি উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু চরিত্রহীনতার ত্রুটি অমার্জনীয়।

অনামিকা বিহ্বল স্বরে বললে, কি বলছ, বাবা?

বলছি খুব সোজা আর খুব স্পষ্ট কথা। নারী-সম্পর্কে যাকে চরিত্রহীন ব'লে জানতে পেরেছি, তার হাতে কিছুতেই তোমায় আমি সম্প্রদান করব না।

অনামিকার মুখখানা এবার ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। পতন নিবারণ করবার জন্যই যেন হাত বাড়িয়ে খাটের একটা কোণ শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে অস্ফুট স্বরে সে বললে, কি বলছ, বাবা? কাকে চরিত্রহীন বলছ তুমি?

ওই রাস্কেলটাকে।—প্রতুলবাবু হঠাৎ যেন আগুনের মত জ্ব'লে উঠলেন,—চরিত্রহীন বলছি ওই অরুণাংশুকে।

চরিত্রহীন!

আলবৎ চরিত্রহীন। ওই সুভদ্রার সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ, নিশ্চয় তা সুন্দর বা

নির্দোষ নয়। চোখের সামনে আজকের এই নাটক দেখবার পর কিছুতেই ওর হাতে তোমায় আমি সম্প্রদান করব না।

একটু থেমে আরও একটু চড়া সুরে তিনি আবার বললেন, না, কক্ষনো না, বিয়ে আমি কিছুতেই দেব না। কুক্ষণে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু এবার সব সম্বন্ধই আমি চুকিয়ে দেব। 'তারে'র ফর্ম নিয়ে এস, অনু, রমেনদাকে এক্ষুনি আমি 'তার' করব। যাও—ফর্ম নিয়ে এস শীগগির।

কিন্তু অনামিকার ঠোঁট দুখানা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল; খাটের কোণটা আরও জোরে চেপে ধ'রে সে বললে, বিয়ে তুমি ভেঙে দেবে, বাবা?—আশীর্বাদের পর?

হোক আশীর্বাদের পর।—প্রতুলবাবু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, এ বিয়ে নিশ্চয়ই ভেঙে দেব আমি। একটা অনুষ্ঠান বা একটা মুখের কথার চেয়ে মানুষের জীবনের দাম ঢের বেশি।

কিন্তু, বাবা,—। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে অনামিকার গলার স্বর কেঁপে উঠল; থেমে থেমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথাটাকে সে শেষ করলে, আমি—আমি যে তাকে ভাল—বাসি!

প্রথমে প্রতুলবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু তার পরেই বারুদের মত জ্ব'লে উঠে তিনি বললেন, ভালবাস—ওই স্কাউণ্ড্রেলটাকে ভালবাস তুমি? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যে তোমার সর্বনাশ করবার উপক্রম করেছিল সেই চরিত্রহীন লম্পটটাকে ভালবাস তুমি?

উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম করলে অনামিকা; কিন্তু অস্ফুট একটা আওয়াজ ছাড়া কিছুই তার কণ্ঠে ফুটল না। কিন্তু তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই প্রতুলবাবুই আবার বললেন, কিন্তু ঠিক জেনো, অনু, ওই অরুণের হাতে আমি তোমায় কিছুতেই সম্প্রদান করব না। আমার অমতেও ওকেই যদি বিয়ে তুমি করতেই চাও তবে তার আগে আমার কাছ থেকে তোমায় বিদায় নিয়ে যেতে হবে; আর পরে আমার ধনসম্পত্তি যদিও বা তুমি পাও, আমার আশীর্বাদ তুমি কিছুতেই পাবে না। আমার অভিসম্পাত মাথায় নিয়েই তোমার আর তোমাদের সন্তানসন্ততিদের জীবন কাটাতে হবে।

বাবা!

অনামিকা হঠাৎ যেন আহত পশুর মতই আর্তনাদ ক'রে উঠল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরে আর একটি কথাও তার মুখে ফুটল না। চোখ তুলে শুধু একটি বার বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেই মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে সে ঝড়ের বেগে ছুটে বের হয়ে গেল।

৫

সুভদ্রাকে নিয়ে পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর পথে ছুটে চলেছিল। ভিতরে সুভদ্রা পা ছড়িয়ে, গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে মড়ার মত প'ড়ে ছিল। একটা রিক্শাকে এড়াবার জন্য ড্রাইভার ট্যাক্সির মুখটা ডান দিকে একটু ঘুরিয়ে দিতেই একটা লরির সঙ্গে ট্যাক্সির ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকাল; কিন্তু তার পর যা ঘটল তার কিছুই সে জানতে পারলে না।

চারদিকে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। লোকজন ছুটে এল, পুলিসও এল। তারাই ব্যবস্থা ক'রে সুভদ্রাকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখনও তার মূর্ছিত অবস্থা; রক্তে জামাকাপড় ভিজে গিয়েছে।

তার ব্যাগের গায়েই তার নাম আর ঠিকানা ছিল। তাকে নার্স ব'লে চিনতে পারার জন্যই এক জন নার্স সিস্টার চারুশীলার মেসে ফোন ক'রে খবর জানিয়ে দিলে।

কমলা যখন এল, তখন রাত হয়েছে।

তখনও সুভদ্রার জ্ঞান হয় নি। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের অপারেশন-টেবেলের উপর সে মড়ার মত প'ড়ে রয়েছে। কাছে যারা ছিল তাদেরই এক জন কমলাকে বললে, ওর স্বামী কোথায়? তাকে খবর দিন।

স্বামী!—কমলা চমকে উঠল।

হ্যাঁ।—ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, এখনও জ্ঞান হ'ল না, রক্তও বন্ধ হচ্ছে না, হয়তো দুজনের এক জনকেও বাঁচানো যাবে না। ওর স্বামীকে খবর দেওয়াই উচিত।

কমলার মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হয়ে উঠল। বারান্দার

রেলিং ধ'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে; তার পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সে মেসে ফিরে গেল।

সেই হুগলী যাবার আগে সুবোধের নাম আর ঠিকানা লেখা যে কাগজখানি সুভদ্রা তার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, সেখানা কমলা আজ খুঁজে বের করলে। দারোয়ানকে ডেকে সেই কাগজখানাই তার হাতে দিয়ে সে বললে, এক্ষুনি তোকে হুগলী যেতে হবে। এই ঠিকানায় গিয়ে এই বাবুটিকে বলবি যে, সুভদ্রা দেবীর খুব অসুখ, একটুও দেরি না ক'রে তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। এখানে যদি আমায় না পাস তো তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবি। খুঁজে বের করবি, আমরা কোথায় আছি; তার পর বাবুকে সেখানে নিয়ে যাবি। পারবি নে?

দারোয়ান মুখ ম্লান ক'রে বললে, শকেঙ্গে তো জরুর; লেকিন লৌটনে বকত গাড়ি কহাঁ মিলেগী?

কমলা উত্তরে ধমক দিয়ে বললে, রাস্তায় গাঁজা খেতে না বসলে গাড়ি তুই আলবৎ পাবি। আর না'ও যদি পাস্, স্টেশনে রাত কাটিয়ে ভোরের গাড়িতে আসবি। বাবুকে বলবি, সুভদ্রাদিদিমণি বাঁচে কি না তার ঠিক নেই। না আসতে চাইলে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনবি। তবে, হ্যাঁ, আর কাউকে সঙ্গে আনবি নে যেন—কোন চাকর-বাকরও নয়।

দারোয়ানকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কমলা হাসপাতালে ফিরে গেল। এবার ডাক্তার আশার কথা বললেন, জ্ঞান না হ'লেও রক্ত বন্ধ হয়েছে। সঙ্কটটাও বোধ হয় দুজনেরই কেটে গিয়েছে।

কমলা ছুটে গেল কেবিনের ব্যবস্থা করতে। কুলি-মেথরদের মোটা বকশিশ দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে আবার যখন সে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ফিরে এল, তখন সুভদ্রার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু কমলাকে দেখে সে কথা বলবার চেষ্টা করতেই কমলা হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধ'রে বললে, এখন কোন কথা নয়, শুভা,—এখন কেবল ঘুম। চুপটি ক'রে সারাটা রাত তোমায় ঘুমোতে হবে। কেবিন আমি ঠিক করেছি, একটুও গোলমাল হবে না।

সুভদ্রাকে ঘুম পাড়িয়ে কমলা অবশিষ্ট রাতটুকু তার বিছানার পাশে জেগে ব'সে রইল।

কাজ অবশ্য কিছুই ছিল না। কেবিনে এসেই সুভদ্রা সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার পর তার ঘুম আর ভাঙে নি। তথাপি কমলা নিজে এক মুহূর্তের জন্যও দুই চোখের পাতা এক করে নি। প্রায় সারাটা রাতই সে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কাটিয়েছে। দেখে দেখে তার চোখ যেন আর তৃপ্ত হচ্ছিল না। এ যেন আর এক সুভদ্রা। ঠোঁটের সে সুস্পষ্ট সরস ভাব আর নেই, চোখ দুটি কোটরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, প্রচুর রক্তপাতের ফলে তার স্বাভাবিক শ্যাম বর্ণ পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে। তবু তার শীর্ণ সুষুপ্ত মুখখানিতে এমন একটা করুণ মাধুর্য ফুটে উঠেছিল, যার আবেদন সারা রাতের মধ্যেও একটুও ক্ষীণ হয় নি। ভোরবেলায় ঘরের বিজলীর আলো নিবে যাবার পর উষার অস্ফুট আলোকে সেই মুখের দিকে চেয়ে কমলার মনে হতে লাগল যে, সে যেন বিগত সন্ধ্যার প্রস্ফুটিত সুপরিণত একটি চন্দ্রমল্লিকা,—সারা রাত ওর উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে গিয়েছে, তবু সেটি ছিঁড়ে পড়ে নি; অবিরাম বারিধারা নিষ্ঠুর দস্যুর মত লুণ্ঠন ক'রে তার শুভ্র সুষমার সামান্য একটু লাবণ্যও অবশিষ্ট রাখে নি; তবু ওরই সঙ্গে সঙ্গেই তার ধূলিধূসর অঙ্গের মলিনতাটুকুও নিঃশেষে মুছে নিয়ে গিয়েছে। সুভদ্রার জন্য করুণা ও মমতায় কমলার বুক কাণায় কাণায় ভ'রে উঠল।

সুভদ্রার ঘুম যখন ভাঙল, তখন রোদ উঠেছে। সে চোখ মেলতেই কমলা তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ এখন?

ক্ষীণ স্বরে সুভদ্রা বললে, ভাল।

বাঁচলাম।—কমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, যা ভাবনা হয়েছিল আমাদের! ডাক্তার তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুভদ্রা ঘরখানি এক বার দেখে নিলে; তার পর বললে, তুমি কি সারা রাত ওখানে ব'সে কাটিয়েছ? ঘুমোও নি?

কমলা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, সারা রাত আবার কোথায়? এই ঘরে তোমায় যখন নিয়ে এলাম, তখন তো রাত প্রায় একটা। তার পর এই তো মোটে ক'ঘণ্টা। বসতে বসতেই রাত কেটে গেল।

সুভদ্রা কোন উত্তর দিলে না। একটু চুপ ক'রে থাকবার পর কমলাই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বোস তুমি,—তোমার মুখ ধোবার ব্যবস্থা করি।

কমলাই জল নিয়ে এল। সুভদ্রাকে তুলে বসিয়ে দিলে সে। তারই হাত থেকে দুধের বাটি হাতে নিয়ে সুভদ্রা কুণ্ঠিতের মত একটু হেসে বললে, কাল নিজে আমি এই রকমেই আর এক জনের সেবা করছিলাম। তখন ভাবতেও পারি নি যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অসহায় হয়ে আমাকেই আর এক জনের সেবা নিতে হবে।

কমলাও হেসে ফেলে বললে, কাল সন্ধ্যার আগে আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম যে, বিনি-পয়সার এমন একটি রোগী আমার ঘাড়ে এসে পড়বে!

কিন্তু তার পরেই হাসি থামিয়ে উদ্বেগের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটল কেমন ক'রে? সব কথা খুলে বল তো, কিছুই তো শোনা হয় নি এখনও!

কোন কথাই আমার মনে নেই।—সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, ট্যাক্সি ক'রে মেসে ফিরছিলাম, হঠাৎ জোরে একটা ধাক্কা লাগল। তার পর কি যে হ'ল, কিছুই জানি নে আমি!

কমলা একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক্, অল্পের উপর দিয়েই ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। অত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও দুজনেই যে তোমরা বেঁচে গিয়েছ, সে কেবল ভগবানের দয়ায়।

কিন্তু এই কথাটা কানে যেতেই সুভদ্রার বিবর্ণ মুখের উপর একটা লালের ছোপ ফুটে উঠেই তৎক্ষণাৎ আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিলে সে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, মেসের সবাই সব কথা জানতে পেরেছে নাকি?

কমলার মুখখানা দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল; নিজেও চোখ নামিয়ে সে উত্তর দিলে, জানবে না? এর পরেও এ কথা গোপন থাকতে পারে নাকি?

কিন্তু তার পরেই যেন মেঘের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে বিদ্যুৎ ফুটে উঠল। মুখ তুলে, ভুরু বেঁকিয়ে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কমলা আবার বললে, কেন লো, পোড়ারমুখী, এখন এত ভাবনা কেন? এখন বলতে পারিস নে যে, তোর

কিছু হয় নি? বলতে পারিস নে যে, সে দিন আমি যেমন ভুল করেছিলাম, আজ ডাক্তারও তেমনি ভুল করেছে?

সুভদ্রা কোন উত্তর দিলে না; মুখখানা আরও একটু নীচু ক'রে শাড়ির একটা কোণ দড়ির মত ক'রে পাকাতে শুরু করলে সে।

কমলাও তখন আর কোন কথা বললে না। কিন্তু দুধের খালি বাটিটা রেখে আসবার পরেও সুভদ্রাকে সেই অবস্থায় দেখে দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে অনুতাপের স্বরে বললে, রাগ করেছিস ভাই? আমার ঘাট হয়েছে, মাফ চাচ্ছি তোর কাছে।

না, না।—ব'লে সুভদ্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। কমলার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত ভাবে একটু হেসে সে আবার বললে, না ভাই, রাগ কেন করব! সত্যি, আর তো গোপন করবার উপায় নেই! তবে যা হয়তো তুমি ভেবেছ, তাও ঠিক নয়। ঠিক যা, তা যাবার আগে তোমায় আমি খুলে ব'লে যাব।

আচ্ছা আচ্ছা।—ব'লে কমলা উঠে দাঁড়াল, সুভদ্রার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে এনে কোমল স্বরে সে আবার বললে, সে যা হবার পরে হবে 'খন। আপাততত তুমি লজ্জাও ক'রো না, ভাবনাও ক'রো না। শুধু চুপ ক'রে আমার হুকুম তুমি তামিল ক'রে যাও; তার পর সব দিক বজায় রেখে যা করবার তা আমিই করব। বলতে বলতেই অল্প একটু হেঁট হয়ে বিস্মিতা সুভদ্রার কপালের উপর আলগোছে সে একটি চুমো খেলে।

সুবোধ যখন এল, তখন বেশ বেলা হয়েছে। তাকে দেখেই কমলার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন হিংস্র হয়ে উঠল। সুভদ্রার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই বিছানার উপর উঠে ব'সে সে বললে, এ কি, সুবোধবাবু যে!

সুবোধ মাঝ পথে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বিছানার কাছে এগিয়ে এসে সে বললে, কি হয়েছে আপনার?

সুভদ্রা সঙ্কুচিত হয়ে বললে, কই, কিছু হয় নি তো আমার!—অকারণেই পায়ের কাছের চাদরখানি কোল পর্যন্ত টেনে দিয়ে সে আবার বললে, ওমা—কি আবার হবে!

কিন্তু আমি যে শুনলাম—

ওমা—কি শুনলেন আপনি? কার কাছে শুনলেন? কে খবর দিলে আপনাকে?

আমি খবর দিয়েছি।

এবার কথা বললে কমলা। সুবোধ আর সুভদ্রা দুজনেই চমকে এক সঙ্গে কমলার মুখের দিকে তাকাতেই মাথাটা একটু ঝেঁকে সে আবার বললে, হ্যাঁ, আমিই খবর দিয়েছি। কেন খবর দিয়েছি, তা বুঝতে পারেন নি আপনি?

প্রশ্নটা সে সুবোধের মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল, সুবোধ বুঝতে না পেরে বিহ্বলের মত বললে, কই, না তো।

কই, না তো!—বলতে বলতে কমলার চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল—বড্ড যে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে এখন! কিন্তু আজ আর ওতে চলবে না। মনে রাখবেন, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন এবার।

সুবোধের চেয়েও যেন বেশি বিস্মিত হয়ে সুভদ্রা বললে, ও কমলা, এ কি বলছ তুমি?

তুই থাম্।—কমলা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে বললে, কোন কথা তোকে বলতে হবে না। যা করবার তা আমিই করছি।

পরক্ষণেই সুবোধের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে আবার বললে, চুপ ক'রে রইলেন যে? সুভদ্রার গর্ভে সন্তান আছে, এ কথা জানেন না আপনি?

সুভদ্রা সবেগে মাথা নেড়ে বললে, না।

তথাপি কমলা সুবোধকেই ধমক দিয়ে বললে, বলুন, জানেন কি না?

সুবোধ সম্মোহিতের মত উত্তর দিলে, জানি।

কমলা বললে, সে সন্তান আপনার। বলুন, সত্যি কি না?

না, না।—সুভদ্রা এবার পাগলের মত দুই হাত উঁচু ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠল, না, কমলা, কক্ষনো নয়। ছিঃ ছিঃ, চুপ কর, কিচ্ছু জান না তুমি, কাকে কি বলছ?

সুবোধের শরীরটা আগেই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল, কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারে নি। তার উপর সুভদ্রার আর্ত কণ্ঠের ওই সুস্পষ্ট প্রতিবাদ শুনে কমলা কেমন যেন বিহ্বল

হয়ে পড়ল। হতভম্বের মত সুভদ্রার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছিস তুই?

কিচ্ছু জান না তুমি।—সুভদ্রা আবার আর্তনাদ ক'রে উঠল, ছিঃ ছিঃ, কি সর্বনাশ করেছ!

তবে তোমার এই সর্বনাশ কে করলে?—কমলা বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

সুভদ্রা তার গায়ে খুব জোরে একটা ঠেলা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, থাম তুমি। এ সব কথা আর যদি বল, আমি চীৎকার ক'রে লোক জড়ো করব। যাও তুমি এখান থেকে। সুবোধবাবু, আপনিও যান, আমার কিচ্ছু হয় নি।

কমলা এবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বললে, ব্যাপার কি, সুবোধবাবু? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে!

এতক্ষণ পরে সুবোধের শরীরটা ন'ড়ে উঠল। চট ক'রে কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে আমতা আমতা ক'রে সে বললে, আপনার বুঝবার কথাও নয়। তবু আমায় খবর দিয়ে আপনি ভালই করেছেন। আমাদ্বারা কোন উপকার যদি হয়, মানে— যা আপনারা আমায় করতে বলবেন, যা স্বীকার করতে বলবেন, তাই করতে রাজী আছি আমি।

না, না।—সুভদ্রা আবার প্রতিবাদ ক'রে বললে, কিচ্ছু আপনাকে করতে হবে না। শুধু দয়া ক'রে আপনি এখান থেকে যান। কমলা, তুমিও যাও এখান থেকে,—মা গো, তোমরা কি আমায় একটু কাঁদতেও দেবে না?

কথা তো নয়, যেন কমলা আর সুবোধের গায়ে বেশ জোরে এসে একটা ধাক্কা লাগল। দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই পরস্পরের মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে দেখে তখনই বাইরে বের হয়ে গেল।

মিনিট পনরো পরে নিঃশব্দে দোর খুলে সুবোধ যখন আবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে, তখনও সুভদ্রা বিছানায় উপুড় হয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। দোরের কাছেই থমকে দাঁড়াল সে; মাস তিনেক আগের সেই রাতের কথা তার মনে প'ড়ে গেল,—সে রাতেও সুভদ্রা এই রকমেই ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। হঠাৎ তার চোখ দুটি জ্বালা ক'রে জলে ভ'রে উঠল; পা দুটি গেল কেঁপে; বুকের মধ্যে স্মৃতির সমুদ্র দুলে উঠল। কিন্তু নিজেকে তখনই সামলে নিলে

সে। চট্‌ ক'রে চোখ মুছে সে খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে কোমল মৃদু স্বরে ডাকলে, সুভদ্রা দেবী!

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকিয়েই ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগেই সুবোধই কুণ্ঠিত স্বরে আবার বললে, আমায় মাফ করুন, সুভদ্রা দেবী। আপনি যেতে বললেও যেতে পারি নি আমি, অনুমতি না নিয়েই আবার আপনার কাছে এসেছি।

বিহ্বলের মত সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই সুভদ্রা হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে বললে, আমায় আপনি মাফ করুন, সুবোধবাবু, কিছু দোষ নেই আমার। আমায় কিছু না জানিয়েই কমলা আপনাকে খবর পাঠিয়েছে। ও নিজেও কিছুই জানে না, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই ও আপনাকে এত কঠিন অপমান করেছে।

না, সুভদ্রা দেবী।—সুবোধ চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমার একটুও অপমান হয় নি। এ বরং ভালই হয়েছে। নিজে থেকে কথাটা তো কোন দিনই আমি মুখ ফুটে বলতে পারতাম না!

সুভদ্রার চোখের জল হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেল; সে বিহ্বল স্বরে বললে, কি বলছেন আপনি?

সুবোধ এক বার ঢোক গিলে আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, কমলা দেবী ভুল ক'রে যা অনুমান করেছেন, তা কি সত্য হতে পারে না?

এবার সুভদ্রার চোখের তারা দুটিও যেন নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড কাল স্তব্ধ হয়ে সুবোধের আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে সবেগে মাথা নেড়ে বললে, না, না; কক্ষনো নয়। ছিঃ ছিঃ, এ কি কথা বলছেন আপনি?

তথাপি সুবোধ বললে, আমার জন্য নয়, সুভদ্রা দেবী। কেবল আপনার ওই অজাত সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যই এক দিনের একটা অনুষ্ঠান যদি হয়—

না।—বাধা দিয়ে সুভদ্রা দৃঢ় স্বরে বললে, সে জন্যও যা আপনারা বলছেন, তা হতে পারবে না।

তার পরেই আবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠল; সুবোধের মুখের দিকে

চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, ছিঃ ছিঃ, এ কি কথা বলছেন আপনি? সব জেনে-শুনে কথাটা জিভে আটকে গেল না আপনার? আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমায় এত বড় অপমান করলেন আপনি?

কিন্তু সুবোধের ব্যবহারে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ পেল না। সুভদ্রার অমন মর্মান্তিক মন্তব্যের প্রত্যুত্তরেও সে অল্প একটু হেসেই বললে, আমায় বিশ্বাস করুন, সুভদ্রা দেবী—লোভ আমার আজ একটুও নেই; তাই এ কথা বলতে আজ আমার লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ হয় নি।

একটু থেমে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, সত্যি বলছি, সুভদ্রা দেবী,—আপনার অজাত সন্তানের মঙ্গলের জন্যই এ প্রস্তাব করেছি আমি। কেবল সমাজে তাকে পরিচিত ক'রে দেবার অধিকারটুকু ছাড়া আপনার কাছে কোন দিনই আর কোন অধিকারের দাবি আমি করব না।

কিন্তু সুভদ্রা মুখ নামিয়ে উত্তর দিলে, তা হ'লেও এ হতে পারবে না।

পরক্ষণেই মুখ তুলে সুর চড়িয়ে সে আবার বললে, সেই জন্যই হতে পারবে না, সুবোধবাবু। এ কথা আর যেন মুখেও আনবেন না আপনি।

সুবোধের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর আবার সে বললে, মা হয়ে সন্তানের এত বড় ক্ষতি করবেন, সুভদ্রা দেবী? নিষ্পাপ শিশুর ললাটে কলঙ্কের কালি মাখিয়েই লক্ষ জনের চোখের সামনে তাকে তুলে ধরবেন?

সুভদ্রার চোখ দুটি হঠাৎ যেন জ্ব'লে উঠল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে সুবোধের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, সত্যকে গোপন করবার জন্য আমার নিষ্পাপ সন্তানের নির্মল ললাটে মিথ্যা পিতৃ-পরিচয়ের তকমা এঁটে দিলেই কি তার মঙ্গল করা হবে?

সুবোধ অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে বললে, কিন্তু সুভদ্রা দেবী, আপনার সন্তান তো তার পিতৃপরিচয়, তার সত্য পরিচয় লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে বলতে পারবে না!

না-ই বা পারলে।—সুভদ্রা আগের মতই ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে, সন্তান যদি তার পিতার পরিচয় না-ই দিতে পারে, সে তার দুর্ভাগ্য, সে তো আর তার কলঙ্ক নয়! আমার অসহায়, হতভাগ্য সন্তানের নিস্তব্ধতার আড়ালে

সত্য না হয় ঢাকাই প'ড়ে থাকবে। কিন্তু আমার নিজের লজ্জা গোপন করবার জন্য মা হয়ে এত বড় একটা মিথ্যা কথা তাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারব না।

কিন্তু সুবোধ হার মানলে না; মিনিট খানেক চুপ ক'রে থাকবার পর আবার সে কুণ্ঠিত অনুনয়ের স্বরে বললে, কমলা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই এ কথা আপনাকে আমি বলছি সুভদ্রা দেবী, ঝোঁকের মাথায় আমাদের প্রস্তাবটাকে অগ্রাহ্য করবেন না আপনি। আমাদের এই সেকালের সমাজে মানুষের চলার পথটা তো সোজা নয়, সমতলও নয়। ক'দিন পরেই যে অবোধ শিশু আপনার কোলে এসে জুড়ে ব'সে আপনার কাছে পথ চলার ছাড়পত্র দাবি করবে, কেবল তার কথাটাই আপনি শান্ত হয়ে ভেবে দেখুন।

আমি ভেবেছি, সুবোধবাবু।—সুভদ্রা কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে উত্তর দিলে, মাসের পর মাস খুব ভাল ক'রেই ভেবেছি। ভেবেছি ব'লেই আপনাদের প্রস্তাব আমার অগ্রাহ্য।

সুবোধ ক্ষোভের স্বরে বললে, তবে কি নিজের সন্তানকে আপনি একেবারে নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন, নিঃস্ব ক'রেই সংসারে ছেড়ে দেবেন?

সুভদ্রা কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ক'রেই উত্তর দিলে সে, কি করব বলুন? তাই ব'লে যে তার পিতা নয়, তারই সন্তানত্বের তকমা এঁটে সারাটা জীবন নিজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসংসারকেও প্রতারণা করবার মন্ত্র মা হয়ে তাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারব না।

সুবোধের বিবর্ণ মুখ আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল; কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, তবে আমায় অনুমতি দিন, সুভদ্রা দেবী, অরুণাংশুকেই সব কথা খুলে বলি।

কিন্তু কথাটা শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে সুভদ্রা দুই চোখ বড় ক'রে বললে, না, না, এ কি বলছেন আপনি!

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, অরুণাংশুকে কথাটা আমি খুলে বলতে চাই

না।—সুভদ্রা মাথা ঝেঁকে দৃঢ় স্বরে বললে, তা হবে না! ও কথা আবার কেন বলছেন আপনি—ও তো আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুবোধ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, এক নিমেষেই সুভদ্রার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। উত্তেজনার চিহ্নও তাতে নেই,—কমনীয়তাও নেই। মানুষের মুখই যেন তা নয়—সে যেন খোদাই-করা পাথরের মূর্তি।

বিহ্বল স্বরে সুবোধ বললে, শেষ হয়ে গিয়েছে কি বলছেন, সুভদ্রা দেবী? আপনার এই অবস্থা নিয়ে এখন আপনি কি করবেন?

উত্তরে সুভদ্রা বললে, সে ভাবনা আমার, আপনার নয়।

সুবোধের মুখের উপর হঠাৎ যেন সপাং ক'রে চাবুকের একটা ঘা এসে লাগল। তথাপি অনুনয়ের স্বরেই সে আবার বললে, আমায় বিশ্বাস করুন সুভদ্রা দেবী—আমার বা আপনার কথা আমি ভাবছি নে। ভাবছি কেবল আপনার সন্তানের কথা। লক্ষ জনের জিজ্ঞাসার উত্তরে পিতার পরিচয় যদি সে না দিতে পারে তবে কিসের জোরে জগতে সে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে?

তার নিজের যোগ্যতার জোরে।—সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, লোকের কাছে সে পরিচয় দেবে তার মনুষ্যত্বের অবিসংবাদিত পরিচয়ে। ছাপের পরিচয় নেই ব'লেই তার সহজ আর স্বোপার্জিত পরিচয় থেকে তাকে বঞ্চিত করবে, জগতে এমন সাধ্য কারও আছে নাকি?

সুবোধ বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। এ যেন আর এক সুভদ্রা কথা বলছে। মুখের ভাব বা কথার স্বরে দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কুণ্ঠা নেই, উত্তেজনাও নেই;—একটা অবিচলিত সংযম, একটা শান্ত সমাহিত ভাব সেই কৃশ পাণ্ডুর মুখখানিকে কেমন যেন একটা অনৈসর্গিক দীপ্ত মাধুর্যে মণ্ডিত ক'রে দিয়েছে।

একটি নিশ্বাস ফেলে সুবোধ উঠে দাঁড়াল; বললে, বেশ, তাই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, তবে আর কি বলব আমি! আমি তা হ'লে এখন যাই।

সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, যাবেন আপনি?

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে সুবোধ; কুণ্ঠিত, প্রায় অস্ফুট স্বরে সে বললে, হ্যাঁ, যাই; থেকে আপনার কোন উপকারই তো করতে পারব না আমি।

কয়েক সেকেণ্ড কাল সেই আনত মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর নিঃশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে সুভদ্রা সোজা হয়ে বসল ; তার পর সে বললে, আমার জন্য আপনি অত ভাববেন না, সুবোধবাবু। এক দিন আপনাকে তো আমি বলেছিলাম যে, আমার শক্তি, সম্বল, সান্ত্বনা, সব আমার নিজের মধ্যেই আছে। সে সবই আমার এই সন্তান। কালকের অত বড় দুর্ঘটনার পরেও সে যখন আমার নাড়ী আঁকড়ে আমাকেই আশ্রয় ক'রে বেঁচে রয়েছে, তখন আর আমার কোন ভাবনা নেই ! ভবিষ্যতে আমার ওই সন্তান একাই আমায় রক্ষা করতে পারবে।

উত্তর না দিয়েই সুবোধ দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। কমলার ডাকে সাড়া দেওয়া দূরে থাক্, তার মুখের দিকেও একবার সে চেয়ে দেখলে না।

আগের দিনের দুর্ঘটনার পর সুবোধের প্রস্তাবটা এসেছিল আর একটা মারাত্মক আঘাতের মত। কিন্তু সেটাও কাটিয়ে উঠে সুভদ্রা নিঃসংশয়ে অনুভব করলে যে, পর পর দুটি শক্ত আঘাতের ভিতর দিয়েই যেন বহু দিন পর সে তার বহুবাঞ্ছিত মুক্তি পেয়েছে। গোপনতা থেকে যে দুর্বলতার উদ্ভব, গোপনতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তারও অবসান হয়ে গেল। ভিতরে সঙ্কোচ আর লজ্জার বন্ধনের মধ্যে যে সঙ্কল্প এত দিন পঙ্গু হয়ে ছিল, তা ছাড়া পেয়ে এক নিমেষেই যেন তার মন আর দেহকে এক অনৈসর্গিক শক্তিতে সঞ্জীবিত ক'রে তুললে।

কেবল অরুণাংশুর নাম আর শেষের দিনে প্রতুলবাবুর বাড়ির ঘটনাটিকে বাদ দিয়ে আর সকল কথাই কমলাকে সে নিঃসঙ্কোচে খুলে বললে। উপসংহারে অল্প একটু হেসে সে বললে, মিথ্যাচারের বিড়ম্বনা এত দিন জীবনটাকে আমার বিষিয়ে তুলেছিল ; আজ তোমার কাছে সব কথা খুলে ব'লে আমি বেঁচে গেলাম ভাই। এর পর জগতের কাউকেই আর আমার ভয় ক'রে চলতে হবে না।

কিন্তু কমলা তার হাসিতে যোগ দিলে না ; গম্ভীর স্বরে বললে, সে লোকটির নাম আর ঠিকানা এক খানা কাগজে আমায় লিখে দাও তো !

সুভদ্রা শঙ্কিত স্বরে বললে, সে আবার কিসের জন্য ?

আগে লিখে দাও তো তুমি, কারণটা পরে শুনো।

রক্ষা কর।—শঙ্কিত মুখে লঘু পরিহাসের একটা আভাস ফুটিয়ে তুলে সুভদ্রা হাত জোড় ক'রে বললে, ওই দুটি জিনিস তোমায় দিতে পারব না, কমলা। যার কোন দোষ নেই, দায়িত্ব নেই, তাকেই তুমি যে ভাবে আক্রমণ করেছিলে, তা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আসল মানুষটির খোঁজ পেলে তুমি হয়তো তাকে কেবল নখ আর দাঁত দিয়েই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়বে। আমি, ভাই, সে রক্তারক্তি ব্যাপার চোখে দেখতে পারব না।

কমলা কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে বললে, না, সুভদ্রা,—এ ঠাট্টার কথা নয়। তার নাম আর ঠিকানা আমায় দাও,—ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে হবে।

এরও উত্তরে সুভদ্রা তামাশা ক'রেই কথাটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কমলাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে অবশেষে সে-ও গম্ভীর হয়েই বললে, না, কমলা; ওসব হাঙ্গামের কোনই দরকার নেই।

কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে উদ্ধত স্বরে বললে, কেন নেই, শুনি?

সুভদ্রা উদাসীনের মত উত্তর দিলে, কি হবে এ সব হাঙ্গাম ক'রে?

কমলা বললে, তার কাছ থেকে তোমার ন্যায্য অধিকার তোমায় আমি আদায় ক'রে দেব।

দাবি করবার মত কোন ন্যায্য অধিকার আমার নেই।—বলতে বলতে সুভদ্রা মুখ নামিয়ে নিলে।

শুনে কিছুক্ষণ কমলার মুখে যেন কোন কথাই ফুটল না; কিন্তু তার পর ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে ডাকলে, সুভদ্রা!

সুভদ্রা চমকে মুখ তুলে তাকাল; কিন্তু শান্ত গম্ভীর স্বরেই সে উত্তর দিলে, কেন মিছামিছি জিদ করছ, কমলা? তুমি যা ভেবেছ তা হবে না। আমার প্রতি ভালবাসাই যার শেষ হয়ে গিয়েছে, তারই দুয়ারে গিয়ে কাঙালিনীর মত আমি হাত পেতে দাঁড়াতে পারব না।

হাত পেতে দাঁড়াবি কেন?—কমলা অসহিষ্ণুর মত বললে তুই যাবি তোর অধিকারের দাবি নিয়ে।

অল্প একটু হেসে সুভদ্রা উত্তর দিলে, অধিকার ছাড়া যে দাবি, তারই আসল নাম ভিক্ষে।

কমলা আরও বিরক্ত হয়ে বললে, কি যা-তা বলছিস তুই? মেয়েমানুষ হয়ে এত খানি যাকে তুই দিয়েছিস, তার কাছে তোর কোন অধিকার নেই?

সুভদ্রা শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, দেওয়াটা আমার এক তরফা হয় নি, কমলা; দানের প্রতিদানে যা আমি পেয়েছি, তাতেই আমার দেওয়ার দাম শোধ হয়ে গিয়েছে।

শোধ হয়ে গিয়েছে?—বলতে বলতে কমলা উদ্ধত ভাবে সুভদ্রার প্রায় মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গেল, কিসে শোধ হয়েছে? কি পেয়েছিস তুই? এই কলঙ্ক? ছিঃ ছিঃ সুভদ্রা, ভুলিয়ে ভালিয়ে যে কাপুরুষ তোর এত বড় সর্বনাশ ক'রে তার পর পিট্টান দিয়েছে, তাকে ছেড়ে দিবি তুই?

সুভদ্রা মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, না, কমলা; ভুলিয়ে কেউ আমার সর্বনাশ করে নি। যে মেয়েদের ভুলিয়ে তাদের সব চেয়ে বড় সম্পদ কেড়ে নেওয়া যায়, সে জাতের মেয়ে সুভদ্রা নয়।

আবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত কমলার মুখে কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু সুভদ্রার আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে তার ঠোঁটের কোণে হাসির কয়েকটি রেখা ঝিলিক্ দিয়ে ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার চিবুক টিপে ধ'রে সে কৌতুকের স্বরে বললে, বড় বেশি অভিমান হয়েছে, না?

ধেৎ!—ব'লে সুভদ্রা কমলার হাতখানাকে দূরে সরিয়ে দিলে। তার কানের কাছটা অল্প একটু লালও হয়ে উঠল।

কিন্তু উত্তরে কমলা আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বললে, 'ধেৎ' কেন বলছিস? আমি কি কচি খুকী? তা অভিমানে অন্ধ হয়ে নিজে যদি তুই পথে বসতে চাস, না হয় বসিস। কিন্তু পেটের সন্তানকেও ভিখারী ক'রে পথে বসাবি তুই কোন্ অধিকারে?

পথে কেন বসবে?—সুভদ্রা হেসে ফেলে বললে, তার মায়ের কোল নেই নাকি?

কমলা আবার গম্ভীর হয়ে গেল; বললে, তামাশা নয়, সুভদ্রা; এ যে গুরুতর ব্যাপার।

সুভদ্রাও গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলে, আমিও তামাশা করি নি, মনের কথাই বলেছি। তা আমার বিশ্বাসের কথা, আমার সিদ্ধান্ত।

কমলা বিহ্বল স্বরে বললে, সেটা কি?

আমার সন্তানের জন্তও কোথাও কারও কাছেই আমায় যেতে হবে না।

কমলা আবার রাগ ক'রে বললে, বেশ, তুই চুলোয় যাস। কিন্তু তোর সন্তানকে তার বাপের কাছে যেতে হবে না?

না, হবে না।—সুভদ্রা মাথা নেড়ে দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, আমার সন্তান আমারই সন্তান হবে। সে ভিক্ষেও করবে না, উৎপাতও করবে না। আকাশের চাঁদের জন্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে চীৎকার ক'রে সে কাঁদবেও না, কোজাগরীর রাতে ধূমকেতুর মত আকাশে গিয়ে চাঁদ আর নক্ষত্রের অমন আসরটাকে সে মাটিও ক'রে দেবে না।

কমলার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে বিহ্বল স্বরে বললে, এ সব তুই কি বলছিস, সুভদ্রা!

সুভদ্রা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, খুব সোজা কথা। যে প্রেম ছুটি পেয়ে আর ছুটি দিয়ে এগিয়ে চ'লে গিয়েছে, তাকেই লোহার শিকল দিয়ে বাঁধাটা একটা খুব বড় কাজ নাকি! মায়ের হাতের শিকল হবার দুর্ভোগ থেকে আমার সন্তানকে আমি বাঁচাতে চাই।

কমলা আবার বিরক্ত হয়ে বললে, এ সব রূপক আর হেঁয়ালি এখন রাখ্ তুই। সোজা ক'রে বল্ তো তোর মতলবটা কি?

সুভদ্রা হেসেই উত্তর দিলে, তা তো আগেই তোমায় বলেছি। আমি তার কাছে কিছুই চাইতে যাব না, নিজের জন্ত তো নয়ই, সন্তানের জন্তও নয়।

কমলা এবার তার কৌশল বদলে দিলে, খপ ক'রে সুভদ্রার ডান হাতখানা চেপে ধ'রে অনুনয়ের স্বরে বললে, সুভদ্রা, দিদি আমার, অবুঝ হ'য়ো না। পিতার কাছে সন্তানের পাওনা যে অনেক। তার সব কিছু থেকে তোমার সন্তানকে তুমি বঞ্চিত করবে?

সুভদ্রা কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ করলে না; ধীরে ধীরে নিজের হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর স্বরে সে বললে, যে জিনিসের দরকার নেই, তা না পাওয়াকে বঞ্চিত হওয়া বলে না।

দরকার নেই কি বলছিস তুই?—কমলা বিহ্বল স্বরে বললে, পিতৃপরিচয়ের সম্ভ্রম না পেলে কি সন্তানের চলে?

চলে।—সুভদ্রা মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, নিজে যদি সে অপদার্থ না হয়, তবে তার পিতার পরিচয়ের কোন দরকার হয় না। আর নিজেই যদি সে অপদার্থ হয়, তবে পিতার পরিচয়েও তার কোন লাভ হয় না।

কিন্তু পিতার অর্থ? তারও কি দরকার নেই?

কি দরকার!—কত পিতারই তো অর্থ থাকে না।

কমলা নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রা অল্প একটু হেসে আবার বললে, অবাক কেন হচ্ছ, কমলা? এ তো খুব সোজা কথা। পিতার নাম আর অর্থই কোন সন্তানকে বড় করতে পারে না। মানুষ বড় হয় তার নিজের ক্ষমতায়।

কমলা তার স্তব্ধ ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যই যেন একটু ন'ড়ে চ'ড়ে সোজা হয়ে বসল; তার পর সে বললে, মানলাম হয়। কিন্তু কেবল টাকা-পয়সা আর সম্ভ্রমের কথাই তুই ভাবছিস কেন? এ দুটি জিনিস ছাড়াও পিতার কাছ থেকে সন্তান আরও কত অমূল্য জিনিস পেয়ে থাকে। স্নেহ মমতা—এ সব জিনিসের দরকার নেই তার?

ও সেই কথা!—ব'লে সুভদ্রা কুণ্ঠিতের মত মুখ নামিয়ে নিলে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই আবার সে মুখ তুলে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, ও সব জিনিসও অপরিহার্য নয়, কমলা। বাপের যে দানটা সন্তানের কিছুতেই না পেলেই চলে না আর যা সে ছাড়তে চাইলেও কিছুতেই ছাড়তেও পারে না, দেহ-গঠনের সেই অপরিহার্য উপাদান আমার সন্তান এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছে। বাকি যে সব জিনিসের কথা তুমি বলছ, বাপের কাছ থেকে তা না পেলেও সন্তানের বেশ চ'লে যায়, আমার নিজেরও তো চলেছে। বলতে বলতে ঘাড় নেড়ে মুখ টিপে একটু সে হেসেও নিলে।

কিন্তু ওই হাসি দেখেই কমলা হঠাৎ আগুনের মত জ্ব'লে উঠল।—চলেছে,

না তোমার মাথা হয়েছে!—ভ্রূভঙ্গী ক'রে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, অমন বন্ধু জীবনে তুমি পাও নি ব'লেই না আজ তোমার এই দুর্গতি,—মানুষ হতে হতে রাক্ষুসী হয়ে উঠেছ।

বলতে বলতে উত্তেজনার আতিশয্যে কমলা উঠেই দাঁড়াল; একটু স'রে গিয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, ছিঃ ছিঃ, এই সব কথা মুখে আনতে পার তুমি? জিভ তোমার খ'সে পড়ে না! ধিক্ তোমাকে। তোমার মত মেয়ের, তোমার মত মায়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়।—বলতে বলতে দুম দুম ক'রে পা ফেলে ঘর ছেড়েই চ'লে গেল সে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে একেবারে সুভদ্রার গা ঘেঁষে সে তার বিছানার উপরেই ব'সে পড়ল।

ইতিমধ্যে সুভদ্রা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সে চমকে উঠল। ম্লান মুখে অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে সে বললে, ফিরে এলে যে বড়, পাপ হবে না?

হবেই তো।—কমলা ঝাঁজের স্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু এ আমার কর্মভোগ,—তুমি যখন আমার বন্ধু!

বেশ তো।—বলতে বলতে সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে, বন্ধুত্ব ভেঙে দাও না কেন! তা হ'লেই তো কর্মফল কেটে যাবে।

তা তো যাবেই।—কমলা উত্তরে বললে, আর দরকার হ'লে বন্ধুত্বও আমি ভাঙব। কিন্তু তার আগে তোমার পাগলামিটা ভাঙবার জন্য আর একবার চেষ্টা করতে চাই।

সুভদ্রা যেন ভয় পেয়ে দূরে স'রে গেল; রীতিমত হাত জোড় ক'রেই সে বললে, দোহাই তোমার, যে অনুরোধ আমি রাখতে পারি নি, দয়া ক'রে আর যেন সে অনুরোধ ক'রো না।

কমলা বিরক্ত হয়ে বললে, আবার সেই একগুঁয়েমি করছিস! তুই মানুষ, না কি?

মুখখানি হাসবার মত ক'রে সুভদ্রা উত্তর দিলে, অতি-মানুষ, আর তা যদি না মান তো অমানুষ।

কিন্তু কমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, না শুভা, এ হাসির কথা নয়; সত্যি বল্ তো আমাকে, ওই পাপিষ্ঠটাকে তুই বাঁচাতে চাচ্ছিস কেন?

সে যে সত্যি পাপিষ্ঠ সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারি নি, তাই।—ব'লে সুভদ্রা আবার টিপে টিপে হাসতে লাগল।

স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর কমলা বিহ্বল স্বরে বললে, তুই আমায় অবাক করলি, সুভদ্রা। তোর মনের আসল কথাটা কি তা আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস?

আগের মতই টিপে টিপে হাসতে হাসতে সুভদ্রা উত্তর দিলে, আমিই কি বুঝেছি ছাই যে, তোমায় বুঝিয়ে বলব! নিজেকে বোঝা কি অত সোজা? ছেলেবেলায় আশ্রমের স্বামীজীদের মুখে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনতাম; তাঁরা বার বার বলতেন, আত্মানং বিদ্ধি,—নিজেকে বোঝ। এই বোঝাটা নাকি এত শক্ত যে, এরই জন্য মানুষকে জন্ম জন্ম তপস্যা করতে হয়। অথচ তুমি মৌখিক পরীক্ষার পরীক্ষকের মত প্রশ্ন ক'রেই আমার কাছ থেকে উত্তর প্রত্যাশা করছ! কেমন ক'রে উত্তর দেব, বল তো?

কমলা আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর হঠাৎ শাড়ির আঁচলটাকে গলায় জড়িয়ে দুই হাত জোড় ক'রে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, গুরুদেব, আপনার শাস্ত্রব্যাখ্যা এখন বন্ধ করুন। আমার ঘাট হয়েছে, স্বীকার করছি। আর কোন দিন কোন কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব না আমি। শুধু দয়া ক'রে এইটুকু আমায় বলুন যে, এটা যখন হাসপাতালের ভাড়া-করা কেবিন আর ভাড়া জুগিয়ে গেলেই এটাকে আশ্রমে পরিণত করবার অনুমতি পাওয়া যাবে না, তখন এখান থেকে বিতাড়িত হবার পর আপনার ওই কালামুখ নিয়ে কোথায় গিয়ে আস্তানা পাতবার ইচ্ছা করেন?

এবার সুভদ্রা আর হাসলে না। চিন্তিত গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর কুণ্ঠিত স্বরেই সে বললে, এই কথাটাই আমিও ভাবছিলাম, কমলা। সত্যি, তোমাদের মেসে আর হয়তো আমার জায়গা হবে না, হ'লেও এই কালামুখ নিয়ে সেখানে যাবার ইচ্ছেও নেই আমার। কিন্তু কোথায় যাই, বল তো?

কেন, তোমার আশ্রমে ফিরে যাবে না?—কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, সেদিন যে বললে, সেখান থেকে তোমার জন্য চতুর্দোলা আসছে!

সুভদ্রা উত্তর দিলে না, তার নত মুখখানি আরও যেন নত হয়ে পড়ল।

সেই মুখের দিকে চেয়ে কমলা আবার ধমক দিয়ে বললে, চুপ ক'রে রইলি যে? এখানে বেশি দিন আর থাকা চলবে না। কলকাতায় আলাদা একটা বাসা পেলে থাকবি সেখানে?

মুখ না তুলেই কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে সুভদ্রা বললে, থাকব।

তার পর মুখ তুলে, অল্প একটু হেসে বিষণ্ণ স্বরে সে আবার বললে, আলাদা একটি বাসাই আমার চাই। কিন্তু ভাই, এই শরীর নিয়ে বাড়ি তো আমি নিজে খুঁজতে পারব না।

তা আমি জানি।—কমলা উত্তরে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, ও কাজও আমাকেই যে করতে হবে তাও আমার কর্মে লেখা আছে।

শুধু এইটুকুই।—সুভদ্রা অপরাধীর মত বললে। কিন্তু তার পরেই আগের মত একটু হেসে আবার সে বললে, শুধু এইটুকু ক'রে দিলেই তোমার কর্মভোগ শেষ হবে, কমলা। তার পর আমার এই কালামুখ আর তোমায় দেখতে হবে না।

না দেখতে হ'লেই বাঁচি।—ব'লে কমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার পর বাইরেই চ'লে গেল সে।

দিন দুই পর কমলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকেই উৎসাহের স্বরে বললে, আর ভাবনা নেই, সুভদ্রা। বেশ ভাল বাড়ি পেয়ে গিয়েছি। একেবারে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের উপরেই, এখান থেকে মিনিট দশেকের মোটে পথ।

সত্যি?—সুভদ্রার গলার আওয়াজে অবিশ্বাস বেজে উঠল।

কিন্তু কমলা উৎফুল্ল স্বরেই উত্তর দিলে, সত্যি লো, সত্যি। বেশ ভাল বাড়ি পেয়েছি, বড় রাস্তা থেকে খুব দূরেও নয়, অথচ ছোট সরু নির্জন গলির উপর। নূতন বাড়ির ফ্ল্যাট;—বেশ বড় বড় তিনখানা ঘর। অথচ ভাড়াও তেমন বেশি নয়, মাত্র চল্লিশ টাকা।

কিন্তু সুভদ্রা বিব্রতের মত বললে, চল্লিশ তো কম নয়, কমলা! অত ভাড়া আমি দেব কোথা থেকে?

কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে কমলা উত্তর দিলে, ভাড়া ভাগ হয়ে গেলে এক জনের ঘাড়ে খুব বেশি পড়বে না।

তথাপি সুভদ্রা বিহ্বলের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে কমলা হেসে ফেলে আবার বললে, তোমার কোন ভয় নেই, সুভদ্রা; তোমার সেই ভদ্রবেশী বর্বরটির জন্য আমি ঘর ভাড়া নিই নি। ও বাড়িতে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে থাকব।

সুভদ্রা চমকে উঠে বললে, কেন, কমলা ?

মেসের জীবন আর ভাল লাগে না আমার।—কমলা এবার কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আগেও তো বলেছি তোমাকে। অনেক বয়স হ'ল তো, এখন একটু নিরিবিলি চাই—একটু শান্তি। তোমার জন্য বাড়ি খুঁজতে গিয়ে লোভটা আমার এত প্রবল হয়ে উঠল যে, ওকে আর সামলাতে পারলাম না।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না। সংবাদটি শুভ; কিন্তু এত শুভ যে একেবারে অবিশ্বাস্য। এমনটি সে প্রত্যাশা করে নি। তথাপি দু দিন পরেই কমলার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

সত্যই রাজপ্রাসাদের মত বাড়িতে বেশ বড় একটি ফ্ল্যাট, সত্যই বড় বড় তিনখানি ঘর। আয়োজনও নিতান্ত অল্প হয় নি। মেসে তাদের দুজনের যে সব জিনিস ছিল তা তো এসেইছে; তার উপরেও বাজার থেকে নূতন জিনিস এসেছে বিস্তর। আসবাব এসেছে, ছবি এসেছে, ঘরকরনার ছোটখাটো কত সব সরঞ্জাম এসেছে, ফুলদানি এসেছে, এমন কি, ফুলের চারাসহ টব পর্যন্ত এসেছে চার-পাঁচটি। ভিতরে ঢুকতেই এই সব স্তূপাকৃতি সরঞ্জাম সুভদ্রার চোখে প'ড়ে গেল। কমলা অসীম উৎসাহের সঙ্গে এক এক ক'রে সব কটি জিনিস এবং সবগুলি ঘর সুভদ্রাকে দেখালে; নূতন জিনিসগুলির মধ্যে কোন্‌টি সে কোথা থেকে কিনেছে আর কত সস্তায় কিনেছে তা সগর্বে সে বর্ণনা ক'রে শোনালে; তার পর চাকরকে চায়ের জল চাপাবার হুকুম দিয়ে সুভদ্রাকে নিয়ে সে ঘরের ভিতর গিয়ে বসল।

সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে বললে, এখানা তোমার ঘর, এই ঘরে তোমায় কয়েদ থাকতে হবে, যত দিন আবার হাসপাতালে যাবার ডাক না পড়ে—এ আমার হুকুম। জান তো, আমি পাস-করা নার্স আর ধাত্রী।

কিন্তু সুভদ্রা ওই হাসিতে যোগ দিলে না; কমলার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে সে বললে, আমার জন্য এ সব তুমি কেন করলে, কমলা?

কুণ্ঠিত ভাবে এক বার চোখ নামিয়েও পরক্ষণেই আবার চোখ তুলে কমলা হেসেই ফেললে; ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, ইস্—মেয়ের কথা শোন! ওর জন্য করেছি!—উনি যেন আমার—

তবে কেন এ সব করতে গেলে তুমি? কেন এত টাকা খরচ করলে?

আমার খুশি। করেছি আমার নিজের জন্য। চিরটা কাল মেসেই কাটাব নাকি?

একটু থেমে গম্ভীর স্বরে কমলা আবার বললে, সত্যি বলছি, বাসা করবার ইচ্ছে গোড়া থেকেই আমার ছিল। তুমি তো হ'লে তার উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি এখানে না-ও যদি থাক, তবু আমার এ বাসা আমারই থাকবে।

পরদিন সকালে সুভদ্রার ঘুম যখন ভাঙল, তখন বেলা হয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে অনেকখানি রোদ ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। কমলার গলার আওয়াজও শুনতে পেলে সে। আর ওরই সঙ্গে জলের ছপ্ ছপ্, ঝাঁটার সপ্ সপ্ আর নানা রকম ভারী জিনিসের ওঠাপড়ার শব্দ। দোর খুলতেই তার চোখে পড়ল—কমলা সংসারের কাজে লেগে গিয়েছে। ভারি ব্যস্ত সে; চাকরটাকে সে খাটিয়ে মারছে, নিজে খাটছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তার আঁচলের খানিকটা গিয়েছে ভিজে; বুকের কাছে কাদা লেগেছে; মাথার চুলে অনেকখানি ঝুল জড়িয়ে গিয়েছে; কিন্তু সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের হাতের রচনাকেই বার বার ভেঙে নূতন ক'রে সে রচনা করছে, ক্লান্তিও নেই, তৃপ্তিও নেই। কখনও ব'কে, কখনও হেসে, কখনও বা গুন গুন ক'রে কোন একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ছেলেমানুষের মত অধীর আগ্রহে সে যেন কাজের খেলায় মেতে উঠেছে।

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, এ কি, কমলা—এ কি করছ তুমি?

কমলা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে, ঠাকুরসেবা।

কি?

সুভদ্রার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েই কমলা হেসে ফেললে; বললে, ওই

দেখ—কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি। রবি ঠাকুরের গান গাচ্ছিলাম, অমনি মুখে এসে গেল ঠাকুরসেবা।

সুভদ্রা আরও কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর তার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এ তোমার ভাই ভারি অন্যায়। একা একা এই সব কাজ করছ, কেন—আমায় ডাকলে না কেন? সর—আমি কাজ করছি। দাও—ঝাঁটাটা আমায় দাও।

ঝাঁটা নয়।—কমলা হাতের ঝাটাটাই উঁচু ক'রে বললে, তোমায় দেব ঝাঁটার বাড়ি। সর শীগগির; যাও—স্নানের ঘরে গিয়ে মুখহাত ধোওগে। এ সব কাজ তোমায় করতে হবে না।

সুভদ্রা বিব্রত হয়ে বললে, ওমা, সে কি কথা! তুমি একা সব কাজ করবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখব নাকি?

তা না তো কি!—কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে উত্তর দিলে, তুমি হ'লে গিয়ে আমার অতিথি। তোমার সব কাজ তো আমাকেই করতে হবে।

মুখ ভার ক'রে সুভদ্রা বললে, না ভাই, এ রকম করলে এখান থেকে আমায় চ'লে যেতে হবে। ছিঃ ছিঃ—আমার জন্য কিনা কাজ করবে তুমি!

শোন কথা!—কমলা অপ্রতিভের মত বললে, তোমার সঙ্গে কি একটু তামাসা করবারও উপায় নেই! তোমার জন্য কাজ করব কেন? আমি কাজ করছি আমার নিজের জন্য।

একটু থেমে সে হেসে ফেলে আবার বললে, এ যে আমার ঘর, সুভদ্রা—আমার সংসার। কত দিন পর পেয়েছি, ভেবে দেখ তো! বিধাতার হাতের আগুন লেগে ঘর আমার পুড়ে গেল,—সে প্রায় এক যুগের কথা। তার পর হয় মিশন, নয় হাসপাতাল, নয় মেস। এত দিন পর নিজস্ব একটা ঘর যদি হয়েছে, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করতে হবে না?

সুভদ্রা কমলার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললে, তবে আমাকেও তাই করতে হবে—এ তো আমারও ঘর। দাও—ঝাঁটা আমায় দাও।

কিন্তু হাতের ঝাঁটাগাছটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কমলা; সুভদ্রার হাত চেপে ধ'রে বললে, না, দিদি,—তোমায় এখন কিছুই করতে হবে না, আমার কথা শোন। তুমি নিজেও তো নার্স,—তুমি নিজেই জান এ রকম শরীর

নিয়ে পরিশ্রমের কাজ করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে। কেবল নিজের বিপদ নয়, যার আসবার কথা আছে, তারও।

যাও।—সুভদ্রা লজ্জিত ভাবে চোখ নামিয়ে বললে, কিচ্ছু হবে না আমার। আমি কাজ করব।

কিন্তু সুভদ্রা তার হাতখানি টেনে ছাড়িয়ে নিতেই কমলার চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল। ভুরু বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, এমনি ক'রেই একটা সঙ্কট ডেকে এনে পেটের আপদটাকে তুমি বুঝি বিদায় করবার মতলব করেছ? কিন্তু আমি বলছি, আমি থাকতে তা হতে দেব না।

সুভদ্রার আরক্ত মুখখানি চক্ষের নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল। বজ্রাহতের মত কমলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ঘরের ভিতর ছুটে গিয়ে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিলে।

কমলার মুখখানিও ম্লান হয়ে গেল। অপ্রতিভের মত কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে পরে ধীরে ধীরে সুভদ্রার ঘরের কাছে গিয়ে সে অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে ডাকলে, সুভদ্রা, রাগ করলে, সুভদ্রা?

উত্তর না পেয়ে নিজেই সে দোর ঠেলে ভিতরে চ'লে গেল। দেখলে, মেঘের মত মুখ ক'রে সুভদ্রা খাটের উপর ব'সে রয়েছে। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে আবার বললে, আমার মাথাটাই কেমন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছে, কি বলতে কি যে ব'লে ফেলি তার ঠিক থাকে না। অন্যায় যদি হয়ে থাকে, তুমি আমায় মাফ কর ভাই।

সুভদ্রা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলে, না ভাই, তোমার কোন অন্যায় হয় নি।

কমলা এবার তার কাছে খাটের উপর ব'সে পড়ল; তার একখানা হাত কোলের উপর টেনে এনে কোমল স্বরে সে বললে, তুমি নিজেই তো জান, সুভদ্রা, মেয়েদের এ যে একটা নিদারুণ সঙ্কটের অবস্থা। নিজের জীবনের রস বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে আর একটা জীবন তাকে গ'ড়ে তুলতে হয়। সেই দায় আছে ব'লেই তো এ সময়ে মেয়েদের দাবিও বেশি। বাইরে থেকে নিজের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে না নিলে আর একজনের দাবি তুমি মিটাবে কি দিয়ে?

উত্তরে সুভদ্রা মৃদু স্বরে বললে, তুমি কিছু ভেবো না, কমলা ; যার জন্য নিজের সকল সাধ আকাঙ্ক্ষাকে আমি বিসর্জন দিলাম, আমার সেই পরম ধনকে কিছুতেই আমি নষ্ট হতে দেব না। আপদ মনে করলে অনেক আগেই তাকে আমি বিদায় করতে পারতাম।

কিন্তু তার পরেই উদ্ধত ভাবে কমলার মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে আবার বললে, কিন্তু, কমলা, তুমি তাকে সইতে পারবে তো? বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে তোমাদের ভদ্র সমাজের বুকের উপরে যাকে আমি আবাহন ক'রে নিয়ে আসব, ললাটে কলঙ্কের পঙ্কতিলক পরা নামহীন, গোত্রহীন, মাতৃপরিচয়লজ্জ আমার সেই জারজ সন্তানকে দেখে ঘৃণায় তোমার ভুরু দুটো কুঁচকে যাবে না তো?

শুনে কিছুক্ষণের জন্য কমলা যেন হতভম্ব হয়ে গেলে ; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েই সে-ও দৃপ্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, এ তুই কি বলছিস, সুভদ্রা? যীশুখ্রীষ্টের পূজো করি আমি,—আমি ঘৃণা করব শিশুকে? আমার রাগ করতে হয় তোর উপর করব ; ঘৃণা করতে হয় তা-ও তোকেই করব। তোর ভুল-চুকের জন্য অবোধ শিশুকে আমি ঘৃণা করতে যাব কেন? সে বরং আসবে আমার পূজোর ঠাকুর হয়ে। তাইতেই না আমার এত আয়োজন! নইলে কি দরকার ছিল আমার এই ঘর-বাড়ির?

সুভদ্রা বোধ করি এ রকম উত্তর শুনবার আশা করে নি ; তাই স্তব্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কমলার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

কমলা প্রথমে চমকে উঠল ; তার পর সুভদ্রার মাথাটাকে সাগ্রহে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে বললে, ছিঃ, সুভদ্রা,—এ কি ছেলেমানুষি তোমার! এ সব উদ্ভট ভাবনা এখন ছাড়। বাজে ব'কে আমাকেও মিছামিছি বকিয়ে মেরো না। ঘোরালো কথা আমি তো কিছুই বলি নি! শুধু বলেছি, কাজ তোমার শরীরে সইবে না, এখন কিছু দিন তোমায় বিশ্রাম করতে হবে।

কমলার মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে উত্তর দিলে সুভদ্রা, বেশ, তাই করব। কিন্তু ভাবছি যে, এত যে তোমার কাছ থেকে আমি নেব, তার পর এ ঋণ আমি শোধ দেব কেমন ক'রে?

প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্যে কমলার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সুভদ্রার হাতখানা আবার নিজের কোলের উপর টেনে এনে কোমল স্বরে সে বললে, সে জন্য তোমায় একটুও ভাবতে হবে না। আগে তুমি দায়মুক্ত হও,—খোকা আগে আসুক। তার পর আমার নিজের পাওনাটা নিজেই আমি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নেব। এখন ওঠ তো, দিদি, মুখ-হাতটা আগে ধুয়ে এস। তোমার জন্য আমারও যে চা খাওয়া বাকি র'য়ে গিয়েছে।

কিন্তু স্নানের ঘরে গিয়েও সুভদ্রা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা ঘ'টে গেল তা তার কাছে এক বিরাট বিস্ময়। কোমর বেঁধে নিজে সে অকূল সাগরে ভাসবার উপক্রম করেছিল। শক্তি যা ছিল তা নৈরাশ্যের। অথচ ঝাঁপ দেবার মুখেই তার আশ্রয় জুটে গেল। কেবল আশ্রয় নয়, আশ্বাসও;—তারই সঙ্গে আবার স্নেহ এবং শ্রদ্ধা। তার মনে হতে লাগল যে, যে জীবনের আস্বাদ সে পেয়েছে, তা সর্বতোভাবেই অভিনব। মিথ্যাচারের মুখোশ প'রে আর তাকে সসঙ্কোচে পা টিপে টিপে চলতে হবে না, কমলার কাছে সকল কথা খুলে ব'লে সে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। গোপনতার লৌহবন্ধনের মধ্যে এত দিন যা সহজ প্রবাহে চলবার পথ পায় নি, উচ্ছল সেই বাৎসল্য রস সংশয় আর সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙে তর্‌তর্ ক'রে ছুটতে শুরু করেছে। কুণ্ঠিত মাতৃত্বের মূর্ছিত মর্যাদা সশ্রদ্ধ স্বীকৃতির সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে উন্নত মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। ভবিষ্যৎ আর বিভীষিকা নেই,—অন্ধকারের বুকের উপরেও রঙে রঙিন ও রসে সরস অফুরন্ত সম্ভাবনার সাদর ও উদার নিমন্ত্রণ আলোর অক্ষরে ফুটে উঠেছে। বাইরের নিষ্ঠুর কুৎসিত জগৎটা আছে কি নেই, এ কথা এক বার মনেও পড়ে না। কলকাতার স্বল্প-পরিচিত একটি গলির উপর এই যে চারদিকে দেয়াল-ঘেরা সঙ্কীর্ণপরিসর একটি ফ্ল্যাটবাড়ি,—মহাসাগরের বুকের উপরকার ক্ষুদ্র দ্বীপখণ্ডের মতই এ যেন তার নিজস্ব এক স্বতন্ত্র জগৎ,—স্বয়ংসম্পূর্ণ অপরূপ এক সব-পেয়েছির দেশ। এখানে তার কুণ্ঠা নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই, আশঙ্কাও নেই; আছে কেবল অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির একটা উদ্দাম উল্লাস, একটা অখণ্ড বিশ্রাম, আর ওরই সঙ্গে একটা সানন্দ ও সকৌতূহল প্রতীক্ষা।

এ যে কল্পনা নয়—সত্য, তাই নিঃসংশয়ে অনুভব ক'রে আবার সুভদ্রার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল।

৬

সেই আর এক দিনের মতই সুবোধ সুভদ্রার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিল। সেই আর এক দিনের মতই সে বাইরে এসেও স্বস্তি পেলে না। লজ্জায় সারা শরীরটা তার রি-রি করতে লাগল, ভিতরে সঙ্কোচে মনটা তার ছোট হয়ে গেল। সেই আর এক দিনের মতই অমার্জনীয় একটা অপরাধের অনুভূতি বিষের মত তার চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। বারান্দায় কমলার মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। পথে এসেও সম্পূর্ণ অপরিচিত রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গেও সে মুখ খুলে দরদস্তুর করতে পারলে না। ক্লিষ্ট মন আর অবসন্ন দেহ নিয়ে গাড়িতে উঠেই চোখ বুজে ওইটুকু জায়গার মধ্যেই শরীরটাকে সে এলিয়ে দিলে।

কিন্তু এ ভাবটা তার বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। হাওড়া স্টেশনে এক পেয়ালা চা খেয়ে গাড়িতে গিয়ে বসবার পর শরীরটাকে তার বরং হালকাই লাগল। তার মনে হতে লাগল যে, যে কথাটা সুভদ্রাকে বলবার জন্য এত দিন তার আগ্রহের অন্ত ছিল না, অথচ মুখ ফুটে বলতে না পারার জন্যই বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা বোঝা ক্রমশই ভারী হয়ে উঠছিল, সে কথাটা অবশেষে সুভদ্রাকে শুনিয়ে দিয়ে নিজে সে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে তার বুকের মধ্যে একটা কঠিন সন্তোষ ঘন হয়ে জ'মে উঠতে লাগল। সুভদ্রাকে সে মনে মনে ধন্যবাদও দিলে,—তার প্রস্তাবটাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান ক'রে সুভদ্রা যেন নিজেকেও রক্ষা করেছে, তাকেও ভিতর ও বাইরের সব রকম বন্ধন থেকেই চির দিনের মত মুক্তি দিয়েছে।

হুগলীতে ইউনিয়নের আপিস-ঘরেই শ্যামাচরণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। শ্যামাচরণ তারই প্রতীক্ষা করছিল, তাকে দেখেই উদ্বিগ্ন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, দিদিমণি কেমন আছেন, সুবোধবাবু?

কিন্তু তার চোখ এড়িয়ে সুবোধ উত্তর দিলে ভালই আছেন, তেমন কিছু তাঁর হয় নি।

তেমন কিছু না হ'লেও ঠিক কি হয়েছে, সে সম্বন্ধে শ্যামাচরণ উপর্যুপরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। সুবোধ অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তরই দিলে না; অনেক প্রশ্ন সে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে এড়িয়ে গেল; শেষের দিকে সে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললে, তাঁর কিছু হয় নি, শ্যামাচরণদা, তিনি আমায় ডেকেও পাঠান নি। তাঁর এক বন্ধুই মিছামিছি ভয় পেয়ে আমায় খবর দিয়েছিলেন।

শ্যামাচরণ বিস্মিত হ'ল, সুবোধের মনের ভাবটা সে বুঝতে পারলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি দিদিমণিকে একবার দেখে আসব?

সুবোধ উদাসীনের মত উত্তর দিলে, ইচ্ছে হয়, যেয়ো। তার পর সোজা হয়ে ব'সে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কোন চিঠি আছে, শ্যামাচরণদা?

চিঠি ছিল দুখানা, আর একখানা মোড়ক-আঁটা 'হরিজন'। সুবোধ কাগজখানাই আগে খুললে; প্রধান প্রবন্ধটি মন দিয়ে প'ড়ে কিছুক্ষণ সে অন্যমনস্কের মত চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার পর খাম ছিঁড়ে আর একখানা চিঠি বের করলে সে।

চিঠি তার ঠাকুরমায়ের। আঁকা-বাঁকা কাঁচা হাতের লেখা। অনেক অভিযোগ, ভর্ৎসনা আর অনুনয়ের ভিতর দিয়ে স্নেহশীল নারীচিত্ত কৃতী পটুয়ার পাকা হাতের ছবির মত ফুটে উঠেছে। বুড়ী আশা এখনও ছাড়ে নি; চিঠিতে সেই তার মনের মত মেয়েটির কথা দু-তিন বার উল্লেখ ক'রে সুবোধকে আবার সে বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। পড়তে পড়তে সুবোধের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু চিঠিখানি তখনই সে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে।

দ্বিতীয় চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত, টাইপ-করা। সেখানা দু-তিন বার প'ড়ে সুবোধ একটি নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল; বললে, এখন একবার ব্যাঙ্কে যাচ্ছি, শ্যামাচরণদা, আর রাত্রের গাড়িতে আমি যাব দিল্লী।

দিল্লী!

হ্যাঁ, পার্টির একটা মীটিং আছে, আমার যাওয়া দরকার।

অনেকক্ষণ শ্যামাচরণের মুখে কোন কথাই ফুটল না ; তার পর বিভ্রান্তের মত মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সে বললে, এই সময়টাতে আবার বাইরে যাবেন আপনি !

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, শ্যামাচরণদা, সময়টা সম্বন্ধে তোমার আপত্তি কিসের ?

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর দিলে, শুনছি যে, আসছে সোমবার কোম্পানির তরফ থেকে আটা-চাল-নুন-চিনির একটা দোকান খোলা হবে। সেখান থেকে মজদুরেরা সস্তায় সব জিনিস কিনতে পারবে—বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দামে।

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, তার জন্য আমার দিল্লী যাওয়া আটকাবে কেন ? আর তোমারই বা এত ভাবনা হবে কেন ? মজদুরেরা সস্তা দামে চাল-চিনি পাবে, সে তো সুখের কথা।

সুখের কথা বই কি ! শ্যামাচরণ এবার মুখ তুলে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, বিমলবাবুরা বাহাদুরি নিলে আমরা আনন্দে নাচতে থাকব বুঝি ?

উত্তর শুনে কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সুবোধ হঠাৎ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। শ্যামাচরণ প্রথমে লজ্জা পেলে ; কিন্তু লজ্জিত মুখ লুকাবার কোন সুবিধা না পেয়ে সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, হাসছেন যে বড় ? এটা ভাবনার কথা নয় ? কোম্পানির যা কারবার সবই তো ওদের ইউনিয়নের সঙ্গে ? মাগগী ভাতার পরিমাণ বাড়ল ওদের ইউনিয়নের চেষ্টায়। এখন আবার এই সস্তা জিনিসের দোকান বসছে। সব ভাল কাজের কৃতিত্বই যদি ওরা পেয়ে যায়, তবে লোকের সামনে আমরা দাঁড়াব কেমন ক'রে ? আর মজদুরেরা আমাদের ইউনিয়নে আসবেই বা কেন ? এমনিতেই তো আসতে কেউ চায় না !

সুবোধ বুঝলে যে শ্যামাচরণ সত্যই চ'টে গিয়েছে ; কারণটাও সে বুঝতে পারলে। হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, ভাবনার কথা যদি হয়ও, শ্যামাচরণদা, তবু আমাদের চুপ ক'রেই থাকতে হবে। ওরা যে পথে আজ চলতে আরম্ভ করেছে, সে পথে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা তো চলতে

পারব না। মালিকদের সঙ্গে বিমলদের দলবন্দী হবার কথাটা সে দিন তুমিই তো আমায় শুনিয়েছিলে। আজ তা আবার ভুলে গেলে কেন?

শ্যামাচরণ লজ্জিত হয়ে বললে, না, ভুলি নি। আমি শুধু বলছিলাম যে, আমরাও যদি মজদুরদের কিছু পাইয়ে দিতে না পারি—

না, পারব না।—সুবোধ বাধা দিয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, কারণ, দেবার ক্ষমতা যার হাতে আছে, সে জানে কার হাত দিয়ে কখন কতটুকু দিলে তার লাভ বেশি হবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুবোধ আবার বললে, আর ও পথে আমরা যেতেও চাই নে, শ্যামাচরণদা। মজদুরকে অনেক বার অনেক কিছুই তো আমরা পাইয়ে দিয়েছি, সে যে আসলে কতটুকু তাই আমরা এবার যাচাই ক'রে দেখব। ডাক দেব ওদের সব ছাড়বার জন্য—তার সস্তাদামের চাল-নুন, তার মাগগী ভাতা, তার চাকরি, তার যথাসর্বস্ব।

শ্যামাচরণ বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলে, এ আপনি কি বলছেন, সুবোধবাবু?

খুব সোজা কথা, শ্যামাচরণদা।—সুবোধ অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, নিজের ভাল অনেক করা গিয়েছে, এবার মজদুর তার দেশের ভালর কথা একটু ভাল ক'রে ভাববে না? এবার যে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই শুরু হবে—আর এই তো হবে আমাদের শেষ লড়াই।

এবার বুঝতে পারলে শ্যামাচরণ। কথাটা নূতন নয়; এ সম্বন্ধে সুবোধের সঙ্গে তার অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংশয় তার দূর হয় নি। আজও সুবোধের কথা শুনে উৎসাহে সে চঞ্চল হয়ে উঠল না; বরং তার গম্ভীর মুখ আরও বেশি গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে সংশয়ের স্বরে বললে, কিন্তু সুবোধবাবু, ওরা যদি আমাদের এ ডাকে সাড়া না দেয়?

কিন্তু উত্তরে সুবোধ দৃপ্ত কণ্ঠেই বললে, তা হ'লে নিজেরাই ওরা প্রমাণ ক'রে দেবে যে, মজদুর-রাজের দাবি ওদের ভুয়ো,—স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার হবার যোগ্য ওরা নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে আবার বললে,

খুব বেশি দাম দিতে না পারলে খুব বড় কোন জিনিস পাওয়া যায় না, শ্যামাচরণদা। স্বাধীনতার জন্য মজদুর যদি খুব বড় রকমের ত্যাগ না করতে পারে, তবে দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের লোক বিশ্বাস ক'রে তার হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেবে কেন?

বোধ করি তথাপি শ্যামাচরণের সংশয় ঘুচল না; পায়ের কাছ থেকে এক টুকরা কাগজ তুলে নিয়ে অকারণেই সেটা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ভবিষ্যতের কথা আমার তেমন মনে উঠছে না, সুবোধবাবু, আমি কেবল বর্তমানের কথাই ভাবছি। ভাবছি যে, যে কাজের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না এবং মোটে পাওয়া যাবে কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়, সেই কাজ করতে আমাদের এই মজদুরেরা এগিয়ে আসবে কি না!

উত্তরে সুবোধ বললে, না এলে এ পর্যন্ত যা ওরা লাভ করেছে, তার সব হারাবে।

শ্যামাচরণ আহতের মত মাথা নেড়ে বললে, কেবল ওদের দোষ দেবেন না, সুবোধবাবু। এত দিন আপনারাও তো কেবল লাভের কথাটাই ওদের বুঝিয়ে এসেছেন, ইউনিয়ন গড়েছেন, হরতাল করিয়েছেন, সব তো হাতে হাতে পাওনার লোভ দেখিয়েই।

এবার সুবোধের নিজের চোখ দুটিও নত হয়ে পড়ল; একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, ঠিকই তো, শ্যামাচরণদা, এবার আমাদেরও পরীক্ষা হবে। কাজের এই বিশেষ ক্ষেত্রটাতে গোড়া থেকেই আমরা ভুল ক'রে এসেছি কি না, তাও এবার প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে ওরা সাড়া দেবে না সন্দেহ ক'রে আমরা ডাক দেওয়াটাই তো বন্ধ করতে পারি নে।

শ্যামাচরণ স্বীকার ক'রে বললে, না, তা পারি নে।

আমি সেই কথাই বলেছি।—ব'লে সুবোধ চ'লে যাবার উপক্রম ক'রেও আবার থমকে দাঁড়াল; শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, তুমি নিজে কি বল, শ্যামাচরণদা? সময় সত্যি এসে গেল আর কি! এবারকার কাজে আর কাউকে পাই বা না পাই, তোমায় আমি পাব তো?

শ্যামাচরণ চমকে সুবোধের মুখের দিকে তাকাল; পলকের জন্য তার

নিজের মুখখানা কালো হয়ে গেল ; কিন্তু তার পরেই হেসে ফেলে সে বললে, আমার কথা আমি ভাবি নি, সুবোধবাবু, আপনিও ভাবেন না। অনেক ঝড়ই তো এ যাবৎ আমার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছে, এবারকার ঝড়ে না হয় ভেঙেই পড়ব। ঘরে গিয়ে লুকোব না, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

খুশিতে সুবোধের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; সাগ্রহে শ্যামাচরণের একখানি হাত চেপে ধ'রে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, তা হ'লেই হ'ল, শ্যামাচরণদা, তা হ'লেই অন্তত একটা চেষ্টা আমি ক'রে যেতে পারব। ওরা মজুরকে যত খুশি টাকার লোভ দেখাক ; আমি তাদের ডেকে বলব, আমি দেব শুধু দুঃখ, পরিশ্রম, অনাহার, আঘাত, হয়তো বা মৃত্যুও।

একটু থেমে সে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে আবার বললে, বিমলের সঙ্গে তোমার যদি দেখা হয়, শ্যামাচরণদা, তাকে আমার এই কথাগুলো এক বার শুনিয়ে দিও। ব'লো, গ্যারিবল্ডিই না হয় সেকেলে হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু চার্চিল তো হন নি! তাঁর কথার সঙ্গে এগুলো খুব বেমানান হবে না, চাই কি, স্ট্যালিনের কথার সঙ্গেও খানিকটা মিলে যেতে পারে।

দিন দশেক পর মনের মধ্যে অনেকখানি উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সুবোধ দিল্লী থেকে হুগলীতে ফিরে এল।

দিল্লীতে সে গিয়েছিল ওদের পার্টির কার্যকরী সমিতির সভায় যোগ দিতে। ঐ উপলক্ষে অনেকের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছিল ; আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল অনেক। ওরই ফলে তার অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝে এসেছিল যে, এত দিন পর সত্যিই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। এবার আর কেবল কথা নয়, এবার সবই কাজ। মস্তিষ্ক-সর্বস্ব কূটনীতির নিরর্থক কসরৎ, ছোটখাটো দেনা-পাওনার চুলচেরা হিসাব আর দলাদলির মাতলামি আর নয়,—এবার সত্যিই স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম শুরু হবে। সুবিচারের প্রত্যাশা, রাজ-রোষের আশঙ্কা বা অরাজকতার বিভীষিকা এবার আর চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে না। নৈষ্কর্ম্যের জড়তা আর নৈরাশ্যের অবসাদ এবার যে সত্য সত্যই কেটে যাবে, দেশব্যাপী মহৎ একটা প্রচেষ্টার ফেনোচ্ছল তরঙ্গের উপর আরোহণ ক'রে এবার নিজেও যে সে দিগ্বিজয়ে বের হতে পারবে, একটা বিপুল ও উদার

সার্থকতার মধ্যে স্বার্থান্ধ, সঙ্কীর্ণ জীবনের সকল ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, এই কল্পনায় সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

তার মনের এই উল্লাস পরিহাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ল। শ্যামাচরণকে দেখেই হাসিমুখে সে জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি, শ্যামাচরণদা ?

শ্যামাচরণ উত্তরে বললে, খবর এখানে কোথায়, সুবোধবাবু ? আমরা সবাই তো আপনার মুখেই খবর শুনবার আশা ক'রে আছি।

সে খবর পরে শোনাব।—সুবোধ বললে, তোমাদের খবর আগে বল।

আমাদের কোন খবর নেই।

বল কি শ্যামাচরণদা, একেবারে কোন খবর নেই ? এ কি হতে পারে ? ওদের মুকুটে নূতন কোন পালক বসে নি ? মাগগীভাতার বাড়তি, নূতন একটা বোনাস, অন্তত নূতন একটা মুনের দোকান, এ রকম কিছুও হয় নি ?

শ্যামাচরণ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে ; বললে, না, কিছুই হয় নি, সুবোধবাবু। হ'লেও খবর ব'লে তা আপনাকে জানাতাম না, কারণ ওদের কথা এখন আর আমি ভাবি নে। আর ভাবলেও তা একেবারেই অন্য রকমের ভাবনা।

অন্যরকমের !—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, সেটা বার কি, শ্যামা-চরণদা ?

শ্যামাচরণ হাসিমুখে উত্তর দিলে, সেটা আর এক দিন বলব। এখন আপনার খবর বলুন। দিল্লীতে কি ঠিক হ'ল ?

তথাপি সুবোধ বললে, সেটা পরেই শুনো। আগে এখানকার খবর আমায় শোনাও।

না।—শ্যামাচরণ এবার জিদ ক'রেই বললে, আপনার খবর আগে বলুন। সত্যি, কিছু হবে এবার ? স্বরাজের জন্য লড়তে সত্যি এবার ডাক পড়বে সকলের ?

সুবোধ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হেসে ফেলে বললে, তোমার মত আমারও সন্দেহ ছিল, শ্যামাচরণদা ; কিন্তু সেটা এবার ঘুচেছে। সত্যি, সত্যাগ্রহ এবার শীগগিরই শুরু হবে, আর ডাক পড়বে ছোট-বড়, ছেলে-মেয়ে সকলেরই।

শ্যামাচরণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আগ্রহের স্বরে সে বললে, সত্যি বলছেন, সুবোধবাবু? কি করতে হবে?

একটু চুপ ক'রে থাকবার পর সুবোধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, ছবি এখনও শেষ হয় নি, শ্যামাচরণদা, একে শেষ করতে হয়তো কোটি হাতের কোটি তুলির আঁচড় লাগবে। তবে এটুকু এরই মধ্যে পাকাপাকিই ঠিক হয়েছে যে, মুক্তি আমাদের চাইই; আর তা অবিলম্বেই চাই। চেয়ে যদি না পাওয়া যায় তবে তা অনিচ্ছুক হাতের মুঠার ভিতর থেকে ছিনিয়েই নিতে হবে।

শুনতে শুনতে শ্যামাচরণের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কথা শেষ হ'লেও সে আর কোন প্রশ্ন করলে না।

একটু পরে সুবোধই তার নিজের গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে আবার পরিহাসের স্বরে বললে, এ সব কথা এখন থাক্, শ্যামাচরণদা, এখানকার খবর আগে বল। সত্যি, বলবার মত খবর কি তোমার হাঁড়িতে একটিও জ'মে ওঠে নি?

শ্যামাচরণও হেসে ফেলে বললে, না, সুবোধবাবু, সত্যি বলছি, তেমন খবর কিছু নেই।

ভারি আশ্চর্য তো!—সুবোধ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, আমার অবর্তমানে জগৎটা এখানে ঠায় ব'সে ছিল নাকি? কিন্তু জগৎটা ব'সে থাকলেও তুমি তো ব'সে থাকবার লোক নও, শ্যামাচরণদা!—এবার দশ-দশটা দিন তুমি এই ঘরের মধ্যে ব'সে কাটিয়েছ নাকি?

শ্যামাচরণ এবার একটু যেন চমকে উঠল; চোখের দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার। সুবোধের মুখের দিকে চেয়েই সে উত্তর দিলে, না, ব'সে কাটাই নি; এক বার কলকাতায় গিয়েছিলাম দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে।

সুবোধের সহাস্য মুখ দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল। শ্যামাচরণ নিজেও গম্ভীর হয়েই তার বর্ণনাটা শেষ করলে, কিন্তু তার দেখা পেলাম না, সুবোধবাবু। আগের সে মেসে তিনি আর এখন নেই; কোথায় নাকি বাসা ক'রে আছেন; কিন্তু ঠিক যে কোথায় তা মেসের কেউ বলতে পারলে না।

শুনে সুবোধ অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে রইল; তার পর মুখখানা হাসবার মত ক'রে বললে, ঠিকই করেছেন তিনি। তাঁর ঠিকানা জানা ছিল ব'লেই না

আমরা বার বার সেখানে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করেছি, সে বার তুমি গিয়ে তাঁকে তো এই হুগলী পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলে। সময়মত ওখান থেকে তিনি না পালালে আবার হয়তো তুমি একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলতে।

তার পরেই সে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে সুর বদলে আবার বললে, আমি এখন যাই, শ্যামাচরণদা; বৈকালে আপিসে একবার অবশ্য এসো; অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বৈকালে কথায় কথায় শ্যামাচরণ সুবোধকে বললে, আমার বড় ছেলেটা পালিয়ে গিয়েছে, সুবোধবাবু।

সুবোধ চমকে উঠে বললে, পালিয়ে গিয়েছে!

—শ্যামাচরণ সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে পরে উত্তর দিলে, কিন্তু কেবল পালিয়ে যাওয়াটাই আমার দুঃখের কারণ নয়, সুবোধবাবু। দুঃখের কারণ সে যুদ্ধে গিয়েছে ইংরেজদের সাহায্য করতে। কুলি কি ধাঙড়, এই রকমের একটা দলের জন্য এদিকে লোক নেওয়া হচ্ছিল, কাউকে কিছু না ব'লে ওই চাকরি নিয়ে চ'লে গিয়েছে সে। খবর পেয়েছি আর এক জনের কাছে।

সুবোধ সান্ত্বনার কোন কথা ভেবে পেলে না। একটু পরে শ্যামাচরণই আবার অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হঠাৎ ব'লে উঠল, কাছে যদি তাকে আমি পেতাম, সুবোধবাবু, তবে নিজের হাতে আজ আমি তাকে খুন করতাম। তবে এত দুঃখের মধ্যেও আজ আমার এক মাত্র সান্ত্বনা এই যে, ওই যুদ্ধেই সে মরবে, সেই কুলাঙ্গার পুত্রের মুখ আর আমায় দেখতে হবে না।

সুবোধ চমকে উঠল; কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই চারিদিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে সুর নামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, বউদি কোথায়?

শ্যামাচরণ আবার একটি নিশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, দুদিন সে প'ড়ে প'ড়ে কেবল কেঁদেছিল, তার পর থেকে আবার কাজকর্ম করছে।

সুবোধ আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না, কিন্তু মনটা তার উদাস হয়ে গেল। শ্যামাচরণকে এত দিন সে কেবল তার সহকর্মী হিসাবেই দেখে আসছে; কিন্তু সে যে পিতা এবং স্বামীও, সে সম্বন্ধে আজ যেন সর্বপ্রথম সে সচেতন হয়ে উঠল। নিজে পিতা না হয়েও সে বুঝতে পারলে যে,

শ্যামাচরণের কথা আর ব্যবহারের ভিতর দিয়ে এইমাত্র যা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা কেবল আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীর উন্মাই নয়, আঘাতদীর্ণ পিতৃহৃদয়ের অনেক অভিমান, অনেক বেদনাও ওর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। বয়স্ক পুত্রের এই আকস্মিক অন্তর্ধান সারদার বুকে আরও যে কত বেশি বেজেছে, তাও সে অনুমান ক'রে নিলে। তার মনের মধ্যে কেমন একটা বেদনা, কেমন যেন একটা সংশয়ও জেগে উঠল, পুত্রশোকবিহ্বলা প্রৌঢ়ার স্বামীকে এ সে কোথায় নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে!

সে দিন রাত্রে এবং পরের সারাটা দিন অনেক রকম কাজের মধ্যেও এই চিন্তাটা সুবোধের মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল। সন্ধ্যার পর আর থাকতে না পেরে শ্যামাচরণকে সে ব'লেই ফেললে, আগুনের মধ্যে তুমি যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, শ্যামাচরণদা, তাতে বউদির সম্মতি পাবে তো?

শ্যামাচরণ বিস্মিত হয়ে বললে, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন, সুবোধবাবু?

সুবোধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তুমি তো সংসারে আমার মত নির্বন্ধন একক মানুষ নও, শ্যামাচরণদা, অসাধারণ কিছু একটা করতে গেলে বউদির মত তোমায় নিতে হবে বইকি!

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিতের মত চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বললে, আগেও তো কোন দিন ওর মত নিই নি,—নেবার দরকারও হয় নি।

কিন্তু এবার মত নেওয়া দরকা :—সুবোধ আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে বললে, কারণ আগে যা হয়েছে আর এবার যা হবে, তাতে তফাত অনেক।

একটু থেমে সে আবার বললে, প্রাণটাকে হাতে নিয়ে তুমি যে পথে বেরিয়ে পড়বে, তার পর তোমার যদি কিছু হয় তখন ওঁকে দেখবে কে? আর কেবল বউদির কথাই তো নয়, ছোট একটি মেয়েও তো আছে তোমার!

শ্যামাচরণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে; বললে, এমন ক'রেই কথাটা যখন আপনি বলছেন তখন আমিও বলি, আপনারা ভগবান মানেন না, সুবোধবাবু, কিন্তু আমি মানি। তাই নিঃসংশয়েই আমি বলতে পারি যে, দরকার যদি হয় তবে সারদা আর তারাকে ভগবান নিজেই দেখবেন।

সুবোধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর

হঠাৎ খুব জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, শ্যামাচরণদা, এ কোন কাজের কথা নয়। বউদির সম্মতি তোমার অবশ্যই নেওয়া দরকার।

এরও উত্তরে শ্যামাচরণ হাসতে হাসতেই বললে, সম্মতির কথা যা আপনি বলছেন, সুবোধবাবু, তা মুখে সে কোন দিনই দেয় নি বটে, তবে মনে মনে বরাবরই দিয়ে এসেছে। নইলে যা আমি করছি তার অর্ধেকও কি করতে পারতাম ভেবেছেন?

সুবোধ উত্তর দিলে না। তার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে শ্যামাচরণই আবার বললে, আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, সুবোধবাবু, তবে নিজেই আপনি একবার সারদার সঙ্গে কথা ব'লে দেখুন। চলুন যাই, এখনই তার মত তাকে জিজ্ঞেস করবেন।

সুবোধের সামনেই শ্যামাচরণ সারদাকে বললে, সব ছেড়ে-ছুড়ে আবার আমি চললাম, বউ। তাই সুবোধবাবুর কথামত তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

সারদা চমকে উঠল, তার চোখ দুটি সোজা গিয়ে পড়ল সুবোধের মুখের উপর।

সুবোধের গায়ের সবগুলি লোম হঠাৎ যেন এক সঙ্গেই খাড়া হয়ে উঠল। সারদার চোখের এই দৃষ্টিটা তার খুবই চেনা। চির কালই যখনই শ্যামাচরণকে সে ইউনিয়নের কোন কাজের জন্য তাগিদ বা প্ররোচনা দিয়েছে, তখনই সারদার চোখে এই রকমের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সে দৃষ্টি ভারি অদ্ভুত। তাতে সন্দেহ আছে, আশঙ্কা আছে, অভিযোগ আছে, বেদনাও আছে। অতীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টি যে রকম নাটকীয় ব্যাপারের ভূমিকা স্বরূপে দেখা দিয়েছে, তারই স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগতেই সুবোধ যেন ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

কিন্তু সারদা তার অদ্ভুত চোখ দুটি সুবোধের মুখের উপরেই পেতে রেখে বিহ্বল স্বরে বললে, কি হয়েছে, সুবোধবাবু?

সুবোধ চোখ তুলে সারদার মুখের দিকে চাইতে পারলে না; কিন্তু কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, ঠিক কিছুই এখনও হয় নি, বউদি; তবে হবার সম্ভাবনা আছে,

মানে, আন্দোলন আবার আসছে কিনা। তবে তুমি যদি বারণ কর, তা হ'লে শ্যামাচরণদাকে ওতে আর আমি টানতে চাই নে।

কিন্তু এরই উত্তরে সারদা যা বললে, তা শুনে সুবোধের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। চকিতে এক বার শ্যামাচরণের মুখখানি দেখে নিয়ে ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, কিন্তু ও কি আমার বারণ মানবে? বলতে বলতে দুই ফোঁটা চোখের জল তার গালের উপর ঝ'রে পড়ল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে সে গাঢ় স্বরে আবার বললে, আর ওকে বারণ আমি করতেও চাই নে। ভগবান যাকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে সংসারে পাঠিয়েছেন, আমার কি সাধ্য যে তাকে আমি লক্ষ্মীমন্ত করব? করবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশি। জলের মাছকে ডাঙায় টেনে তুললে তার যে অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হয় ওঁর; মনে হয় যে, এই তিরিশ বছর যাকে নিয়ে ঘর করেছি, এ যেন সে নয়—এ যেন আর এক মানুষ। আমার নিজের মানুষটিই যদি বেঁচে না রইল, তবে ওঁকে বেঁধে রেখে আমার লাভ?

বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। সারদার কথাগুলি কেবল যে তার কাছে অপ্রত্যাশিত, তা-ই নয়, ওর ভাষাও যেন তার দুর্বোধ্য। সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে,—প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আঁকা ওই কুৎসিত মুখখানি নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা সত্ত্বেও কি যেন একটা অপার্থিব মাধুর্যে স্নিগ্ধ। শ্যামাচরণের মুখের দিকেও সে চেয়ে দেখলে, তারও কুণ্ঠিত আনত মুখখানি যেন গর্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিগত-যৌবন ওই দুটি নরনারীর মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতেই সুবোধের নিজের অন্ধকার মনটাও হঠাৎ যেন আলোয় আলোময় হয়ে গেল। সে বুঝলে যে, রিক্ততার শূন্যতা থেকে মদের নেশার মত যে উন্মাদনা পাওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। এ প্রাপ্তি ও প্রাচুর্যের অমৃতময়ী প্রেরণা। এ জিনিস যে স্বর্গরাজ্যের অমূল্য সম্পদ, সেখানে তার নিজের প্রবেশের অধিকার নেই ব'লেই এ জিনিসটির অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সে সন্দীহান হয়ে উঠেছিল। সে যে কত বড় ভুল, তাই বুঝতে পেরে হঠাৎ চোখ দুটি তার ছলছল ক'রে উঠল। সারদার কথার উত্তরে একটি কথাও তার মুখে ফুটল না।

আড় চোখে বার কয়েক তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে শ্যামাচরণই একটু পরে সলজ্জ কণ্ঠে বললে, দেখুন, স্ুবোধবাবু, বলি নি আমি? মুখে ও যা-ই বলুক না কেন, মনে মনে ও আমার সব কাজই সমর্থন করে।

স্ুবোধ সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল; কিন্তু মনের ভাবনা আর গোপন করতে না পেরে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, ঠিক, শ্যামাচরণদা, আমিই ভুল করেছিলাম। কিন্তু সে ভুল এখন আমার ভেঙে গিয়েছে।

শ্যামাচরণের চোখ-মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার সারদার দিকে একটা কটাক্ষ ক'রে সহাস্য কণ্ঠে সে বললে, এবার ওকেও আমাদের কাজে টেনে নেব, স্ুবোধবাবু, কি বলেন?

স্ুবোধও সারদার মুখের দিকে এক বার তাকিয়ে দেখলে; তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, টানতে হবে না, শ্যামাচরণদা, বউদি নিজেই আমাদের টেনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

সপ্তাহখানেক পর কাজকর্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ একটি আলোচনার উপসংহারে শ্যামাচরণ স্ুবোধের গা ঘেঁষে ব'সে গম্ভীর স্বরে বললে, ওদেরই হাতে নেতৃত্ব যদি আমরা ছেড়ে দিই, স্ুবোধবাবু, তা হ'লেও কি ওঁরা আন্দোলনে যোগ দেবেন না?

স্ুবোধ চমকে উঠে বললে, হঠাৎ এ কথা তোমার মনে উঠল কেন, শ্যামাচরণদা?

হঠাৎ নয়, স্ুবোধবাবু।—শ্যামাচরণ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, অনেক দিন থেকেই এ কথাটা আমি ভাবছি; সে দিন এক বার এ কথাটার আভাসও আপনাকে আমি দিয়েছিলাম। আমি বলছি যে, ওঁরা যদি ওদের 'জনযুদ্ধে'র জিগির ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাতে রাজী হন, তা হ'লে আমরা না হয় আমাদের ইউনিয়ন ভেঙেই দেব, দাঁড়াব গিয়ে ওঁদের পিছনে। সত্যি, নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যই তো আমরা ইউনিয়ন গড়ি নি, কাজই তো আমাদের লক্ষ্য।

স্ুবোধের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দলাদলির কৃতিত্বে এই শ্যামাচরণকে সে অদ্বিতীয় ব'লেই জানত। ইঁটটি খেলেই পাটকেলটি মারবার

জন্ত সে যে কি অধীর আগ্রহে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ছুটে যায়, তা সুবোধের অজানা নেই। বিশেষ ক'রে বিমলদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশের তীব্রতা দেখে অতীতে সুবোধ নিজেও অনেক বার শিউরে উঠেছে। অথচ সেই শ্যামাচরণই এই যে আজ দেশের কথা, কাজের কথা ভেবে ওই বিমলদের হাতেই সকল কর্তৃত্ব সঁপে দিয়ে নিজেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলতে চাচ্ছে, এই ঘটনার অসাধারণত্ব সুবোধকে অভিভূত ক'রে ফেললে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সে বুঝতে পারলে যে, শ্যামাচরণ যা চায় তা হবার নয়। ওই একটি মুহূর্তের মধ্যেই বর্তমান দলাদলির ঐতিহাসিক পটভূমিটাকে সে যেন সমগ্রভাবেই দেখতে পেলে। কিছুদিন আগে এই হুগলীতেই অরুণাংশুর সঙ্গে তার নিজের যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, তাও এই সম্পর্কে তার মনে প'ড়ে গেল। এই কারখানার ইউনিয়ন নিয়েই এখানে ছোট-বড় যত সব ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে এবং এখনও ঘটছে, ওর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঈর্ষা যতটুকুই জড়িয়ে থাকুক না কেন, আসলে ওগুলি যে ব্যক্তিগত বা স্থানীয় ঘটনামাত্রই নয়, তাও সে নিঃসংশয়েই অনুভব করলে। কাজেই শ্যামাচরণের প্রস্তাব তার মনের মধ্যে প্রবল একটা আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে থাকলেও উত্তরে বলবার মত সঙ্গত কোন কথা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

কিন্তু তার চিন্তিত, গম্ভীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ প্রত্যাশীর মত চেয়ে থাকবার পর শ্যামাচরণই আবার বললে, কি বলেন, সুবোধবাবু? ওঁদের রাজী করতে পারলে খুব ভাল হয় না?

সুবোধ এবার ন'ড়ে বসল; শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে বললে, ভাল তো নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু ওরা রাজী হবে না, শ্যামাচরণদা। তুমি তো জান, দেশের স্বাধীনতা ওদের কাছে গৌণ; ওদের মুখ্য লক্ষ্য আর একটা জিনিস।

এটা অকাট্য যুক্তি; শ্যামাচরণ একে খণ্ডন করবার জন্য চেষ্টাও করলে না। একটু চুপ ক'রে থেকে সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, ওরা যদি আগের মত নিরপেক্ষও থাকত, আমি তেমন ভাবতাম না। কিন্তু বুঝতে পারছি যে, এবার ওরা আমাদের বাধা দেবে।

সুবোধ মৃদু স্বরে বললে, তা ঠিক।

সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে শ্যামাচরণ বললে, সেই জন্যই এক বার চেষ্টা ক'রে দেখতে বলছি আপনাকে। না হয় ফল না-ই হবে। কিন্তু ফলের আশা ছেড়ে দিয়েই তো কাজ করতে হয়।

সুবোধ হেসে ফেলে বললে, বেশ তো, শ্যামাচরণদা, তুমিই ব'লে দেখ না একবার।

না, সুবোধবাবু।—শ্যামাচরণ মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, আমি বললে, কিছুই হবে না। আপনাকেই কথাটা বলতে হবে, আর আমার মতে বলাও উচিত।

সুবোধ উত্তর দিলে না, ভিতরে তার মনটা রীতিমত সক্রিয় হয়ে উঠল। অরুণাংশুর কথা বার বার তার মনে পড়তে লাগল,—অনেক দিন অরুণাংশুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি,—ইতিমধ্যে তার মতের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না, কে জানে! সুবোধের মনে হ'ল যে, কথা বললে অরুণাংশুর সঙ্গেই কথা বলতে হয়,—বললে লাভ যদি কিছু নাও হয়, লোকসান হয়তো হবে না।

তাই একটু পরে শ্যামাচরণ আবার যখন তাকে অনুরোধ করলে, তখন সুবোধ মুখখানি হাসবার মত ক'রে বললে, বেশ তো, শ্যামাচরণদা, তুমি যখন নাছোড়বান্দা, তখন নিষ্কাম ভাবেই চেষ্টা একবার ক'রে দেখব।

পরদিন সকালেই সে বিমলের আস্তানায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ঘটনাটি অসাধারণ। এক দিন অবশ্য এরা দুজন কেবল সহকর্মীই ছিল না, বন্ধুও ছিল। একই কর্মক্ষেত্রে এরা একত্র কাজ করেছে, একত্র দুঃখ ভোগ করেছে, সাফল্যের আনন্দ আর ব্যর্থতার বেদনা সমান ভাগে বেঁটে নিয়েছে। কিন্তু সে যেন এক সত্যযুগের কথা। ইদানীং উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল, আর তা-ও নিতান্তই কে-আক্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। রাজনৈতিক দলাদলির বিষাক্ত বাতাস ওদের বন্ধুত্বের সম্বন্ধটিকে পর্যন্ত আক্রমণ ক'রে কলুষিত করতে বাকি রাখে নি। ওরই মধ্যে আবার সুভদ্রার নামের মিশাল দিয়ে যে জিনিসটির সৃষ্টি হয়েছে, তার কদর্যতা ও বিষাক্ততা তো একেবারে অনুপম। ফলে অতীতে বন্ধুরা হয়েছে বর্তমানের শত্রু। সুবোধ দেশ থেকে ফিরে আসবার পর এদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হয় নি; বাড়ির বাইরে

সভা-সমিতিতে কদাচিৎ দেখা হয়ে থাকলেও তা কোন পক্ষেরই তেমন প্রীতিপ্রদ হয় নি। তাই সুবোধকে আজ একেবারে নিজের বাসায় উপস্থিত দেখে বিমলের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, এ কি, সুবোধদা যে! হঠাৎ এখানে? মানে, আমায় খবর দিলেন না কেন? আমি নিজেই যেতাম।

সুবোধ কিন্তু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, তুমি যাবে কেন, বিমল? আসবার কথা তো আমারই—তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি কিনা!

নিমন্ত্রণ!—বিমল বিহ্বলের মত বললে, কিসের নিমন্ত্রণ, সুবোধদা?

যজ্ঞের।—সুবোধ হাসিমুখে উত্তর দিলে; তারপর বেশ জেঁকে ওখানে ব'সে আবার বললে, সত্যি, যজ্ঞের নিমন্ত্রণ, বিমল। কিন্তু রূপক যদি দুর্বোধ্য মনে হয় তবে সোজা কথায় বলছি, কাজের নিমন্ত্রণ,—আকাশে-বাতাসে যে নিমন্ত্রণ আজ ছড়িয়ে পড়েছে, তাই মুখের কথায় তোমায় শোনাতে এসেছি।

উপক্রমণিকার শেষে আসল কথাটা সুবোধ বেশ গম্ভীর হয়ে বললে। কিন্তু ওই কথাটা শুনতে শুনতে বিমলের মুখখানা অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর হয়ে উঠল। সুবোধের কথার কোন উত্তর দিলে না সে; তার মুখের উপর থেকে চোখও তখনই সে সরিয়ে নিলে।

ভাব দেখেই সুবোধের মনটা দ'মে গেল। তথাপি অনুনয়ের স্বরেই সে বললে, দলাদলি করবার সুযোগ এর পরেও তো ঢের পাওয়া যাবে। এবার শেষ চেষ্টাটা, এস না, সকলে মিলেই করি। ইউনিয়ন বল, নেতৃত্ব বল, সব না হয় তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমরা তোমাদের পিছনেই গিয়ে দাঁড়াব।

বিমলের ঠোঁটের কোণে অতি সূক্ষ্ম কয়েকটি হাসির রেখা ফুটে উঠল; মুখ না তুলেই মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, যা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন, সে কি এমন কোন জিনিস যা নিজের শক্তিতেই আমরা জয় ক'রে নিই নি?

মুখের হাসির ভাবটা বজায় রেখেই সুবোধ উত্তর দিলে, তা প্রমাণ করতে গেলেই যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে, বিমল। অথচ ওই সংঘর্ষটাকেই আমি এড়াতে চাই।

কিন্তু আমরা চাই নে।—বিমল মাথা নেড়ে বললে, আমরা সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই।

সুবোধের মুখের হাসি এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। মনে মনে সে নিঃসংশয়েই বুঝতে পারলে যে, বিমলের সঙ্গে কথা ব'লে কোন লাভ হবে না। একটি নিশ্বাস ফেলে সে বললে, তাতে দেরি এত বেশি হবে যে, ইতিমধ্যে দেশের মস্ত একটা সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যাক সে কথা—তোমার সঙ্গে এ আলোচনা আর আমি করতে চাই নে। শুধু বল তো, অরুণাংশু এখন কোথায়?

বিমল সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে এবার হেসে ফেললে; বললে, অরুণদার সঙ্গে কথা বললেও কোন লাভ হবে না, সুবোধদা।

তা না হোক।—সুবোধ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তবু তার ঠিকানাটা তুমি আমায় দাও।

বিমল এবার আর হাসলে না, একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললে, কিন্তু অরুণদা তো কলকাতায় নেই!

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি! কোথায় গিয়েছে সে? সে বার যে সে আমায় ব'লে গেল যে, কলকাতায় বালিগঞ্জে বাসা করেছে সে?

বিমল হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, ঐ বালিগঞ্জে যাবার পর থেকেই তো গোলমাল শুরু হয়েছে।

সে কি!—সুবোধ এবার রীতিমত বিহ্বল হয়েই বললে, গোলমাল কি হ'ল আবার?

বিমল অপ্রতিভের মত চোখ নামিয়ে নিলে; মুখের হাসিও নিবে গেল তার। আবার কুণ্ঠিত স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি জানেন না কিছু? অরুণদার বিয়ের কথা কিছু শোনেন নি?

বিয়ে!—সুবোধ বিদ্যুৎপৃষ্টের মতই চমকে উঠল।

বিমল আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আমি নিজেও সঠিক খবর কিছু জানি নে। কেবল প্রবীরদার মুখে শুনেছি যে, বালিগঞ্জের কোন এক বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে অরুণদার বিয়ের কথা হয়েছিল। মাস দেড়েক আগে পূর্ববঙ্গে সফর করতে করতে কাজ শেষ হবার আগেই তিনি নাকি কি একটা

তার পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তার পর থেকেই তার আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতায় ওঁরা তাই থেকে অনুমান করেছেন যে, হয়তো উনি বিয়ের জন্যই এলাহাবাদে চ'লে গিয়েছেন।

সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। অরুণাংশুর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যা অনুমান করেছে, সুবোধ তা অবিশ্বাস করতে পারলে না। স্বয়ং অরুণাংশুকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। অসহিষ্ণুর মত বিমলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে। কিন্তু উত্তরে বিমল একটিমাত্র সঠিক খবর যা দিতে পারলে তা এই যে, অরুণাংশুর বর্তমান ঠিকানা বিমল বা তার পরিচিত একটি লোকেরও জানা নেই,—প্রবীরদা নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন যে, বালিগঞ্জের বাড়িতে প্রকাণ্ড তালা আর 'টু-লেট' নোটিশ ঝুলছে।

এমন একটা সংবাদ শোনবার পর সুবোধের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। তার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বিমলই আবার বললে, অরুণদাকে আমারও খুব দরকার আছে, সুবোধদা,—তাঁর খবর পেলেই আপনাকে আমি জানাব।

তাই জানিও।—ব'লে সুবোধ অন্যমনস্কের মত বের হয়ে এল।

ইতিমধ্যে তার মনের একটা বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছে। পথে যখন সে এল, তখন তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা অক্ষম হাহাকার শুকনো চৈতালী ঘূর্ণির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উপরে উঠে তার মনোজগৎটাকে ছেয়ে ফেলেছে। শ্যামাচরণের কথা বা কাজের কথা তখন আর তার মনেও পড়ল না; এমন কি, অরুণাংশুর মুখখানাও যেন ধূলাবালির আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গেল; আর বিমল যার নাম পর্যন্ত মুখেও আনে নি, যার কথা সেদিন নিজে সে এক বারও ভাবে নি, সেই সুভদ্রাকেই কেবল বার বার তার মনে পড়তে লাগল,—সেই তার ম্লান মুখ, সেই তার ফুলে ফুলে কান্না, সেই তার ব্যর্থ জীবনের সকরুণ ইতিহাস। হতভাগিনী সুভদ্রা!—সুবোধের কেবলই মনে হতে লাগল যে, এবার সুভদ্রার দুর্ভাগ্যের পাত্রটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সব হারিয়েও এত দিন আশা হয়তো তার ছিল, অরুণাংশুকে আবার ফিরে পাবে সে; অন্তত অরুণাংশুর সঙ্গে তার পুনর্মিলনের একটা সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু অরুণাংশুর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্ভাবনারও সমাধি হয়ে গেল, আশা

করবার শেষ উপলক্ষটিকেও হারিয়ে হতভাগিনী সুভদ্রা এবার সত্য সত্যই নিঃস্ব হয়ে পড়ল।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। কাছেই কারখানা চলেছে পুরাদমে, ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্, সোঁ-সোঁ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। বড় রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়া চলেছে বন্যার জলের মত। কিন্তু এর কিছুই সুবোধের চোখে পড়ল না, কোন শব্দই তার কানে গেল না। কেবল সুভদ্রার অশ্রুকলঙ্কিত ম্লান মুখখানিই সে যেন তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, আর বাষ্পীয় যন্ত্রের জঠরস্থ বাষ্পের মত একটা অন্ধ উন্মত্ত আবেগ যেন সেই মুহূর্তেই ওই সুভদ্রার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবার জন্য ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কিন্তু স্টেশন পর্যন্ত যাবার আগেই হঠাৎ এক সময়ে বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই তার মনে প'ড়ে গেল, সুভদ্রা তার আগের বাসায় নেই, কোথায় আছে তাও তার অজ্ঞাত। মনে পড়তেই চমকে থমকে দাঁড়াল সে, সঙ্গে সঙ্গেই গভীর অবসাদে তার শরীর ও মন দুই-ই যেন এলিয়ে পড়ল।

এগিয়ে আর যেতে পারলে না সে; অক্ষম অনিচ্ছুক পা দুটিকে টেনে টেনে রাজপথ থেকে একটু দূরে গিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় ঘন একটা ঝোপের আড়ালে সে নির্জীবের মত ব'সে পড়ল। ভিতরে তার মনটা 'হায় হায়' করতে লাগল,—সুভদ্রার জন্য আর কিছুই তার করবার নেই, কাছে গিয়ে তাকে যে সে দুটি সান্ত্বনার কথা ব'লে আসবে সে পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে তার চোখের সামনে তখনও কেবল সুভদ্রার মুখখানিই যেন ভেসে বেড়াতে লাগল, কিন্তু সে মুখ আর এক রকমের। বিচিত্র সে মুখ,—বেদনায় ম্লান হ'লেও সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় পাথরের মত কঠিন; একটা অন্ধ ঔদাসীন্য, একটা নির্মম প্রত্যাখ্যান যেন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তাকে ঘিরে রয়েছে। সেদিন হাসপাতালের কেবিন-ঘরে সুভদ্রার এই মুখ দেখেই সসম্ভ্রম বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দৃষ্টিহীন চোখ দুটি দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর সুবোধ শরীরটাকে নাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল; সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে মনে মনে সে বললে, ভালই হয়েছে যে, যাবার আগে সুভদ্রা

তাকে কিছুই জানিয়ে যায় নি, কাছে যাবার পথটাকে পর্যন্ত নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়ে গিয়েছে। পথ খোলা থাকলেও কার কি লাভ হ'ত? আর এক বার সুভদ্রার কাছে গিয়ে তার কি উপকার করতে পারত সে? আগেই বা সে তার কি উপকার করতে পেরেছে? সুবোধের মনে পড়ল যে, অতীতে সুভদ্রার কোন উপকারই সে করতে পারে নি, উপকার করতে গিয়ে তাকে সে কেবল বিব্রতই করেছে। আজও ব্যাকুল হয়ে সুভদ্রার কাছে ছুটে গেলে সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ছাড়া নূতন আর কি ঘটতে পারত? ওই তো সুভদ্রা,—পরিখা আর প্রাচীর ঘেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমৃদ্ধ একটি রাজ্যের সে যেন গর্বিতা মহারাণী। যে কিছুই চায় না, তাকে কি দেবে সে? যে জিনিস ভক্ত পূজারীর অঞ্জলির মত অপরিসীম আগ্রহে সে তার পায়ে নিবেদন ক'রে দিতে পারে, তা তো আগেই সুভদ্রা পরিপূর্ণ উপেক্ষার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। কোন নামে, কোন রূপেই সে জিনিস তাকে সে নেওয়াতে পারে নি, বার বার সে জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে সুভদ্রা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাকে তার একেবারেই কোন দরকার নেই। নিজেও তো সে মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেছে যে, সুভদ্রার কোন উপকার করবার সাধ্যই তার নেই। যে একটিমাত্র উপকার করবার সাধ্য হয়তো তার ছিল, জগতে যে একটিমাত্র পুরুষ সুভদ্রার সত্যিকারের উপকার করতে পারে, ইচ্ছা করলেই তার সকল দুঃখ দূর ক'রে তার চরম লজ্জাকে পরম গৌরবে রূপান্তরিত করতে পারে, সেই অরুণাংশুর সঙ্গে সুভদ্রার মিলন ঘটিয়ে দেওয়া,—তার সম্ভাবনাটাও যখন আজ আর নেই, তখন সুভদ্রার কাছে যাবার পথ খোলা থাকলেও কি নিয়ে আজ সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারত? মৌখিক সান্ত্বনা? কি তার দাম? বিশেষ ক'রে আজকের দিনে সুভদ্রাকে মুখের কথার সান্ত্বনা দিতে গেলে তাকে সে কেবল বিব্রতই করবে না, হয়তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেবার মতই তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত হৃদয়ের জ্বালাই বাড়িয়ে দেবে। তবে কি দরকার তার কাছে যাবার?

একটা নিশ্বাস ফেলে সুবোধ উঠে দাঁড়াল; মনে মনে সে বললে, কোন দরকার নেই; সেদিন হাসপাতালের কেবিন-ঘরে সুভদ্রার সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যে হিসাবটাকে অমন ক'রে সে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে, আজ কোন

অজুহাতে তার জের টানবার প্রয়োজন আর নেই,—সুভদ্রার জন্য তো নয়ই, তার নিজের জন্যও নয়।

পথ চলতে চলতে মনে মনে মন্ত্রের মত সে আবৃত্তি করতে লাগল, পিছনের কোন ডাক, কোন টানেই তার ফিরে যাওয়া দূরে থাক্, ফিরে চাওয়াও আর চলবে না; নিজের মনের কোন আকাঙ্ক্ষাকেই শিকল হয়ে তার চলার গতিকে ব্যাহত করতে দেবে না সে; কোন দিকে কান না দিয়ে, কোথাও থমকে না দাঁড়িয়ে এবার সে সামনের দিকেই এগিয়ে যাবে—কেবলই সামনের দিকে—

কোথায় যাচ্ছেন, সুবোধবাবু?

চেনা গলার ডাক শুনে সুবোধ থমকে দাঁড়াল। সত্যই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে হুগলীর দিকে এগিয়ে চলেছে সে, বাষ্পীয় যানের জঠরস্থ বাষ্পের মত একটা অন্ধ উন্মত্ত আবেগ যেন ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

লোকটি তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, এই দুপুরবেলায় এদিকে কোথায় চলেছেন?

বিশেষ কোথাও নয়।—সুবোধ লজ্জিত স্বরে উত্তর দিলে, কাজকর্ম তো কিছুই নেই, সময় কাটাবার জন্য বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ল যে, যে কাজের জন্য অতখানি আশা আর আগ্রহ নিয়ে সে বিমলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তার কিছুই হয় নি। শ্যামাচরণের চোখের দিকে ভাল ক'রে সে তাকাতেই পারলে না; তার সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, কিছুই হ'ল না আজ। বিমল বললে যে, অরুণাংশু ফিরে না এলে কিছুই ঠিক করা যাবে না।

শ্যামাচরণের মুখ ম্লান হয়ে গেল। ওই দ্রুত রূপান্তরটা সুবোধের চোখ এড়াল না; তথাপি একটু পরে সঙ্কল্পের দৃঢ় স্বরেই সে আবার বললে, থাক্, শ্যামাচরণদা, নিজের ইচ্ছায় যারা সঙ্গে আসতে চায় না, তাদের নিয়ে টানাটানি করলে কোন লাভ নেই, তাতে বোঝাই বরং বাড়বে। তার চেয়ে, চল, আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাব; ওরা যদি বাধা দেয়, তবে সে বাধাকে জয় ক'রেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

দিন কয়েক পর সুবোধ সন্ধ্যার কাছাকাছি শুকনো ম্লান মুখে আপিসে ফিরে এসে শ্যামাচরণের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কিছুই হ'ল না, শ্যামাচরণ-দা ; টাকার জোগাড় হ'ল না।

শ্যামাচরণের মুখও শুকিয়ে গেল ; সে বললে, তা হ'লে তো মুশকিল হ'ল, সুবোধবাবু। টাকা না হ'লে এদিকে যে আর এক পা-ও চলবার উপায় নেই।

ধারে ইস্তাহারগুলো পাওয়া যায় না ? অন্তত অর্ধেক ?

না, টাকা না হ'লে ওরা একখানাও দেবে না ব'লে দিয়েছে।

একটি নিশ্বাস ফেলে সুবোধ বললে, তবে আজ থাক্, শ্যামাচরণদা, কাল আর এক বার চেষ্টা ক'রে দেখব।

কিন্তু পরদিন খুব ভোরেই শ্যামাচরণের বাসায় গিয়ে সুবোধ উৎফুল্ল স্বরে বললে, তোমার কোন ভাবনা নেই, শ্যামাচরণদা, আজ বৈকালেই পুরো টাকা তোমায় আমি এনে দেব।

শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, সত্যি বলছেন ? কোথায় পাবেন এত টাকা ?

সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, তা তোমার জানবার দরকার নেই। তুমি এখন চট্ ক'রে দুমুঠো ভাতে-ভাতের ব্যবস্থা কর দেখি, এই আটটার গাড়িই আমি ধরতে চাই।

দশটা বাজতে না বাজতেই সুবোধ কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সেটি বিশ্ববিখ্যাত একটি ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত ধনাগার। দুর্গের মত শক্ত, পাকা বাড়ি ; উপরে আপিস, মাটির নীচে কংক্রিটের গুদাম। চোর-ডাকাত এবং বিশেষ ক'রে এ যুগের বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে সকলের মূল্যবান মণিমুক্তা আর দলিলদস্তাবেজ বাঁচাবার জন্য মাটির নীচে দুর্গের মধ্যে আর একটি দুর্গ গড়া হয়েছে। বোমার ঘায়ে বাড়ি যদি ভেঙেও পড়ে, তবু মাটির নীচে রক্ষিত মালপত্র নষ্ট বা লুণ্ঠিত হবে না। ব্যবস্থা নিখুঁত। কংক্রিটের দুর্গের মধ্যে ইস্পাতের আলমারি সারি সারি সাজানো রয়েছে ; প্রত্যেকটিতেই পায়রার খোপের মত অসংখ্য খোপ। অল্প হারে দক্ষিণা দিয়ে যে কোন লোক যে কটি ইচ্ছা খোপ ভাড়া নিয়ে ওর মধ্যে যে কোন জিনিস

জমা রাখতে পারে। নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, আর কোন লোকের জানবারও কোন উপায় নেই। ইচ্ছামত গচ্ছিত জিনিস তুলে নেওয়াতেও কোন বাধা নেই।

ওরই একটা খোপের ভিতর থেকে সুবোধ ছোট একটি কাঠের বাক্স টেনে বের করলে; খুলে এক বার দেখলে, ভিতরের জিনিস ঠিক আছে কি না! দেখতে দেখতে তার ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসিও ফুটে উঠল। কিন্তু তখনই হাসি থামিয়ে বাক্সটি বন্ধ ক'রে, সেটি সযত্নে বগলদাবা ক'রে সে আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

লালদীঘির কোণ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সে ট্রামে চেপে বসল, নামলে বউবাজার আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের জংশনে।

মোড়ে গাড়ি আর লোকজনের ভিড় এত বেশি যে, সুবোধ তৎক্ষণাৎ রাস্তা পার হয়ে ওপারে যেতে পারলে না। তার পর পথটা ফাঁকা যখন হ'ল, তখন পড়ল বাধা।

আপনি সুবোধবাবু না?

ঠিক ফুটপাথ থেকে পথে নামবার মুখেই মেয়েলী সুরের ডাক শুনে সুবোধ থমকে দাঁড়াল; চমকে ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেলে যে, সত্যই একটি মহিলা পাশে দাঁড়িয়ে তারই মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। সাদা কাপড়, নিরাভরণ দেহ; কিন্তু মুখে-চোখে চমৎকার একটা বলিষ্ঠ সপ্রতিভ ভাব। চোখ পড়তেই সুবোধের মনে হ'ল যে, ও মুখ তার চেনা; পরের মুহূর্তেই এল বিশ্বাস,—ঠিক, এঁকেই সে প্রথমে সুভদ্রার মেসে এবং পরে হাসপাতালের কেবিনে সুভদ্রার কাছে দেখেছিল, ইনিই লোক পাঠিয়ে হুগলী থেকে তাকে ডেকে আনিয়ে—

আমায় চিনতে পারছেন না? আমি কমলা, সুভদ্রার ওখানে আপনি আমায় দেখেছেন।—মহিলাটিই আবার বললে।

সুবোধের আর সংশয় রইল না; অপ্রতিভের মত হাত তুলে মেয়েটিকে একটি নমস্কার ক'রে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, হ্যাঁ, মাফ করবেন, প্রথমে চিনতে পারি নি।

কমলা হেসে বললে, আমি কিন্তু পিছন থেকে দেখেই আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি।

তার পরেই হাসি থামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রার বাসা খুঁজছেন নাকি? কিন্তু এখানে কেন?

সুবোধের শরীরের সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন এক সঙ্গে ছুটে এসে তার হৃৎপিণ্ডের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল,—সুভদ্রা তা হ'লে কলকাতাতেই রয়েছে এবং কাছাকাছিই কোথাও তার বাসা!

কিন্তু আবিষ্কারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ওর আকস্মিকতাই সুবোধকে বিহ্বল ক'রে দিলে। সুভদ্রার সঙ্গে আর দেখা করবার উপায় নেই, এই অনুমানটার নীচেই সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা তার চাপা প'ড়ে গিয়েছিল; বিপরীত ইচ্ছাটাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই অনুমানেরই ওপর। কাজেই একটার আবরণ এবং আর একটার বনিয়াদ—ওই অনুমানটা ভেঙে যেতেই সুবোধের বুকের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ ইচ্ছার ঠোকাঠুকি লেগে গেল। সে যে সুভদ্রার বাসা খুঁজতে বেরোয় নি—এই স্বীকারোক্তিটা যেমন তার মুখে এল না, তেমনি কমলার কথাটা মুখের কথায় দূরে থাক্, ঘাড় নেড়েও সে মেনে নিতে পারলে না। ভেবেচিন্তে একটা উত্তর দেবার সময়ও পেলে না সে। কমলা তার নিজের কথার টানেই ব'লে চলল, এ মোড়ে নামাটা আপনার ভুল হয়েছে, সুবোধবাবু, অনেকটা এগিয়ে এসেছেন আপনি। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে খুঁজে খুঁজে কি হয়রানই না হতে হ'ত আপনাকে! চলুন, আমিও বাসায়ই ফিরছি, দুজনে এক সঙ্গেই যাই। ট্রামে যাবেন? একটু গিয়েই আবার নামতে হবে কিন্তু।

সুবোধ ঘেমে উঠেছিল। কমলার চোখ দুটি একেবারে তার মুখের উপর এসে পড়েছে; কেবল কমলার চোখই নয়, পাশাপাশি আরও অনেক কৌতূহলী দর্শকের জোড়া জোড়া চোখও। উপস্থিত এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই সে চোখ নামিয়ে ঢোক গিলে উত্তর দিলে, না, ট্রাম কেন, চলুন হেঁটেই যাই।

তাই চলুন, খুব বেশি দূর তো নয়!—ব'লে কমলা এগিয়ে চলল, সুবোধও চলল তার অনুসরণ ক'রে। কিন্তু একটু এগিয়েই কমলা থমকে দাঁড়াল, পরে

সুবোধের পাশাপাশি চলতে চলতে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, ভাগ্যিস আজ আপনার দেখা পেলাম আমি! সেদিন না জেনে আপনার উপর কত বড় অবিচারই না করেছিলাম! অথচ অমন তাড়াতাড়ি আপনি চ'লে গেলেন—আপনার কাছে মাফ চাইবারও সময় পেলাম না।

না না।—সুবোধ কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, তার কিছু দরকার ছিল না।

আপনার দিক থেকে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই ছিল।—কমলা বাধা দিয়ে বললে।

প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যই সুবোধ জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রা দেবী কেমন আছেন?

আছে ভালই।—কমলা উত্তরে বললে, মানে, তার অবস্থায় মেয়েমানুষ যেমন ভাল থাকতে পারে তেমনি আছে।

তার পরে তার আগের কথাটারই খেই ধ'রে সে আবার বললে, সুভদ্রার কাছে সব কথাই আমি শুনেছি, সুবোধবাবু; শুনে আপনার ওপর কি শ্রদ্ধাই যে আমার হয়েছে, মনে হচ্ছে যে হেঁট হয়ে এখনই আপনার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিই।

না না।—সুবোধ সঙ্কুচিত হয়ে বললে।

না আবার! কমলা উত্তর দিলে ঝাঁজের স্বরে, কোন পুরুষ কোন মেয়ের জন্য যা করতে পারে না, ওর জন্য তা-ই আপনি করতে চেয়েছিলেন। ও নিতান্ত উন্মাদ ব'লেই না আপনার অত বড় দানটাকে প্রত্যাখ্যান করলে!

না, কমলা দেবী।—সুবোধ এবারেও কুণ্ঠিত স্বরেই বললে, উনি ঠিকই করেছেন। আমারই ভুল হয়েছিল; শুধু ভুল নয়, অন্যায়। ওর [illegible] সত্যনিষ্ঠা সে ভুলের নাগপাশ থেকে আমাদের দুজনকেই রক্ষা করেছে।

কমলা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এক বার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর আবার চলতে শুরু ক'রে স্বরটা একটু নামিয়ে আবার বললে, ও-কথা আমি বুঝি, সুবোধবাবু; আমার ধর্ম আলাদা হ'লেও আমিও তো এই দেশেরই মেয়ে। তবু ওই হতভাগিনী মেয়েটার জন্য বড় দুঃখ হয় আমার। এত বড় কলঙ্কের এত কালি মুখে মেখে ও যে কেমন ক'রে এই দশজনের সংসারে বেঁচে থাকবে, তাই আমি ভেবে পাই নে।

ঠিক এই কথা এই রকমেই সুবোধ বরাবরই ভেবে এসেছে। তাই আজ কমলার কথার কোন প্রত্যুত্তর তার মুখে কুটল না।

একটু পরে কমলাই তার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, জানেন, সুবোধবাবু? সুভদ্রা আলাদা একটা বাসা নিয়ে সেখানে একা থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার সাহস হ'ল না; ভয় হ'ল, পাছে দুঃখ আর নৈরাশ্যের তাড়নায় ও ভয়ঙ্কর কিছু একটা কাজ ক'রে বসে। তাই নিজেও আমি ওর ওখানেই উঠে এসেছি।

তাই নাকি?—সুবোধ সচকিত বিস্ময়ের স্বরে বললে; তার কুণ্ঠিত, নিষ্প্রভ চোখ দুটি সহসা কৌতূহল আর প্রত্যাশায় যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সে দিন সুবোধ চ'লে যাবার পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি কমলা সংক্ষেপে সুবোধকে শুনিয়ে দিলে; বাসার কথা, নূতন-পাতা সংসারের কথাও বাকি রাখলে না।

শুনে সুবোধের বুকের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গাঢ় স্বরে সে বললে, আমার মস্ত একটা দুর্ভাবনা আজ কেটে গেল, কমলা দেবী। আমি তো চেষ্টা ক'রেও ওঁর কোন উপকার করতে পারি নি, ওঁর এই সঙ্কটের কালটা কোথায়, কেমন ক'রে কাটবে, তাই ভেবে মনে মনে কেবল দুঃখ আর উদ্বেগই ভোগ করেছি। উনি আপনার আশ্রয় পেয়েছেন জেনে আজ আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ওঁর এই দুর্দিনে আপনি যা ওঁর জন্যে করেছেন, তার তুলনা হয় না।

নিজের প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে কমলা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি আর কি করেছি, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যা কর্তব্য, তার বেশি কিছু তো নয়—

কিন্তু সে-ও তো সামান্য নয়!—সুবোধ উচ্ছ্বাসের স্বরেই উত্তর দিলে, সংসারে কজন বন্ধু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ক'রে থাকে?—আর তা-ও এ রকম অবস্থায়! সাহায্য করা দূরে থাক্, এ অবস্থায় সব বন্ধুই তো ধিক্কার দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আপনি ওঁর জন্য যা করেছেন এবং করছেন, এ তো সত্যি অতুলনীয়!

না।—কমলা আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এ অতি সামান্য,—কিছু নয়

বললেই চলে। তার পরেই হেসে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, আর যা করেছি সে তো আমারই স্বার্থের জন্য।

স্বার্থ! সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, স্বার্থ কি বলছেন আপনি!

স্বার্থ বইকি!—কমলা লজ্জিতের মত মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে, স্বার্থ ছাড়া মানুষ কোন কাজ করে নাকি? আর মেয়েমানুষের কত রকমের স্বার্থ থাকতে পারে তা আপনারা কি বুঝবেন?

সুবোধের বিহ্বল চোখ দুটিতে ক্রমান্বয়ে বিস্ময়, সন্দেহ ও আশঙ্কার ছায়া খেলে গেল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হেসে ফেলেই বললে, না, কমলা দেবী; বিনয়ের আতিশয্যে নিজের উপর নিজে আপনি যতই অবিচার করুন না কেন, আমাকে ভুলিয়ে আমাকে দিয়ে আপনার উপর অবিচার আপনি করাতে পারবেন না। মেয়ে হয়ে সমাজের বুকের উপর ব'সে এত বড় দুঃসাহসের কাজ যিনি করতে পারেন, কারও মুখের কোন কথাতেই তাঁর প্রতি আমার অশ্রদ্ধা হবে না।

কমলা এবার শব্দ ক'রে হেসে উঠে বললে শোন কথা!—আপনিও যে ওই সুভদ্রার মত কথা বলতে শুরু করলেন! আমার আবার সমাজ আছে নাকি? যার তিন কুলে কেউ নেই, তার আবার সমাজ!

কিন্তু পরের মুহূর্তেই হাসি থামিয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু কিছুই হ'ল না, সুবোধবাবু। এত ক'রেও ওর সত্যিকারের উপকার আমি করতে পারলাম না।

কেন, বলুন তো!—সুবোধ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর শরীর কি ভাল যাচ্ছে না?

না, শরীরের কথা নয়।—কমলা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে, শরীর তার ভালই আছে। কিন্তু শরীরের ভালই তো সব নয়। মুখে ওর হাসি একেবারেই নেই। আর এত চেষ্টা ক'রেও হাসি আমি ফোটাতেও পারলাম না।

সুবোধ চুপ ক'রে রইল, এ কথার কি উত্তর দেবে সে!

একটু পরে কমলাই আবার বললে, আর হাসি আসবেই বা কোথা থেকে? হাসির উৎসই যে ওর শুকিয়ে গিয়েছে। জীবনটা নিয়ে হতভাগী জুয়া খেলতে

গিয়েছিল, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। ও যে পাগল হয়ে যায় নি, এই তো একটা বিস্ময়।

এবারও সুবোধ উত্তর দিলে না। তার স্মৃতির সমুদ্র তখন আলোড়িত হয়ে উঠেছে। এক সঙ্গে অনেক কথাই তার মনে প'ড়ে গেল,—সুভদ্রার কথা, তার নিজের কথা, অরুণাংশুর কথা। মনে পড়ল, অরুণাংশু বিয়ে করতে গিয়েছে, হয়তো এত দিনে বিয়ে তার হয়েও গিয়েছে। আর এ দিকে হতভাগিনী সুভদ্রা তারই সন্তান গর্ভে নিয়ে লজ্জায়, দুঃখে ঘরের কোণে আত্মগোপন ক'রে দিন কাটাচ্ছে। সুভদ্রার বিবর্ণ, ম্লান মুখখানি আবার যেন সে তার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগল।

কমলাও কিছুক্ষণ আর কোন কথা বললে না। কিন্তু বউবাজার আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে এসে তাদের দুজনকেই যখন থমকে দাঁড়াতে হ'ল, তখন ওই আগের কথাটারই জের টেনে কমলাই আবার বললে, আমি ওর সত্যিকারের উপকারের কথা বলছিলাম, সুবোধবাবু। আশ্রয় দিয়ে বা কাছে থেকে ওর দুঃখ তো আমি ঘুচাতে পারব না। যে ভাবে পারতাম, তা ও আমায় করতেই দিলে না। হতভাগী কি যে গোঁ ধ'রে বসেছে, সেই লোকটির নাম বা ঠিকানা ও কিছুতেই দেবে না।

সুবোধের মুখে আসছিল—দিলেও কোন লাভ হবে না। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। আর কোন কথাও সে বললে না।

কিন্তু একটু পরে কমলাই তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, আচ্ছা, সুবোধবাবু, সুভদ্রার এত বড় সর্বনাশ ক'রেও লোকটা পালিয়ে যেতে পারলে? আপনিও কিছু করতে পারলেন না? আপনি তো সবই জানেন।

না।—সুবোধ হঠাৎ মাথা নেড়ে কণ্ঠস্বরে একটু অতিরিক্ত জোর দিয়েই ব'লে উঠল।

কমলা বিস্মিত হয়ে বললে, কি 'না'? আপনি কিছু করতে পারলেন না, না, কিছু আপনি জানেনই না?

কমলার দৃষ্টি এড়িয়ে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমায় মাফ করবেন, কমলা দেবী,—সে দিনই তো বলেছি আপনাকে যে, আমার নিজের কথা ছাড়া আর কোন কথাই আপনাকে আমি বলতে পারব না।

তা বটে।—কমলা একটি নিশ্বাস ছেড়ে বললে, থাক্ তবে। ওর মুখ থেকেই কথা যখন আমি বের করতে পারি নি, তখন আপনাকে আর কি বলব! চলুন, পথ এবার খুলেছে।

বড় রাস্তাটা দুজনে নিঃশব্দেই পার হয়ে গেল। কিন্তু ও-পারের ফুটপাথে গিয়ে উঠবার পরেই কমলা আবার সুবোধের কাছে এগিয়ে এসে বিষণ্ণ, গম্ভীর স্বরে বললে, আমিও হাল ছেড়ে দিয়েছি, সুবোধবাবু। তবে এখনও থেকে থেকে কেবল এই কথাটাই আমার মনে উঠছে—যে লোকটা ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পেরেছে, সেই নরপশুটাকেই এত ভাল ও বাসল কেমন ক'রে?

সুবোধ চমকে কমলার মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে সে বললে, আপনাদের বাসা আর কত দূর?

মৃদু স্বরে উত্তর হ'ল, না, আর বেশি দূরে নয়, প্রায় এসেই গিয়েছি আমরা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে সুবোধের মনে হচ্ছিল যে, তার হৃদ্‌যন্ত্রটার গতি যেন তিন গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সুভদ্রার উপর তার চোখ পড়তেই এক নিমেষেই সেটা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

নিজের ঘরে তক্তপোশের উপর ব'সে সুভদ্রা এক মনে ছোট একখানা কাঁথা সেলাই করছিল। এক নিমেষের দেখাতেই সুবোধ বুঝলে যে, যে সত্যটা এত দিন ঢাকা ছিল, সেটাই এবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সে দিন হাসপাতালে যে সুভদ্রাকে সে দেখে গিয়েছিল, একে সেই মেয়ে ব'লে যেন চেনাই যায় না। এর দেহের গঠনে, কেশের রুক্ষতায়, চোখের নীচের ঘন কালিমায়, মুখের অসাধারণ পাণ্ডুরতায় আসন্ন মাতৃত্বের অবিসংবাদিত সব প্রমাণ আঁকা হয়ে গিয়েছে; হাতের কাজের ভিতর দিয়ে উপচে পড়ছে ওর ভরা বুকের বাৎসল্যরস; পাণ্ডুর মুখের শান্ত গাম্ভীর্যে মাতৃত্বের অনৈসর্গিক মহিমা দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এত দিন যা ছিল শোনা কথা মাত্র, তাই আজ সুবোধ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলে। আজ সে নিঃসংশয়েই বুঝলে যে, সুভদ্রার গর্ভে সন্তান রয়েছে, আর সে সন্তান অরুণাংশুর।

বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই কমলার মুখের কথাটা সুবোধের মনে প'ড়ে গেল,—এত ভাল তাকে ও বাসলে কেমন ক'রে!

সঙ্গে সঙ্গেই কালিদাসের শকুন্তলাকে তার মনে পড়ল,—অমর কবির মানসকন্যা সেই শকুন্তলার মতই এই সুভদ্রা অরুণাংশুর জন্যই বুকভরা ভালবাসা নিয়ে অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে ; হয়তো আজও তার আশা আর বিশ্বাস রয়েছে যে, শকুন্তলার দুষ্মন্তের মতই তার অরুণাংশু আবার তার কাছে ফিরে আসবে।

ওমা, সুবোধবাবু যে!—সুভদ্রারই গলার আওয়াজ তার কানে এসে সুবোধের স্বপ্ন ভেঙে দিলে।

পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলেই সুভদ্রা কমলার পিছনে সুবোধকে দেখতে পেয়েছিল। প্রথমে নিজের চোখ দুটিকেই সে বিশ্বাস করতে পারে নি ; কিন্তু তার পরেই তার পাণ্ডুর মুখখানি লালের ছোপ লেগে বিচিত্র হয়ে উঠল। লুকাবার চেষ্টায় হাতের কাঁথাখানিকে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে অস্ফুট স্বরে সে ব'লে উঠল, ওমা, সুবোধবাবু যে !

উত্তর দিলে কমলা ; শব্দ ক'রে হেসে উঠে সে বললে, হ্যা রে, সুবোধবাবুই তো। আমিও প্রথমে তোর মত চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে আমাদের বাসা হয়তো উনি খুঁজেই পেতেন না। ট্রাম থেকে কোথায় উনি নেমেছিলেন জানিস? সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে। তার পর আমি সঙ্গে নিয়ে এলাম।

ততক্ষণে সুভদ্রা খাট থেকে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল ; বুকের উপর আঁচলটাকে আরও একটা ফেরতা দিয়ে সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওঁকে ও-ঘরে নিয়ে বসাও না, কমলা ; আমি এক্ষুনি আসছি।

অবস্থাটা বুঝতে পারলে কমলা ; অপ্রতিভের মত সে বললে, আসুন সুবোধবাবু, ও-ঘরে আমরা বসি।

সুবোধ যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেল ; বসলেও জড় একটা মাংসপিণ্ডের মত। কমলার একটা কথারও উত্তর দিলে না সে। একটা রূঢ় আঘাতে মনটা তখন তার বিকল হয়ে গিয়েছে। কেবল সুভদ্রার মূর্তিই যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে,—রক্তমাংসের মানুষের মূর্তি সে নয়, সে যেন সর্বনাশের জীবন্ত এক প্রতিমূর্তি।

পথে কমলার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

বিশেষ ক'রে শেষের দিকে কমলার সেই প্রশ্নটা—আপনিও কিছু করতে পারলেন না, আপনি তো সবই জানেন! হঠাৎ শক্ত আঘাত চিন্তার বিশেষ একটা নূতন ধারাকে খুলে দিয়েছিল। সেই স্রোতই এখন তরতর ক'রে ব'য়ে চলল।

মনটা তার 'হায় হায়' ক'রে উঠল, এ কি সর্বনাশ করেছে সে! সুভদ্রার নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে সময় থাকতে অরুণাংশুকে খবরটা জানিয়ে দিলেই হয়তো সুভদ্রার জীবনের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। অরুণাংশুর মত লোক হয়তো তার পিতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার ক'রে সুভদ্রাকে অকূলে ভাসাত না। কিন্তু অরুণাংশুকে কথাটা সে জানায় নি কেন? সুভদ্রা নিষেধ করেছিল, তাই? ছোট একটা সত্য রক্ষা করবার জন্য অনেক বড় আর একটা সত্যকে এত দিন সে গোপন করেছে কেন?—একটার পর আর একটা প্রশ্ন সুবোধের মনে জেগে উঠতে লাগল। শুধু প্রশ্ন নয়, ওদের উত্তরও। ঘন মেঘের ফাঁকে সূর্যের উঁকিঝুঁকির মত একটা যেন নূতন সত্যের আভাস পাচ্ছিল সে। গর্ভবতী সুভদ্রার লজ্জাকুণ্ঠিত চোখের দিকে তাকিয়ে এক নিমেষেই সেই কঠিন, ভাস্বর সত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে।

সে তার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। শুধু সুভদ্রার পরিপূর্ণ রূপটিকেই নয়, দর্পণের মত সুভদ্রার রূপের মধ্যে সে তার নিজের আসল রূপটিকেও যেন প্রত্যক্ষ করেছে। হতভাগিনী সুভদ্রার চরম সর্বনাশের জাজ্জল্যমান রূপের মধ্যেই তার নিজের অবিস্মরণীয় ও অমার্জনীয় অপকীর্তির কুৎসিত রূপকেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে। ওরই প্রতিক্রিয়ায় তার শরীর ও মন বার বার শিউরে উঠতে লাগল; প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হতে লাগল যে, একা অরুণাংশুই সুভদ্রার সর্বনাশ করে নি, সত্য কথাটা জানবার পরেও সময় থাকতে সকল কথা অরুণাংশুকে না জানিয়ে সে নিজেও ওই সর্বনাশের আগুনে বার বার ইন্ধন জুগিয়েছে। সুভদ্রার নিষেধাজ্ঞাটির আশ্রয়ে এত দিন তার নিজের মনের কালো কামনাটিই যে তার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, এই রূঢ় সত্যটির নিঃসংশয় উপলব্ধিই হঠাৎ যেন কঠিন আঘাত দিয়ে তার মনটাকে একেবারে বিকল ক'রে দিলে। তার অপরাধী অনুতপ্ত চিত্ত বার বার যেন 'হায়' 'হায়' ক'রে বলতে লাগল, সর্বনাশ করেছে সে; দুঃখে সমব্যথিনী, কর্মে

সহকারিণী, মূর্তিমতী মমতা ও প্রেরণার মত যে মেয়েটি চাওয়ার অপেক্ষা না ক'রে, নিজের লাভ-লোকসানের কোন হিসাব না ক'রে কেবল নারীর যৌবন-সমৃদ্ধ দেহটিকে ছাড়া মানুষের কাছে মানুষের কাম্য আর সকল জিনিসই লক্ষ্মীর মত উদার হয়ে বার বার তাকে দান ক'রে এসেছে, নারী-হৃদয়ের অমৃতরসও তেমনি অকৃপণ হস্তে পরিবেশন ক'রে তার হৃদয়ের পাত্রটি কানায় কানায় ভ'রে দিয়েছে, অত্যন্ত স্থূল, প্রচ্ছন্ন একটা আত্মস্বাৎপ্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিশ্রুতি পালনের অজুহাতে অরুণাংশুর কাছে সত্য গোপন ক'রে সেই মেয়েটিরই এ কি নিদারুণ সর্বনাশ করেছে সে! বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ক্ষতিপূরণ দিয়েও তো এর ব্যর্থ জীবনকে আজ আর সার্থক করবার উপায় নেই!

কমলার কাছ থেকেও আত্মগোপন করবার চেষ্টায় কুণ্ঠিত, বিবর্ণ মুখখানিকে নত ক'রে সুবোধ জড়সড় হয়ে ব'সে রইল। মিনিট পাঁচেক পর সুভদ্রা আবার যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন তার মুখের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতেই পারলে না।

কিন্তু সুভদ্রার ব্যবহারে একটুও সঙ্কোচ প্রকাশ পেল না। সুবোধের ঠিক সামনের চৌকিখানিতেই ব'সে প'ড়ে মুখ টিপে অল্প একটু হেসে সে বললে, তবু ভাল যে, আপনি এলেন; আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

বিস্মিত হবার মত মনের অবস্থা থাকলে সুবোধ বিস্মিতই হয়তো হ'ত, কিন্তু কোন রকম ভাব তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠবার আগেই কমলা কুণ্ঠিত হাসিভরা চোখে এক বার সুভদ্রা ও এক বার সুবোধের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, সুবোধবাবুকে বলতে সাহস হচ্ছিল না, সুভদ্রা, গরিবের বাড়িতে ঠিক সময়েই যখন দয়া ক'রে উনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন দুটি শাকভাত ওঁর পাতে দিয়ে ধন্য হবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তুই দেখ্ না জিজ্ঞেস ক'রে, আমাদের ক্ষুদকুড়ো ওঁর মুখে রুচবে?

সুভদ্রা সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সহাস্য কণ্ঠে বললে, দুটি ভাত খাবেন, সুবোধবাবু?

না।—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, এই তো একটু আগে খেয়ে এসেছি, খেয়েই গাড়িতে চেপেছিলাম কিনা!

বিব্রতের মত একটু চুপ ক'রে রইল সুভদ্রা; তার পর কমলার মুখের দিকে চেয়ে বললে, থাক্, তুমি বরং একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

না, চা-ও দরকার নেই।—সুবোধ আবার প্রতিবাদ ক'রে বললে, ক্ষিদে একেবারেই নেই। আমায় বরং এক গ্লাস জল দিন।

তা কি হয়!—কমলা পরিহাসের স্বরে উত্তর দিলে, দুপুর রোদে বাইরে থেকে তেতে-পুড়ে এসে ঠাণ্ডা জল খেলে অসুখ করবে যে! একটু বসুন আপনি, গল্প করুন ওর সঙ্গে; আমি চা ক'রে আনছি।

কমলা চ'লে যেতেই সুভদ্রা গলা একটু খাটো ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি, সুবোধবাবু? আমার বাসার খোঁজ পেলেন কেমন ক'রে?

সুবোধ আরও যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল; বললে, না সুভদ্রা দেবী, আপনার বাসার খোঁজ করি নি আমি।

ঢোক গিলে সে আবার বললে, আপনি কোথায় আছেন, কিছুই জানতাম না আমি। কলকাতায় এসেছিলাম আমার নিজের একটা কাজে। পথে ওঁর সঙ্গে দেখা হতেই উনি ভাবলেন যে, আমি আপনার বাসার খোঁজ করছি।

তাই বলুন।—সুভদ্রা যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, এবারও ওই খ্যাপাটে মেয়েটাই এই কাণ্ড বাধিয়েছে। অথচ বলছে কিনা— আমি তো শুনে অবাক। আমার মেসে সকলকে আমি বারণ ক'রে দিয়ে এসেছি, কাউকে যেন আমার ঠিকানা দেওয়া না হয়। সেখান থেকে কেউ আমার ঠিকানা জানতে পারবে, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

না, ওঁরা কেউ বলেন নি।—সুবোধ উত্তরে বললে, বরং বলেছেন যে, আপনার ঠিকানা ওঁদের জানাই নেই,—মানে, কিছু দিন আগে শ্যামাচরণদা ওখানে গিয়েছিল কিনা!

শ্যামাচরণদা এসেছিল না কি? সুভদ্রা রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ।—সুবোধ উত্তর দিলে, আপনার অসুখের খবর শুনে দেখতে এসেছিল। সে-ই তো ফিরে গিয়ে আমায় বললে।

ম্লান মুখে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুভদ্রা যেন আপন মনেই ব'লে উঠল, আহা, বেচারী! মিছামিছি তাকে হয়রান হতে হয়েছে।

একটু থেমে সে সোজা হয়ে ব'সে আবার বললে, আমারই দোষ হয়েছে সুবোধবাবু ; কাউকে আমার ঠিকানা জানাতে আমিই বারণ ক'রে এসেছি, নিজেও কাউকে আমার ঠিকানা আমি জানাই নি।

ভালই করেছেন।—সুবোধ তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, সে বার আপনার ঠিকানা জানা থাকাতেই তো শ্যামাচরণদা এসে আপনাকে হুগলীতে টেনে নিয়ে গেল। সে জন্য এমন লজ্জায় আছি আমি—

সে জন্ত নয়, সুবোধবাবু সুভদ্রা বাধা দিয়ে মাথা নেড়ে বললে, সে বার আমি তো গিয়েছিলাম আমার নিজের গরজে, শ্যামাচরণদা আমায় টেনে নিয়ে যাবে কেন? এ বার আমি ডুব দিয়েছি একেবারে অন্য কারণে। কারও কোন কাজেই যখন আসব না, তখন কি দরকার দশ জনকে আমার ঠিকানা জানিয়ে? শরীরটা আমার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে কিনা!

সুবোধ অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে। সুভদ্রাও তৎক্ষণাৎ সামলে নিলে নিজেকে। গলার আওয়াজটা একেবারে বদলে দিয়ে সে আবার বললে, আজ কি হয়েছে, জানেন? এখন বুঝতে পেরেছি আমি। এখানে এসে অবধিই কমলা আমাকে পীড়াপীড়ি করছিল ; রোজই বলছিল আপনাকে চিঠি লিখতে। ওর দারুণ ইচ্ছে হয়েছে যে, ও আপনার কাছে মাফ চাইবে। পাছে আমি কিছু না করলে ও নিজেই আবার আপনার কাছে চিঠি লিখে বা লোক পাঠিয়ে সে বারের মত একটা কাণ্ড ক'রে বসে, সেই ভয়ে কদিন আগে মিথ্যে ক'রে ওকে আমি বলেছিলাম যে, আমিই আপনাকে চিঠিতে আসতে লিখেছি। সেই জন্যই আপনাকে দেখেই ওর মনে হয়েছে যে, বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আজ আপনি কলকাতায় এসেছেন।

একটু থেমে হঠাৎ শব্দ ক'রে হেসে উঠে সে আবার বললে, একেবারে খ্যাপা মেয়ে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে, কমলা একটা বদ্ধ পাগল।

হাসির শব্দে চমকে মুখ তুললে সুবোধ ; স্পষ্টই দেখতে পেলে যে, সে হাসির মধ্যে কৃত্রিমতা একটুও নেই, পাণ্ডুর মুখখানি অন্তরের আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুবোধ অবাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে ঢুকেই প্রথমে যে সুভদ্রাকে সে দেখতে পেয়েছিল, এ যেন সে সুভদ্রাই নয়। এর কথা বা ব্যবহারে লজ্জা বা কুণ্ঠার লেশমাত্রও নেই ; একে দেখে মনেও হয় না যে, এর

মনে কোন দুঃখ আছে। এর চোখ স্বচ্ছ, দৃষ্টি সোজা, মাঝে মাঝে তাতে যে লজ্জার আবেশ নেমে আসছে, তাতে মাধুর্যই আছে, অনুতাপ বা ভীতির আভাসমাত্রও নেই। এর মুখের কৌতুকের হাসি এক মধুর বিস্ময়। একটু আগেই সর্বনাশের যে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছে মনে ক'রে সুবোধ ভয়ে দুঃখে ও অনুতাপে শিউরে উঠেছিল, তার সঙ্গে এ সুভদ্রার কোন জায়গাতেই যেন মিল নেই।

এ ঘরে সুভদ্রাকে প্রথমে দেখেই সুবোধ বিস্মিত হয়েছিল। এবার তার সকৌতুক, সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল।

বিস্মিত সুবোধকে আরও বিস্মিত ক'রে দিয়ে সুভদ্রাই আবার বললে' আমার ভাগ্য ভাল যে, কমলার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। সেই জন্যই তো আপনার দেখা আজ পেলাম।

সুবোধ উত্তর দিলে না; কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রাই আবার বললে, কত দিন কত বার যে আপনাদের কথা আমার মনে হয়েছে, বললে হয়তো আপনি বিশ্বাসই করবেন না। সত্যি, অনেক কথা জানতে সাধ হচ্ছে আমার। বলুন, সুবোধবাবু, কি করছেন আজকাল? কাগজ প'ড়ে সব কথা বুঝতে পারছি নে।

সঙ্কোচ ভাঙতে কিছু সময় লাগল; কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক কথাই খুলে বললে সুবোধ,—বর্তমান অবস্থা, আগামী আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবিতা, ওর পরিকল্পনা, ওর দাবি, ওরই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আরও অনেক কথা।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। সে প্রশ্ন করলে না, সমালোচনা করলে না; কেবল অনেকক্ষণ পর সুবোধের কথার মাঝখানেই হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, এত বড় একটা কাজের সময়ে আমি যে আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না, সুবোধবাবু, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

বাধা পেয়েই সুবোধ থেমে গিয়েছিল। সুভদ্রার কথা শুনে তার বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন আলোড়িত হয়ে উঠল। না-পাওয়ার অবিসংবাদিত উপলব্ধির মধ্যেও মাঝে মাঝেই সুনিশ্চিত প্রাপ্তির নিবিড় আনন্দ তার বুকের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি করেছে, এখনও সেই আবেগই যেন তার অন্তরের

প্রত্যেকটি শিরা এবং উপশিরাকে কাঁপিয়ে তুললে। কিন্তু সাগ্রহে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরে যে কথাটা সে বলবার উপক্রম করেছিল, তা তার মুখে ফুটবার আগেই চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে কমলা ঘরে এসে ঢুকল।

দুজনেরই হাত ভরা,—হয় খাদ্য, নয় খাওয়ার সরঞ্জাম। অল্প সময়ের মধ্যেই কমলা বেশ আয়োজন করেছে,—টোস্ট-রুটি, অম্‌লেট, খানকতক গরম নিমকি, বাজারের মিষ্টি আর চা। জিনিসগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কমলা কুণ্ঠিত হাসি মুখে বললে, একটু দেরি হয়ে গেল, সুবোধবাবু,—মাফ করবেন আশা করি।

কিন্তু আয়োজন দেখে সুবোধ সত্য সত্যই আঁতকে উঠে বললে, সর্বনাশ করেছেন! এত আমি খাব কেমন ক'রে?

এত আবার কোথায় দেখছেন!—কমলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে উত্তর দিলে, খালি তো চা, তার আবার—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে একেবারে আর এক সুরে সে আবার বললে, চা-টা ওঁকে তুমি ঢেলে দাও, সুভদ্রা; আর খুব যদি ইচ্ছে হয় তো তুমি নিজেও একটু খেতে পার, তবে আধ বাটির বেশি যেন না হয়।

কমলা স্বাস্থ্যের অজুহাতে সুভদ্রার চয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছিল। সেই হুকুমটাই যে আবার সে তাকে মনে করিয়ে দিলে সেটা বুঝতে পেরে সুভদ্রা লজ্জিত স্বরে উত্তর দিলে, আমার আধ বাটিরও দরকার নেই। কিন্তু তোমার? পুরো দু বাটি তোমার চাই তো?

না ভাই, এক ফোঁটাও নয়।—কমলা হেসে ফেলে বললে, ইচ্ছে থাকলেও সময় আমার একেবারেই নেই।

তার পর হাসি থামিয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, আমায় মাফ করতে হবে, সুবোধবাবু। নিজে কাছে থেকে আপনাকে আমি খাওয়াতে পারব না। স্নানটা এক্ষুনি আমায় সেরে নিতে হবে আর বাইরে যেতে হবে ঠিক দেড় ঘণ্টা পরে। এরই মধ্যে মাঝের কাজটাও না সারলে সারা দিন আমায় উপোষ ক'রে মরতে হবে।

কমলা আর দাঁড়াল না। সুভদ্রা অপ্রতিভের মত এক বার বাইরের দিকে

এবং এক বার সুবোধের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে শেষে হেসে ফেলেই বললে, কি আর করবেন, সুবোধবাবু, ওই ওর স্বভাব। যত্ন ক'রে আয়োজন যখন ও করেছে, তখন যা পারেন তাই মুখে দিন।

বলতে বলতে একটা প্লেট সে সুবোধের দিকে এগিয়ে দিলে; এক জোড়া পেয়ালা-পিরিচ সে নিজের কাছে টেনে আনলে, তার পর টী-পটটি। কিন্তু এই সব নাড়াচাড়া করতে গিয়েই তার হাতের ঠেলা লেগে সুবোধের বাক্সটি টেবিলের উপর থেকে ঝনঝন শব্দে নীচে প'ড়ে গেল।

সুভদ্রা অপ্রতিভের মত বললে, এই যা!—সঙ্গে সঙ্গেই হেঁট হয়ে বাক্সটি সে হাতে তুলে নিলে।

সুবোধও বাক্সটি তুলবার জন্য হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়েছিল, সেটি সুভদ্রার হাতে দেখেই ব্যাকুল স্বরে সে বললে, ওটি আমায় দিন, সুভদ্রা দেবী।

সুবোধের ভাব দেখে সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, এতে কি আছে, সুবোধবাবু?

উত্তরে আগের চেয়েও। ব্যাকুল স্বরে সুবোধ বললে, কিছু না; ওটা ফেরত দিন আমায়।

সুভদ্রা আরও বিস্মিত হ'ল; ইচ্ছা ক'রেই বাক্সটিকে এক বার খুব জোরে নাড়া দিলে সে; ভিতর থেকে চাপা হ'লেও বেশ মিষ্টি টুংটাং একটা আওয়াজ তার কানে এল। শুনে কৌতূহলের চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, কি আছে এতে, সুবোধবাবু?

সুবোধ অসহিষ্ণুর মত মাথা ঝেঁকে উত্তর দিলে, কিচ্ছু না, ওটা ফেরত দিন আমায়।

কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সুভদ্রা ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে বললে, কিছু যদি না-ই এতে থাকে, তবে অত উতলা হয়ে এটা ফেরত চাচ্ছেন কেন? থাক্ না এটা আমারই কাছে।—বলতে বলতে বাক্সটাকে সে নিজের কোলের উপর রেখে দিলে। তার পর পেয়ালাতে চা ঢেলে সেটি সুবোধের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে আবার বললে, খাওয়াটা আগে সেরে নিন, আপনার বাক্স আমার কাছ থেকে উড়ে যাবে না।

নিরুপায় হয়ে সুবোধ নিমকির একটা টুকরা মুখে পুরে দিলে। কিন্তু তার

মনটা যে ওই বাক্সের উপরেই প'ড়ে রইল, তার প্রমাণ প্রতি মুহূর্তেই তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ফুটে উঠতে লাগল। কতকটা সন্দেহ, কতকটা কৌতুকের দৃষ্টিতে সুভদ্রা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর বাক্সটা আবার হাতে তুলে নিয়ে আবদারের মত ক'রে বললে, বলুন না, সুবোধবাবু, কি আছে এতে ?

সুবোধ খাওয়াই যেন ভুলে গেল ; তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আবার ব্যাকুল স্বরে সে বললে, ওটা আমায় ফিরিয়ে দিন, সুভদ্রা দেবী, ওতে কিছু নেই।

উহুঁ।—সুভদ্রা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, কিছু না থাকলে কি এ রকম আওয়াজ হয়!—বলতে বলতে আবার বাক্সটিকে নাড়া দিলে সে ; আবার সেই টুংটাং মিষ্টি আওয়াজ শোনা গেল।

উপায়ান্তর না দেখেই একটু পরে সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ওতে এক জোড়া বালা আছে।

বালা !—সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে বললে, কিসের বালা ?

ঢোক গিলে সুবোধ উত্তর দিলে, সোনার।

সুভদ্রার দুই চোখের সকৌতুক দৃষ্টি অকস্মাৎ অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে ; তার পর হেঁট হয়ে বাক্সটিকে সে খুলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অনেক টানাটানি ক'রেও ডালাটাকে নাড়াতে না পেরে আবার সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, চাবি আছে ? দিন তো।

হাতের পেয়ালাটা মুখের কাছ থেকে পিরিচের উপর নামিয়ে রাখলে সুবোধ ; ছলাৎ ক'রে খানিকটা চা টেবিলের উপর প'ড়ে গেল ; অত্যন্ত বিব্রত ভাবে সে বললে, চাবি দিয়ে কি করবেন আপনি ?

বাক্সটা খুলে বালাজোড়া একবার দেখব।—সুভদ্রা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে ; কিন্তু তার পরেই হেসে ফেলে সে আবার বললে, ভয় নেই, সুবোধবাবু ; আপনার বালা কেড়ে নেব না আমি, শুধু একটিবার দেখব।

মুখ লাল ক'রে সুবোধ বললে, কি যে বলেন—তাই আমি বলেছি নাকি ?

তবে চাবি দিন।—ব'লে সুভদ্রা সুবোধের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে।

ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত সুবোধকে হার মানতে হ'ল।

চাবি দিয়ে বাক্স খুলে সুভদ্রা বালা-জোড়াটি বের করলে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে সেটি পরীক্ষা ক'রে দেখলে সে; কতকটা যেন আপন মনেই সে বললে, খাঁটি সোনা মনে হচ্ছে, কিন্তু পুরোনো জিনিস,—প্যাটার্নটা একেবারেই সেকেলে।

তার পর সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কার বালা, সুবোধবাবু?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমার মায়ের হাতের বালা।

মায়ের হাতের? সুভদ্রা চমকে উঠল, এবার দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কেন?

জেরায় বিব্রত হয়ে পড়ছিল সুবোধ; কথাটা ঢাকতে গিয়ে ক্রমেই সে উপহাসাস্পদ হয়ে উঠছে দেখে অবশেষে নিজে থেকে সকল কথা একবারেই খুলে বললে সে। কুণ্ঠিত মুখে শুকনো একটু হাসি ফুটিয়ে তুলে উপসংহারে সে বললে, এবার ঠাকুমা রাগ ক'রে বালা-জোড়া আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, নাত-বউয়ের মুখ দেখা তাঁর অদৃষ্টে যখন লেখা নেই,—এই সব।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। সুবোধের কথা শেষ হবার পরেও বালা-জোড়াটি কোলের উপর ফেলে রেখে স্তব্ধ হয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

দেখে সুবোধ আরও বিব্রত হয়ে পড়ল; বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করবার পর সে বললে, সব তো শুনলেন, এখন জিনিসটি আমার ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু সুভদ্রা যেন সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল; কোলের উপরেই বালা-জোড়াটিকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সে বললে, না, না, সব কথা শোনা তো হয় নি! এ কথা আপনি আমায় আগে বলেন নি কেন?

বলবার কোন উপলক্ষও তো হয় নি।—সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে। একটু থেমে এক বার ঢোক গিলে সে আবার বললে, বাড়ি থেকে এসেই জিনিসটাকে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলাম, এই একটু আগে বের ক'রে এনেছি।

কেন?

দরকার পড়েছে তাই।

দরকার! বউয়ের বালার দরকার পড়েছে আপনার?

অমন একটা অবস্থার মধ্যেও সুবোধ হেসে ফেললে। বললে, কি বলছেন, সুভদ্রা দেবী? বউই নেই তো বউয়ের বালা হবে কেমন ক'রে? না, না, বউয়ের জন্য দরকার হয় নি; দরকার হয়েছে আমার নিজের।

একটু থেমে হাসি থামিয়ে সে আবার বললে, ও আমি বেচতে চাচ্ছি, সুভদ্রা দেবী।

বেচতে!—সুভদ্রা আবার চমকে উঠে বললে।

হ্যাঁ।—সুবোধ উত্তর দিলে, ওটাকে বেচবার জন্যই সরকারদের দোকানের সামনে গিয়ে নেমেছিলাম।

কিন্তু—। সুভদ্রা রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, এ জিনিস আপনি বেচতে চাচ্ছেন কেন? আপনার বউয়ের জন্য তুলে রাখা মায়ের হাতের বালা আপনি বেচে ফেলবেন?

সুবোধ এবার বিব্রত ভাবে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, বড্ড টাকার অভাব হয়েছে আমার।

টাকার অভাব! কেন?

কাজের জন্য।

তথাপি সুভদ্রা বিহ্বলের মতই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে সুবোধ অল্প একটু হেসে আবার বললে, এই ক'মাসেই সব কথা ভুলে গেলেন নাকি আপনি? আমাদের অভাবের শেষ আছে? সাধারণ অবস্থাতেই তো অভাব আমার লেগেই থাকত। এখন তো আবার যজ্ঞের আয়োজন করতে হচ্ছে। সে জন্য চাই রাজার ভাণ্ডার; অথচ সম্বলের মধ্যে আছে কেবল ভিক্ষে চাইবার এই মুখ। এতে কত আর চলে! আজ তো একেবারে অচল অবস্থা।

কিন্তু এরই প্রতিক্রিয়ায় সুভদ্রা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল; বললে, হোক অচল অবস্থা। সে জন্য আপনার মায়ের হাতের বালা আপনি বেচে ফেলবেন নাকি? বেচবার জন্য এ জিনিস তো তিনি আপনাকে দেন নি!

সুবোধ বিব্রত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে; মৃদু স্বরে বললে, না বেচে

আমার উপায় নেই, সুভদ্রা দেবী। টাকা আমার চাইই—আর আজই চাই। আর তা ছাড়া—

বলতে বলতে সে থেমে গেল; একটু চুপ ক'রে রইল সে; কিন্তু তার পর মুখ তুলে অল্প একটু হেসেই সে আবার বললে, আর তা ছাড়া ও জিনিসের প্রয়োজনও তো আর আমায় নেই!

বোধ করি, ওই হাসি দেখেই সুভদ্রা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল; বললে, না-ই বা থাকল। সে জন্যই এমন জিনিস আপনি বেচে ফেলবেন নাকি? না, না, এ আপনি কিছুতেই বেচতে পাবেন না।

কিন্তু আমার যে টাকার দরকার।

দরকার যদি হয় তো আমিই সে টাকা দেব আপনাকে। কিন্তু এ বালা বেচতে পাবেন না আপনি।

সুবোধ প্রথম থেকেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল; এবার রীতিমত বিহ্বল হয়েই সে বললে, সে কি সুভদ্রা দেবী? আপনি টাকা দিতে যাবেন কেন?

সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে না; হঠাৎ তার মুখের চেহারাটাই একেবারে যেন বদলে গেল; কয়েক সেকেণ্ড কাল স্থির দৃষ্টিতে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললে, দৈবদুর্বিপাকে আজ আমি কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি, সুবোধবাবু। কিন্তু সে কি আমার এত বড় একটা অপরাধ যে, এ রকম একটা সময়েও দেশের কাজের জন্য নিজের অর্জিত কটা টাকাও আমি আপনাকে দিতে পারব না?

পলকের জন্য বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে যেন নির্বাক হয়ে গেল; কিন্তু তার পরেই উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, সে কি, সুভদ্রা দেবী, সে কথা বলি নি তো আমি! দেশের কাজের জন্য টাকা দেবেন আপনি,—আপনার সে শ্রদ্ধার দান আমি মাথায় ক'রে নেব।

এ মন্তব্যের কোন উত্তর দিলে না সুভদ্রা; হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেশ সহজ ভাবেই সে জিজ্ঞাসা করলে, কত টাকা আপনার চাই?

সুবোধ কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, অন্তত আড়াই শো।

বেশ, তিন শো টাকা আপনাকে আমি এক্ষুনি দিচ্ছি।—ব'লেই সুভদ্রা

চ'লে যাবার উপক্রম করছিল, কিন্তু সুবোধ বাধা দিয়ে কুণ্ঠিত অনুনয়ের স্বরে বললে, কিন্তু আমার বাক্সটা? ওটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

সত্যই বাক্সটা তখনও সুভদ্রার হাতেই ছিল, সেটি নিয়েই চ'লে যাচ্ছিল সে। সুবোধের কথা তার কানে যেতেই তার চোখ দুটি ওই বাক্সের উপর গিয়ে পড়ল। থমকে দাঁড়াল সে; হঠাৎ তার চোখে-মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল; সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, এটা আমার কাছেই থাকবে, এ আপনি ফিরে পাবেন না।

কিন্তু—

'কিন্তু' আবার কি? আপনি বাক্সটা যদি নিয়ে যেতে চান নিতে পারেন। কিন্তু বালা-জোড়া কিছুতেই নয়। ও এখন আমার কাছেই থাকবে।

কিন্তু ও দিয়ে আপনি কি করবেন?

সুভদ্রার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন কুটিল হয়ে উঠল; ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে, ঠোঁট দুখানা একটু বেঁকিয়ে, গলাটা একটু খাটো ক'রে সে বললে, এ জিনিস আপাতত আমার বাক্সে তোলা থাকবে। তার পর আপনার বউ যখন আসবে, তখন নিজের হাতে এই বালা আমি তাকে পরিয়ে দেব।

ব'লেই হাসতে হাসতে সে তার নিজের ঘরে চ'লে গেল।

সে ফিরে এল মিনিট দশেক পর। সত্যই বাক্সটি তখন আর তার হাতে নেই; ওর বদলে রয়েছে একখানা চেক। সুবোধ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে যে, সুভদ্রার মুখের ভাব ও চলার গতিতে অদ্ভুত একটা চটুলতা এসেছে; তার ঠোঁটের কোণে ভারি মিষ্টি একটু হাসি, চোখ দুটি জ্বলছে চিক্‌চিক্ ক'রে, পাণ্ডুর মুখখানি চাপা হাসির আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঘরে ঢুকেই বিস্মিত সুবোধকে আরও বিস্মিত ক'রে দিয়ে সকৌতুক কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, বিয়ের নাম শুনলেই মেয়েদের মত অমন লাল হয়ে উঠেন কেন, সুবোধবাবু? আপনার বন্ধুরা সবাই যদি বিয়ে করতে পারে, তবে আপনি বিয়ে করবেন না কেন? কত দিন আর এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবেন?

ঠিক লাল হয়ে না উঠলেও অত্যন্ত বিব্রত হয়ে সুবোধ বললে, আঃ, কি যা-তা বলছেন! হঠাৎ হ'ল কি আপনার?

মন্তব্যটাকে উপেক্ষা ক'রেই সুভদ্রা সোজাসুজি সুবোধের চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন তো ?

সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, কোন্ বন্ধুর কথা বলছেন ?

কোন্ বন্ধু আবার !—কৌতুকের সঙ্গে বিদ্রূপের মিশাল দিয়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে, আপনার সব চেয়ে প্রিয় আর সব চেয়ে বিশ্বাসের বন্ধু, যাকে নিজে আপনি হুগলীতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাস ক'রে যথাসর্বস্ব হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আর যিনি আপনাকে একেবারে সর্বস্বান্ত ক'রে আপনার সেই ভালবাসা আর বিশ্বাসের প্রতিদান দিয়েছেন। কেন, তাঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয় নি আপনার ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে ব'সে রুদ্ধনিশ্বাসে সুবোধ বললে, আপনি জানেন সে কথা ? অরুণাংশুর বিয়ের খবর শুনেছেন আপনি ?

বোধ করি, সুবোধের প্রতিক্রিয়ার ওই তীব্রতার জন্যই সুভদ্রাও চমকে উঠল ; অপ্রতিভের মত চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, জানি বইকি। না জানলে আপনাকে বললাম কেমন ক'রে ?

কি ক'রে জানলেন ?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যে !

বলেন কি ! কোথায় দেখা হ'ল ?

কোথায় আবার ? এই কলকাতাতেই।

বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল ; এবার তার মুখে আর কোন কথাই ফুটল না। কিন্তু একটু পরে সুভদ্রাই তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আবার বললে, কেবল ওকেই নয়, সুবোধবাবু, ওর বউকেও আমি দেখেছি,—ভারি মিষ্টি মেয়ে !

কুণ্ঠা নেই, সঙ্কোচ নেই, কথায় বা গলার আওয়াজে জড়তা বা অস্পষ্টতা একেবারেই নেই ; চোখ আর ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি তখনও খেলে বেড়াচ্ছে ;—অকুণ্ঠিত চোখে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে ভারি মিষ্টি একটি ভঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি মেয়ের বর্ণনাটা সে শেষ করলে।

অবস্থাটা এমনি অপ্রত্যাশিত আর এমনি অসাধারণ যে, আরও কিছুক্ষণ সুবোধের মুখে একেবারেই কোন কথা ফুটল না। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম

ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেই হঠাৎ সে সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে সেই প্রথম বারের মতই রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, এত কথা আপনি জানেন, সুভদ্রা দেবী ! কিন্তু অরুণাংশু, সে-ও কি সব কথা জানে ? স-ব কথা ?—আপনার এই অবস্থার কথা ?

সুভদ্রার চোখ দুটি প্রথমে কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ল ; কিন্তু পরে হাসতে হাসতেই সে উত্তর দিলে, সে কথা আপনি না-ই বা শুনলেন, সুবোধবাবু। আমাদের দুজনের বোঝাপড়া আমরাই তো ক'রে নিতে পারি। তার খুঁটিনাটি খবর জেনে কি লাভ হবে আপনার ?

চুপ।—ব'লে সুভদ্রা হাত তুলে সুবোধকে থামিয়ে দিলে ; বাইরের দিকেই চোখ রেখে বললে, কমলা শুনতে পাবে, ওর স্নান হয়ে গিয়েছে।

ফিরে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে গলাটা একটু খাটো ক'রে সে আবার বললে, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তাকে এক দিন তো আপনি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যের সঙ্গেই উপেক্ষা করেছিলেন। ইদানীং আবার তাই নিয়ে এত মাথা ঘামিয়ে শক্তির অপচয় কেন করছেন ?

খোলা দরজা দিয়ে চকিতে বারান্দাটা এক বার দেখে নিয়ে সুবোধ বিহ্বল স্বরে বললে, কিন্তু, সুভদ্রা দেবী, এ যে আমি একেবারেই বুঝতে পারছি নে।

না-ই বা পারলেন।—সুভদ্রা মুচকি হেসে উত্তর দিলে, এই কিছু দিন আগেও তো আমাদের সম্বন্ধটাকে আপনি বলেছিলেন এক দুর্বোধ্য রহস্য। না হয় আজও তা রহস্যই রইল। তার জন্য জগতের গতি তো আর থেমে যাবে না !

এ কথার উত্তর তৎক্ষণাৎ সুবোধের মুখে দূরে থাক্, মনেও এল না। পরে যে কথা তার মনে এল, তাও আর মুখ ফুটে সে বলতে পারলে না।

একটি কটাক্ষ, একটু হাসি, একটি কথার ভঙ্গীতেই সুবোধের মনের ঘড়ির দোলন-কাঁটাটি একেবারে বিপরীত সীমান্তে চ'লে গেল।

করুণা বা সমবেদনা আর নয়, এবার এল নিবিড় বিতৃষ্ণা।

সুভদ্রার মুখের যে হাসিটুকু একটু আগেই সুবোধের মনে এক অস্বস্তিকর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, সেই হাসির আলোকেই এত দিন পর সত্যটাকে সে

যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে। হঠাৎ সে যেন বুঝতে পারলে যে, সুভদ্রা আর অরুণাংশুর সম্বন্ধের মধ্যে রহস্য একটুও নেই, যা আছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট একটা স্থূল কদর্যতা। সুবোধের মনে হ'ল যে, সুভদ্রার কোন দুঃখ নেই, তার জীবনের কোন সমস্যা নেই, সমাধানের কোন প্রয়োজনই নেই ;—অরুণাংশুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছে,—বড় লোকের ছেলে আর গরিবের মেয়ের বিবাহ-পূর্ব নির্বন্ধন ভালবাসার সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজের অন্ধকার অন্তঃপুরে যুগ-যুগের আচরিত যে সব বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন আছে, হয়তো তারই কোন একটা পদ্ধতি অনুসারে সুভদ্রাও তার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সমস্যার সমাধান ক'রে নিয়েছে ব'লেই অরুণাংশুর বিয়ের মত অত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে নিয়েও তার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কা বা উদ্বেগ নেই; হয়তো সেই জন্যই অননুমোদিত মাতৃত্বের দুর্বহ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও তাই কথায় কথায় হাসতে আর পরিহাস করতে কোথাও তার একটুও বাধে না।

সুবোধ আলাপ আর চালাতে পারলে না, কমলা ফিরে আসবার পরেও নয়। অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। একটু আগেই তার বুকের মধ্যে যেন একটা ঝড় উঠেছিল, কিন্তু এখন কিছুই নেই। তার মনে হতে লাগল যে, যে বোঝাটা বুকে নিয়ে সুভদ্রার সঙ্গে সে দেখা করতে গিয়েছিল, সেটা নেমে গিয়েছে; কিন্তু ওই সঙ্গেই তার বুকটাও যেন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। বেদনা আব নেই, কিন্তু সমবেদনাও অন্তর্হিত হয়েছে; সুভদ্রার সম্বন্ধে তার দায়বোধেব সম্পূর্ণ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং সুভদ্রার মূর্তিটিও তার বুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফাঁকা মাঠের মত খালি বুকের মধ্যে হু-হু করা শুকনো বাতাসের মত কেবল একটি মাত্র হাহাকারই যেন দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে,—বৃথা, বৃথাই সুভদ্রার কথা ভেবে নিজে সে অত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; তার সাহায্য, এমন কি, তার পরামর্শ পর্যন্ত না নিযে সুভদ্রা নিজেই অরুণাংশুর সঙ্গে চলনসই-গোছের একটা রফা ক'রে নিয়েছে!

কিন্তু পায়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে তার শরীর ও মনের ওই আচ্ছন্ন অবসন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। বুকের মধ্যে একটা উল্লাসের

সুরও যেন বেজে উঠল,—সে উল্লাস মুক্তির। তার মনে হচ্ছে আপন যে, এত দিন পর আজ সর্বপ্রথম সে তার বহুবাঞ্ছিত মুক্তি পেয়েছে,—একেবারে পরিপূর্ণ মুক্তি। সে দিনের যে নূতন উপলব্ধি এক নিমেষেই মনটাকে তার বিকল ক'রে দিয়েছিল, অপরাধবোধের সেই গুরুভার পাথরখানা তার বুকের উপর চেপে ব'সে থাকলে হয়তো জীবনটাই তার পঙ্গু হয়ে যেত; কখনও করুণা, কখনও বা দায়বোধের মুখোশ প'রে তার অন্তরের যে কালো কামনাটা অতীতে বার বার তার গতিকে ব্যাহত করেছে, বার বার তাকে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে, সেটাই অনুতপ্ত অপরাধীর মুখোশ পরবার সুযোগ পেলে, কে জানে, আবার কোন্ অন্ধ গলিতে তাকে ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যেত। মনে মনে সে বললে, এ ভালই হয়েছে যে, নিজের মধ্যে সে দিনের সেই হ্যাংলা ও হিংস্র কুকুরটাকে আবার প্রত্যক্ষ দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুভদ্রার আসল রূপটিকেও সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই সুভদ্রার হাসিমাখা মুখখানির দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় মনটা তার বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সেই সুভদ্রার প্রতিই মনে মনে সে যেন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। এত দিন যে ছিল ছলনাময়ী, প্রত্যাখানের নির্মম আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই অশ্রু-কলঙ্কিত ম্লান মুখের মোহিনী মায়া প্রয়োগ ক'রে তার মনের ভিতরকার হ্যাংলা কুকুরটাকে অনবরতই প্রলুব্ধ ক'রে আসছিল, সেই সুভদ্রাই আজ তার মুখোশছাড়া আসল রূপটাকে নিঃসঙ্কোচে তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে কেবল দায়বোধের বিড়ম্বনা থেকেই তাকে অব্যাহতি দেয় নি, তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষারই জড় পর্যন্ত কেটে দিয়ে তাকে ভিতর আর বাইরের সকল রকম বন্ধন থেকেই মুক্তি দিয়েছে।

হঠাৎ সুভদ্রার নিজের মুখের স্বীকারোক্তিটি সুবোধের মনে প'ড়ে গেল,—আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ, এক দিন তাকে তো আপনি পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যের সঙ্গেই উপেক্ষা করেছিলেন,—আজকাল তাই নিয়েই আবার এত মাথা ঘামিয়ে শক্তির অপচয় করছেন কেন?

তখন তার মনের মধ্যে আর একটা আবেগ তরঙ্গিত পদ্মার মতই গর্জন ক'রে ফুলে উঠেছিল; তাই সুভদ্রার কথা কটি সে সময়ে যেন তার কানেই যায় নি। কিন্তু ওই কথাই এখন তার মনে পড়তেই সুবোধ চমকে উঠল,—

কষাঘাতের মত নির্মম ওই সমালোচনা, কিন্তু বৈশাখের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আলোকের মতই সুস্পষ্ট সত্য। ঠিকই তো!—সুবোধ তৎক্ষণাৎ মনে মনে ঘাড় নেড়ে সুভদ্রার ওই উক্তিটির যৌক্তিকতা মেনে নিলে,—অসংযত চিত্তের নির্লজ্জ লোলুপতার তাড়নায় বুনো হাঁসের পিছনে ছুটাছুটি ক'রে শক্তির এ কি শোচনীয় অপচয় করছে সে! এক নিমেষেই অতীতের সকল কথাই তার মনে প'ড়ে গেল; অতীতে সুভদ্রার চোখের দৃষ্টিতে তার মনের ভালবাসার সামান্য একটু আভাস দেখতে পেয়েই নিজে তো সে মার্জিতরুচি বলিষ্ঠ পুরুষের মত অতি সহজেই অরুণাংশুকে পথ ছেড়ে দিয়ে দূরে স'রে গিয়েছিল; তার পর ওদের দুজনের সম্বন্ধটাকে নদীর জল আর আকাশের আলো-হাওয়ার মতই সহজ মনে ক'রে নিজে সে ওকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল ব'লেই তো সে দিন অযাচিত প্রাপ্তির অমৃতরসে তার হৃদয়ের পাত্রটি কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছিল। পরে সে তার মনকে আবার গুটিপোকার মত নিজের চারদিকে কামনার জাল বুনতে দিয়েছে ব'লেই তো ইদানীং বার বার তাকে নিষ্ফল চাওয়ার দুঃসহ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে!

সেই বিড়ম্বনার সর্বশেষ অভিজ্ঞতাটাকে স্মরণ ক'রে সুবোধ পথ চলতে চলতেই শিউরে উঠল,—প্রাণপণ চাওয়ার বিনিময়ে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন রিক্ততা। নিজের বুকের মধ্যে তাকিয়ে দেখলে সে,—সুভদ্রার কাছে যা সে চেয়েছিল, তা সে পায় নি; অযাচিত ভাবেই তার কাছ থেকে যে অমূল্য সম্পদ সে লাভ করেছিল, তা-ও সে হারিয়েছে; নইলে আজ সুভদ্রা বিদ্রূপের স্বরে অতীতের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে কেন? সকলের উপরের কথা, সুভদ্রার প্রতি তার নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, তা-ও আজ নিঃশেষে হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েই ওখান থেকে সে বিদায় নিয়ে এসেছে।

তথাপি সুভদ্রার কণ্ঠের ওই নিষ্করুণ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যের স্মৃতিটাই যেন চাবুক মেরে তাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুললে। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে, সুভদ্রা আজ কেবল তাকে মুক্তিই দেয় নি, তাকে পথও দেখিয়ে দিয়েছে। অবসন্ন শরীরটাকে বেশ জোরে একবার নাড়া দিয়ে মনে মনে সে বললে যে, সে দিনের শিক্ষাটাকে কিছুতেই আর সে বিস্মৃত হবে না; কামনা ভবিষ্যতে যে কোন মুখোশ প'রেই তাকে প্রলুব্ধ করুক না কেন, ওর মোহিনী

মায়ার জালে আর ধরা পড়বে না সে; গত ছয় মাসের স্মৃতিকে বিকট একটা দুঃস্বপ্নের মত ঝেড়ে ফেলে নিজে সে তার অতীতের শান্ত সন্ন্যাসের জীবনে ফিরে চ'লে যাবে; নিরবচ্ছিন্ন রিক্ততার মধ্যে সে দিন যে পরিপূর্ণ মুক্তি সে লাভ করেছে, সকল রকম আসক্তিকে বর্জন ক'রে তার নবলব্ধ ওই মুক্তিকে ভবিষ্যতেও সে অক্ষুণ্ণ রাখবে;—সুভদ্রা আর অরুণাংশুকে নির্মমভাবে উপেক্ষা ক'রেই এবার জীবনের পথে সে এগিয়ে যাবে;—পিছনের ডাক শুনে ফিরে যাওয়া দূরে থাক্, পিছনের দিকে একবার ফিরে তাকিয়েও সে শক্তির আর অপচয় করবে না।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষে বসল সে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের গান তার মনে প'ড়ে গেল, 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে'! মন্ত্রের মত ক'রে গানের পদগুলিকে মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে চোখ বুজে এল তার। কখন যে গাড়ি ছাড়ল তা সে জানতেও পারলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে গন্তব্যস্থানে এসে গাড়ি থেকে যখন সে নামল, তখন কি যেন এক অনৈসর্গিক প্রেরণায় তার খালি বুক ভ'রে উঠেছে।

সুভদ্রার দেওয়া টাকাগুলি শ্যামাচরণের হাতে তুলে দিয়ে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, আর ভাবনা নেই, শ্যামাচরণদা; এবার খুব জোর প্রচার চালাতে থাক। আর মনে থাকে যেন, কখন কি ডাক যে এবার আসবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে যে ডাক যখনই আসুক না কেন, তখন আমাদের প্রস্তুতির কোন অভাব যেন না থাকে।

৭

১০ই আগস্ট।

ভোরের আলো তখনও ভাল ক'রে ফোটে নি, কারখানায় কাজ শুরু হতেও দেরি আছে। তথাপি ওই অসময়েও শ্যামাচরণ ছুটতে ছুটতে সুবোধের ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। তার হাতে দুখানা খবরের কাগজ।

আগের দিনই গুজব রটেছিল যে, অবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা দাবি করবার অপরাধে বোম্বাইতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে

গিয়েছেন। সঠিক খবর জানবার জন্য সুবোধের আগ্রহের অবধি ছিল না। সে-ই রাত থাকতেই শ্যামাচরণকে স্টেশনে পাঠিয়েছিল খবরের কাগজ কিনে আনতে।

শ্যামাচরণের নিজের আগ্রহও কম নয়। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে থাকলেও সে এক রকম দুপুর রাতেই স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করবার পর কাগজ হাতে পেয়ে আর এক মিনিটও সেখানে সে দেরি করে নি; সারাটা পথ সে এক রকম ছুটেই এসেছে; ছুটতে ছুটতে হাঁফ ধ'রে গিয়েছে তার; সুবোধের কাছে এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে সে বললে, খবর ঠিকই, সুবোধবাবু, গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন, সেই সঙ্গে আর আর নেতারাও।

সুবোধ উত্তর দিলে না, কিন্তু কাগজ দুখানা শ্যামাচরণের হাত থেকে এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়তে শুরু ক'রে দিলে।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করবার পর আর থাকতে না পেরে শ্যামাচরণ নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি, সুবোধবাবু, এবার আমাদের কি করতে হবে?

সুবোধ মুখ তুলে শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোস, শ্যামাচরণদা, কাগজখানা পড়া শেষ হ'লেই তোমায় আমি ডেকে পাঠাব।

ঘণ্টাখানেক পর নিজেই শ্যামাচরণের কাছে গিয়ে সুবোধ অল্প একটু হেসে বললে, খবর সব ঠিকই, শ্যামাচরণদা, ওঁরা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছেন।

তার পর?—শ্যামাচরণ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, তার পর আমাদের কি করতে হবে?

সুবোধ হাসতে হাসতেই উত্তর দিলে, সেটা আমাদেরই ঠিক ক'রে নিতে হবে, শ্যামাচরণদা। মোটা কথাটা ওঁরা ব'লে গিয়েছেন, সরকারকে অচল করতে হবে। বাকিটুকু ভেবে ঠিক করবার দায়িত্ব আমাদের, আর সেটাই এবারের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

শ্যামাচরণ অসহিষ্ণুর মত বললে, কিন্তু কি করব আমরা? আসল কাজটা আমাদের কি হবে?

সুবোধ এবার শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, সেটা ভেবে ঠিক করতে দু-এক দিন

সময় লাগবে হয়তো। এমন কিছু একটা ভেবে বের করতে হবে যাতে গভর্মেণ্টকে অচল ক'রে দেওয়া যায়।

এতে শ্যামাচরণের ঔৎসুক্য বা উত্তেজনা কোনটাই শান্ত হ'ল না। অস্থির হয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর হঠাৎ সে সুবোধের সম্মুখীন হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, সুবোধবাবু, চুঁচুড়ার কাছারিতে আগুন লাগিয়ে দিলে হয় না? অন্তত কাছের এই থানাটায়?

সুবোধ হেসে ফেললে; বললে, তা হয়, শ্যামাচরণদা; হয়তো এবার অনেক জায়গায় হবেও। তবে আমার মনে হয় কি, জান? একটা বোতাম টিপলেই প্রকাণ্ড একটা কলকে না ভেঙেও যদি অচল ক'রে দেওয়া যায়, তবে সেই বোতামটার সন্ধান যে জানে, সে ওই বোতামই টিপবে, কলটা ভাঙবার জন্য তার সময় আর শক্তির অপচয় করবে না।

রূপক-টা বোধ করি শ্যামাচরণের বোধগম্য হ'ল না; মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সে বললে, তবে থাক্ ওসব দাঙ্গা-ফ্যাসাদের কাজ। আপাতত বাজারে একটা হরতাল করিয়ে দিই, কি বলেন?

তা বেশ।—সুবোধ হাসি মুখেই উত্তর দিলে, আমিও ওই হরতাল চাই। তবে কেবল বাজারের হরতাল নয়,—কারখানায় মজদুরের হরতাল। এমন হরতাল যা আগে কখনও হয় নি,—যাতে একটি লোকও কাজে যাবে না যাতে—

খুব হবে, সুবোধবাবু।—শ্যামাচরণ উল্লসিত হয়ে বললে, দেখুন আপনি, আজই আমি হরতাল করিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু সুবোধের ব্যবহারে কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ পেল না; মুখের হাসিটুকু বজায় রেখে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, করাতে পার ভালই। কিন্তু আমি যা চাই তা এক দিনের হরতাল নয়। আমি চাই যে, মজদুর এবার কাজ ছেড়ে আসবে নিজের কোন লাভের জন্য নয়, কারখানার উৎপাদন বন্ধ ক'রে, যুদ্ধের মালমসলার সরবরাহ বন্ধ ক'রে সরকারকে অচল করবার জন্য; আর তার চেয়েও বড় কথা, বিদেশী সরকারের মৃত দেহটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সেখানে স্বদেশী সরকারের—স্বরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য।

কথা শেষ হবার পরেও শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে রইল ; তার পর হঠাৎ আবার সে উল্লসিত হয়ে বললে, তাই হবে, সুবোধবাবু, এই রকম হরতালই এবার করাব আমি, ওই বিমলবাবুদের বুঝিয়ে দেব যে, মজদুরকে তারা ঘুষই দিয়েছ, কিনে নিতে পারে নি।

শ্যামাচরণ বিদায় নিয়ে যাবার আগে সুবোধ গম্ভীর স্বরে তাকে শুনিয়ে দিলে, এবারকার আন্দোলনের স্বরূপ যেন মনে থাকে, শ্যামাচরণদা,—গান্ধীজী মন্ত্র দিয়েছেন—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ধরা পড়তে ভয় পাব না আমরা ; দরকার হ'লে মরবও। কিন্তু অন্যান্য বারের মত ধরা দেবার জন্য এবার আমরা এগিয়ে আর যাব না, যথাসম্ভব আত্মগোপন ক'রে যতদূর সম্ভব ওদের ক্ষতিই আমরা করতে চেষ্টা করব।

হরতাল যা হ'ল, তা অভূতপূর্ব।

বাজার অবশ্য খুব বড় নয়। শহরের বাইরে কারখানা। দু-চারটি মুদীর দোকান, একটি মনোহারি দোকান, কয়েকটি খাবারের দোকান আর কয়েকটি পান-বিড়ির দোকানের শাবক, এই নিয়ে তো বাজার। আশপাশের গাঁ থেকে রোজ সকালে কয়েক ঝুড়ি মাছ, কিছু তরিতরকারি আর কয়েক ঘটি দুধও সেখানে আসে। এ বাজারে হরতাল হ'ল সম্পূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন—এ খবরটাই যেন আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ। লোকের মুখে মুখে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শ্যামাচরণকে খুব বেশি কিছু করতেও হ'ল না। দু-একজন দোকান বন্ধ করতেই অন্যান্য সকলেও যার যার দোকান গুটিয়ে ফেললে। সুদূর পাড়াগাঁ থেকে যে দরিদ্র বিধবা দু আঁটি শাক বা দুটি ফল বেচবার জন্য সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে হাটে এসেছিল, সে-ও তার পসরা গুটিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

আজ হরতাল ! আজ আর কাজ নয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই যেন কি একটা পর্বদিন আজ।

জুলুম নয়, হুকুম নয়, অনুরোধ পর্যন্ত নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকেই যেন যার যার অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। আজকের দিনটি অসাধারণ, সাধারণ জীবনযাত্রার অভ্যস্ত পদ্ধতি ও অর্থহীন কোলাহল আজকের জন্য নয়।

যুগ-যুগের শিক্ষা ও অভ্যাস জাতির মর্মস্থলে আগুনের অক্ষরে যে তত্ত্ব লিখে দিয়েছে, তাই আজ আবালবৃদ্ধবনিতার আচরণের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। আজ হরতাল। নৈষ্কর্ম্য নয়, আনন্দোচ্ছল অবসর নয়, উচ্ছ্বসিত বিলাপের তামসিক বিলাসোপভোগ নয়, আহত, সংক্ষুব্ধ চিত্তের অন্ধ আক্রোশের উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তি নয়,—এ হ'ল ব্রতনিষ্ঠ, দৃঢ়সঙ্কল্প মানবাত্মার শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক সংযমাচরণ; প্রাণের সঙ্গে প্রাণের, সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের, দেশকালবন্ধনিরপেক্ষ উদার ও বিপুল ঐক্যের সুগম্ভীর ঘোষণা। দীনতম ও নগণ্যতম ব্যক্তিও তার গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত কর্ম বর্জন ক'রে স্বার্থমুক্ত পূত চিত্তে আজ মুক্তি-সাধনায় সঙ্কল্প গ্রহণ করবে।

এমনি একটা আদর্শের প্রেরণায় দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ ক'রে ঘরে ফিরে গেল।

কারখানার ভিতরেও চাঞ্চল্য। গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল খবর নয়, ওই সঙ্গে হরতাল করবার জন্য হাতে-লেখা আবেদনপত্রও। মজদুরেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কাজে আর তাদের মন নেই; কাজেই অমন যে সুদক্ষ তাদের হাত, তাও যেন বিকল হয়ে আসতে লাগল। কল চলতে লাগল বটে, কিন্তু কাজ আর অন্য দিনের মত এগুল না। অনেকে কাজ ফেলে নেতৃবৃন্দের কথা ভাবতে লাগল, আলোচনা করতে লাগল তাদের নিজেদের কর্তব্যের কথা। সর্দারেরা প্রথমে মজদুরদের শাসন করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাও স্রোতের টানে ভেসে গেল। বেশি মাইনের অফিসারেরা অসাধারণ অবস্থা দেখে নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলো চালাবার মোটে সাহসই পেলে না।

সময়মত টিফিনের ছুটির ঘণ্টা বাজল, বৈকাল দুটো থেকে আবার কাজ শুরু হবে। রোজই এমনি হয়,—ঘণ্টা বাজলেই মজদুরেরা কাজ ছেড়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজকের অবস্থা অসাধারণ। আজ হাতের কাজ বন্ধ ক'রে পরস্পরের সঙ্গে তারা কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলে। আলোচনার বিষয় মাত্র একটি,—এখন কর্তব্য কি? যারা পরস্পরের অপরিচিত, অথবা পরিচয় থাকলেও সাধারণত যারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে না, তারাও আজ সাগ্রহে

পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললে। সকলেই আজ চঞ্চল; সকলের গলার স্বরই আজ উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সকলের চোখের দৃষ্টিই আজ আগ্রহে উজ্জ্বল, জিজ্ঞাসায় তীক্ষ্ণ, আবেদনে অর্থপূর্ণ। মুখের কথা ছাড়াও চোখের নীরব ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে আজ আলাপ চলতে লাগল।

গতানুগতিক জীবনের শৃঙ্খলা আজ অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়ে গেল; শান্তি উঠল ক্ষুব্ধ হয়ে।

এ যেন পূর্ণিমার রাতে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের দুর্বার আকর্ষণে অকস্মাৎ ক্ষীণতোয়া ভাগিরথীর বক্ষে সহস্র তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ক্ষেপে উঠেছে; এ যেন অনেক দূরের সাপুড়ের বাঁশীর আবেদন-ভরা গান শুনে সুষুপ্ত বিষধর ভুজঙ্গ হঠাৎ ঘুম ভেঙে চঞ্চল হয়ে ফণা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

নদীর মত, সাপের মত এঁকে বেঁকে তিন হাজার মজদুরের মিছিল কারখানার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এল। সামনেই ময়দান, ময়দানের পূবদিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তার দু ধারেই বড় বড় গাছ।

একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শ্যামাচরণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে মোটা এক বাণ্ডিল ইস্তাহার। মজদুরেরা বেরিয়ে আসতেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেল সে। তার পর লাল আখর-আঁকা সাদা কাগজের ইস্তাহার নিয়ে জনতার মধ্যে লোফালুফি শুরু হয়ে গেল।

অন্যান্য দিন কারখানা থেকে বের হয়েই মজদুরেরা যে যার ব্যারাকে চ'লে যায়। কারখানার দেউড়িতে দরোয়ান টুলের উপর ব'সে ঝিমুতে থাকে, সামনের ফাঁকা ময়দানটা মনে হয় যেন তেপান্তরের মাঠ। কিন্তু আজ বেশির ভাগ মজদুরই ময়দানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থাটা অসাধারণ; মনে হতে লাগল যে, ময়দানে একটা মেলা ব'সে গিয়েছে। এখানে সেখানে ছোট ছোট একটা জনতা, প্রত্যেকের চোখে মুখেই একটা অস্বাভাবিক উত্তেজিত ভাব, ফিসফাস ক'রে আলোচনা চলছে,—একখানা ইস্তাহারের কাগজ নিয়ে কোন কোন জায়গায় দশজনের কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে, শ্যামাচরণ ঘুরে বেড়াচ্ছে চরকির মত। তার কৃশ প্রৌঢ় দেহটাতে আজ হঠাৎ যেন যৌবনের জোয়ার এসেছে।

একটা ভীড়ের মধ্যে এক বার সুবোধকে দেখা গেল তার পাশে এক জন

সর্দার। একে একে আরও কয়েকজন সর্দার সেখানে এসে জুটে গেল। তাদের ঘিরে আবার বেশ বড় একটা জনতা সেখানে জ'মে উঠল। একটু পরেই সুবোধ অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু ভীড় সেখানে জ'মেই রইল। হাতমুখ নেড়ে সর্দারেরা তাদের অনুচরদের কি সব কথা বললে। তার পর সেই জনতার ভিতর থেকে তুমুল একটা জয়ধ্বনি উঠল।

খুব বেশি সময় নয়, হয়তো আধ ঘণ্টারও কম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই হরতাল কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি মজদুরেরই ওটা মনের কথা, সুবোধ মুখে উচ্চারণ করেছে মাত্র। পাহাড়ের গা বেয়ে অসংখ্য সঙ্কীর্ণ ধারায় তরতর ক'রে যে জল ছুটে বের হয়েছে, তাই সংহত ক'রে একটি মাত্র প্রবল ও বিপুল ধারায় নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের দিকে সে ছুটিয়ে দিয়েছে। অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে সুবোধ ও শ্যামাচরণের নির্দেশ মন্ত্রের মত কাজ করলে। ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, সার্থকতা-নিরর্থকতার কথা আজ কারও মনেই উঠল না। প্রাকৃতিক বন্যার মতই দুর্বার বেগে আবেগের প্রবল একটা বন্যা এসে চক্ষের নিমেষে তিন হাজার মজদুরকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভারত-রক্ষা-বিধানের হুমকি, জনযুদ্ধের আবেদন, সুনিশ্চিত মোটা আয়ের প্রলোভন, এমন কি, সপরিবারে অনাহার, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রভৃতির মোটা মোটা থাম আর ভারি ভারি পাথর দিয়ে গড়া পাকা গাথুনির সুদৃঢ় আশ্রয় আজকের বানের মুখে কারও কোন কাজে লাগল না।

অন্যান্য দিনের মতই আজও বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই কারখানার বাঁশী বেজে উঠল, বড় বড় ফটকগুলি সব এক সঙ্গে খুলে গেল; কিন্তু বেশির ভাগ মজদুরই আজ আর কাজ করতে এল না। যারা এল সে ক'জনকে নিয়ে কারখানা চালানো যায় না। কাজেই কারখানার বাঁশী দশ মিনিট পর আবার বেজে উঠল এবং আরও দশ মিনিট পর আরও এক বার। তথাপি অধিকাংশ মজদুরই তাদের ব্যারাক ছেড়ে বাইরেও বের হয়ে এল না। কারখানার বড় সাহেব উত্তেজনায় লাল মুখ আরও লাল ক'রে আপিস ছেড়ে ফটকের কাছে ছুটে এল; কিন্তু তার চোখে শুধু পড়ল, সামনে ফাঁকা মাঠ ধু-ধু করছে। আধ ঘণ্টাখানেক পর তার বিশ্বস্ত দূতেরা ব্যারাক আর বস্তি থেকে ঘুরে এসে তাকে খবর দিলে, ফোরম্যানেরা একজোট হয়ে ব'লে দিয়েছে, স্বরাজ না হওয়া

পর্যন্ত কেউ আর কারখানায় কাজ করতে আসবে না। খবর শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকবার পর সাহেব টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে নিলে পুলিসের বড় সাহেবকে খবর দেবার জন্য।

যুদ্ধের বাজার। তায় আবার সারা ভারত জুড়ে গণবিদ্রোহের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। আত্মরক্ষার চেষ্টায় টলটলায়মান বিজাতীয় সরকারের তৎপরতার অভাব নেই। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই বড় বড় লরিতে চেপে শ-খানেক উর্দি-পরা সশস্ত্র সিপাই কারখানার প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু যাদের নিয়ে কারখানা সেই মজদুরেরা কাজে এল না। ইঞ্জিনের কয়লা অকারণে পুড়ে ছাই হতে লাগল, কিন্তু কল চলল না;—অমন সুসজ্জিত বিরাট কারখানাটি মনে হতে লাগল যেন রূপকথার অভিশপ্ত ঘুমন্ত রাজপুরীর মত খাঁ-খাঁ করছে।

শ্যামাচরণ যখন তার বাসায় ফিরে গেল, তখন দুপুর পার হয়ে গিয়েছে।

তার অবস্থা তখন অনেকটা সম্মোহিতের মত। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র তার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে; ঘামে এমন ভিজেছে সে যে, দেখলে মনে হয়, এইমাত্র ডুব দিয়ে স্নান ক'রে উঠেছে; ওর উপর আবার তার মুখে ও মাথায় ধুলো লেগেছে বিস্তর; ভীড়ের মধ্যে গায়ের জামা পিঠের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে গিয়েছে; ক্লান্তিতে অমন তার অসুরের মত দেহটাও যেন অবশ হয়ে আসছে।

তথাপি কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাজ এখনও অনেক বাকি আছে। ছুটোর বাঁশী বাজলেই মজদুরেরা যাতে তাদের সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে কাজ করবার জন্য বের হয়ে না পড়ে, সে জন্য বস্তিতে বস্তিতে তাকে সতর্ক হয়ে টহল দিয়ে ফিরতে হবে; অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটকে জিইয়ে রাখবার জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে অসাধারণ চেষ্টা করতে হবে; যা হয়েছে সে তো কেবল আরম্ভ, শেষ এখনও অনেক দূরে। প্রলোভন আর নির্যাতন দুটোই জয় ক'রে মজদুরেরা যাতে শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটি লোককে রীতিমত তালিম দিতে হবে। শ্যামাচরণ তখন কেবল এই সব কথাই ভাবছিল,—নাওয়া-খাওয়ার কথা তার মোটে মনেই ছিল না।

সে বাসায় এসেছিল কতকগুলি ইস্তাহার নিয়ে যাবার জন্য, হেঁটে নয়, ছুটে; ভেবেছিল যে, বাড়ির কারও সঙ্গে কোন কথা না ব'লে ইস্তাহারগুলো নিয়েই তৎক্ষণাৎ সে আবার ছুটে বের হয়ে যাবে। কিন্তু বাধা পড়ল।

বারান্দায় বেড়ার ঘেরান দেওয়া সঙ্কীর্ণ রান্নার জায়গাটিতে উঠানের দিকে পিছন ফিরে ব'সে সারদা রান্না করছিল; তার কাছে ব'সে ছিল তাদের ছোট মেয়ে তারা। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে মা ও মেয়ের কথাও চলছিল।

শ্যামাচরণের পায়ের শব্দ শুনেই দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। তারা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, ওই বাবা এসেছে।—পরক্ষণেই সে উঠানে ছুটে গিয়ে দু হাত বাড়িয়ে শ্যামাচরণকে জড়িয়ে ধরলে।

শ্যামাচরণ বিব্রত হয়ে বললে, ছাড়্ ছাড়্, এ কি করছিস?

কিন্তু ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক্, পিতাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধ'রে তারা হাসিমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি এত দেরি কেন করলে, বাবা? চট্ ক'রে নেয়ে নাও, অনেক জিনিস রান্না হয়েছে আজ; মা অনেক রকম পিঠেও করেছে; ওই যে সুজির পুর দেওয়া পুলিপিঠে, যা তুমি খুব ভালবাস, তাও তৈরি হয়েছে বিস্তর। এখন পায়েস হচ্ছে। কিন্তু বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার, আমি আর দেরি করতে পারছি নে, চট ক'রে এক্ষুনি তুমি বাড়িতেই নেয়ে নাও, বাবা।

শ্যামাচরণ প্রথমে চমকে উঠেছিল, কিন্তু তার পর সে যেন পাথর হয়ে গেল। এও কি সম্ভব,—এই এত বড় অধর্মাচরণ। আজ হরতাল, ঘরে ঘরে অরন্ধন আর উপবাসের ব্যবস্থা; ব্রত আরম্ভের পূর্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে সংযমাচরণের নির্দেশ আছে, আজ তাই তাদের পালন করতে হবে। অথচ আজকের দিনে তার নিজের বাড়িতেই কিনা ভোজের আয়োজন হয়েছে! কথাটা শ্যামাচরণ প্রথমে যেন বিশ্বাসই করতে পারলে না। কিন্তু মেয়েটি তখনও কলকণ্ঠে ওই ভোজের আয়োজনের কথাই ব'লে যাচ্ছিল। স্তম্ভিত শ্যামাচরণ তার মুখের দিকে চাইতেই দেখতে পেলে, বালিকার চোখ দুটি উৎসাহ ও আনন্দে খঞ্জনের মত নেচে বেড়াচ্ছে; সারদার মুখের দিকে চেয়েও সে দেখতে পেলে, তারও ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। কিন্তু ওই হাসি দেখেই চক্ষের নিমেষে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার মাথায় গিয়ে উঠল;

মেয়েটিকে ঠেলে ফেলে এক লাফে সে বারান্দায় সারদার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

সত্যই ভোজের আয়োজন হয়েছে। শ্যামাচরণের চোখে পড়ল যে, দরিদ্রের সংসারের সব কটি পাত্রেই নানা রকম তরকারি ও মিষ্টান্ন থরে থরে সাজানো রয়েছে; উনোনের উপর মৃদু জ্বালে পাক হচ্ছে পায়েস। কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, একেবারে জাজ্জ্বল্যমান সত্য। গরিবের সংসারের সাধারণ আয়োজনের তুলনায় আজকের আয়োজন একেবারে রাজসিক। আহতের মত চোখ ফিরিয়ে সারদার মুখের দিকে চেয়ে গর্জন ক'রে সে বললে, আজ হরতাল নয়? উপবাসের দিন নয় আজ? আর আজকের দিনেই এই রাজভোগের আয়োজন! এ সব খাবে কে? তুই নিজে খেতে পারবি? গলায় আটকে যাবে না তোর?

এক নিমেষেই সারদার মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল; মাথাটা তার আপনা থেকেই নত হয়ে পড়ল। শ্যামাচরণের গর্জন যতক্ষণ চলল, ততক্ষণ একটা কথাও সে বললে না; কিন্তু শ্যামাচরণ চুপ করতেই সে মুখ তুলে তিক্ত কণ্ঠে বললে, আমার গলায় কি আটকাবে আর কি আটকাবে না, তা আমিই বুঝব। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞেস করি, হরতাল কি আজ এই প্রথম হচ্ছে? আগের তো হরতাল অনেক দেখেছি, সে জন্য তোমার উপোস করাও দেখেছি। দিনের বেলাতেই না হয় কিছু তুমি মুখে দাও নি; কিন্তু রাত্রে? রাত্রে কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গেল নি তুমি? আজও দিনেই না হয় তোমার উপোস; কিন্তু রাত্রে খেতে হবে না?

অভিযোগটি সত্য ব'লেই যেন খোঁচাটা শ্যামাচরণের মর্মস্থলে গিয়ে লাগল; সবেগে মাথা নেড়ে সে বললে, না, হবে না, আজ রাত্রেও আমি উপোস করব।

কয়েক সেকেণ্ড কাল অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর সারদা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, বেশ, ক'রো। এক দিন কেন, তিন দিন উপোস ক'রো তুমি; আমি এক ফোঁটা জলও তোমায় মুখে দিতে বলব না। কিন্তু নিজের সঙ্গে সঙ্গে ওই দুধের মেয়েটাকেও উপোস করিয়ে মারতে চাও

নাকি তুমি? ওর জন্য রাঁধতে হবে না আমাকে? এ সব আমি ওর জন্য রেঁধেছি।

স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির অনুসরণে মুখ ফিরাতেই শ্যামাচরণের চোখ দুটিও উঠানে তারার মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

তারা কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; তার মুখের হাসি একেবারে নিভে গিয়েছে, ঠোঁট দুটি নিষ্প্রভ, চোখ বিস্ফারিত, চোখের তারা দুটি যেন কোটর থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে। ব্যাপারটা সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে নি। বাড়িতে ভোজের আয়োজন হয়েছে দেখে কেন যে তার বাপ অমন রেগে উঠল, তা তার বুদ্ধির অগম্য; তবে এটুকু সে বুঝেছে যে, ওই ভোজের আয়োজন ক'রেই তার মা অমার্জনীয় একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছে। এইটুকু বুঝেই তার অস্বস্তির অন্ত ছিল না; তিরস্কৃতা জননীর জন্য সমবেদনায় তার চোখে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ঠিক এই রকম সময়েই মায়ের মুখে নিজের নাম শুনে ভয়ে তার ছোট বুকটা গুড়গুড় ক'রে কেঁপে উঠল; তার মনে হ'ল যে, ভোজের আয়োজন ক'রে তার মা যে দুষ্কর্ম করেছে, তার সমস্ত দায়িত্বই সে বুঝি তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কাজেই উত্তেজিত পিতার আরক্ত চক্ষের জ্বলন্ত দৃষ্টি তার নিজের মুখের উপর এসে পড়তেই তারা আরও ভয় পেয়ে যেন উদ্যত একটা আঘাতকে প্রতিরোধ করবার জন্যই ছোট হাত দুটি মুখের কাছে তুলে আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠল, আমি নয়, বাবা, আমি কিচ্ছু বলি নি; খেতেও চাই নি আমি।

শ্যামাচরণের মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা চাবুকের ঘা পড়ল। মেয়ের কাছে লজ্জা পেল সে। অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড কাল চুপ ক'রে থাকবার পর সে নীচে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলে; তার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনার স্বরে সে বললে, কেউ তো বলে নি, মা, যে তুমি বলেছ! আর বললেও দোষও তো কিছু নেই। তুমি খাবে বইকি! বেশ পেট পুরে খাবে।

তারার বুকের মধ্যে কাঁপুনি তখনও থামে নি; বাপের আশ্বাস সত্ত্বেও সে অবরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বললে, না, আমি খাব না; আমিও উপোস করব।

না, মা!—অধিকতর লজ্জিত হয়ে শ্যামাচরণ বললে, তোমায় উপোস করতে

হবে না, ছোটদের উপোস করতে হয় না। তুমি খাবে—যত পার খাবে। এতক্ষণ খাও নি কেন, মা ?

শ্যামাচরণকে নীচে নামতে দেখে একটা অনর্থের আশঙ্কায় সারদাও ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছিল ; কিন্তু ব্যাপার দেখে হেসে ফেলে সে বললে, থাক্‌, মেয়েকে আর সোহাগ করতে হবে না। কোন দিন কত বেলায় কি ও খায়, সে খোঁজ তুমি আগে কোন দিনই যখন কর নি, তখন আজও না করলেও চলবে। এখন নামিয়ে দাও ওকে, নিজে নাইতে যাবে তো যাও।

শ্যামাচরণ তারাকে কোল থেকে উঠানে নামিয়ে দিলে। নিজের অসংযত ব্যবহারের জন্য তার অনুতাপ ও লজ্জা তখনও দূর হয় নি, মেয়ে বা স্ত্রী কারও চোখের দিকেই চোখ তুলে তাকাতে পারলে না সে।

ওদিকে সারদা তারাকে হাত ধ'রে নিজের কাছে টেনে নিলে ; তার পর স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে আবার বললে, তুমি যাও, স্নান ক'রে এস গে। হরতালের দিন খাওয়াই না হয় বারণ ; কিন্তু স্নান করলে দোষ হবে না।

খোঁচাটাকে বিনা প্রতিবাদেই হজম করলে শ্যামাচরণ ; মুখে বললে, না, স্নান করবার সময় হবে না আমার,—এক্ষুনি বাইরে যাব আমি। কিন্তু তার আগে তারাকে খেতে দাও, আমি দেখে যাই।

তারার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, আর দেরি ক'রো না, মা, তুমি খেতে ব'স।

তারার বিহ্বল ভাবটা তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি ; সে এক বার সন্দিগ্ধ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পরে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আমি তোমার সঙ্গে খাব, বাবা।

না, মা।—শ্যামাচরণ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, আমি আজ খাব না, আজ আমার ব্রত। কিন্তু তুমি খেতে ব'স, আমি তোমার কাছেই বসছি।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে অসহিষ্ণুর মত আবার বললে, ওকে খেতে দাও, শীগগির, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সারদা বিব্রত স্বরে বললে, কিন্তু ওর স্নানই যে এখনও হয় নি। তা ছাড়া রান্নারও তো অনেক এখনও বাকি রয়েছে, অন্তত পায়েসটা তো নামা চাই!

আচ্ছা, পায়েস তবে নামাও গে তুমি। ততক্ষণে আমিই ওকে স্নান করিয়ে দিই।—ব'লে তারার হাত ধ'রে তখনই শ্যামাচরণ চলবার উপক্রম করলে।

কিন্তু সারদা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল; এক হাঁচকা টানে মেয়েকে স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললে, তুমি ওকে স্নান করাবে কি? কখনও এ সব কাজ করেছ তুমি যে, আজ করতে চাচ্ছ? তার চেয়ে উনোনের ধারেই তুমি একটু ব'স, আমিই চট ক'রে তারাকে নাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, পায়েসটা ধ'রে যায় না যেন।

শ্যামাচরণের ধৈর্য শেষ হয়ে আসছিল। ওদিকে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েছে, তার দেরি হ'লে একটা অনর্থ ঘটতে পারে। তথাপি সারদার নির্দেশ-মত সে উনোনের ধারে গিয়েই পায়েসের খবরদারি শুরু ক'রে দিলে।

একটু আগেই ছোট্ট যে ঘটনাটি ঘ'টে গেল, তাই তার মনকে বড় জোরে নাড়া দিয়েছে। পাঁচটি মিনিটের মধ্যেই মেয়েকে আজ সে যেমন ক'রে দেখেছে তেমন আগে সে যেন তাকে কোন দিনই দেখে নি। বড় করুণ, বড় মধুর সেই কচি মুখখানি। শীর্ণ, রোগা দেহ, অমার্জিত ময়লা রঙ, মাথার ছোট ছোট বিন্যাসহীন চুলে তৈলহীনতার ধূসর রুক্ষতা। কান খালি, হাত খালি, গায়ে একখানিও অলঙ্কার নেই। পরিচ্ছদের মধ্যে ছেঁড়া ময়লা একটি ছিটের ফ্রক মাত্র। মেয়ের মুখখানি ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ এক সময়ে শ্যামাচরণের মনে হ'ল যে, সারদা সত্য কথাই বলেছে, সত্যই মেয়ের জন্য কোন দিনই কিছুই সে করে নি। তথাপি তার সেই উপেক্ষিতা অবহেলিতা কন্যাটিই তারই সঙ্গে একত্র ব'সে খাবার জন্য এত বেলা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছে, তাকে দেখামাত্রই মহা উল্লাসে ছুটে গিয়ে বাড়িতে ভোজের আয়োজনের সংবাদ কলকণ্ঠে তাকে শুনিয়ে দিয়েছে, তার পর তার ব্যবহারে মর্মাহত ও শঙ্কিত হয়ে বহু-আকাঙ্ক্ষিত ভোজটিকেই বর্জন ক'রে তাকেই আবার খুশি করতে চেষ্টা করেছে। ভাবতেই শ্যামাচরণের বুকের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল। সত্যই তো, অবোধ ছোট মেয়েটির আজকের আচরণের মধ্যেই তার বঞ্চিত জীবনের সমস্ত রিক্ততা সে যেন আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। নৈরাশ্য আর লাঞ্ছনা ছাড়া বাপের কাছ থেকে জীবনে আর কিছুই সে পায় নি ব'লেই তো

আজও সে তার অতখানি আশা, আগ্রহ ও ভালবাসার বিনিময়েও ভর্ৎসনা ও প্রহার ছাড়া মধুরতর আর কোন প্রাপ্তি কল্পনা করতে পারে নি।

কাজের তাড়া থাকলেও শ্যামাচরণ তারার প্রতীক্ষায় ওই উনোনের ধারেই ব'সে রইল। তার মনে হতে লাগল যে, হয়তো এর পর মেয়ের সঙ্গে তার আর দেখাই হবে না। অনিশ্চিত একটা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে মেয়েটিকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে তার খানিকটা সাধ না মিটিয়ে চ'লে যাবার কথা সে ভাবতেই পারলে না।

তারার খাওয়া শেষ হবার আগেই শ্যামাচরণের নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে সুবোধ একেবারে বাড়ির মধ্যেই ঢুকে পড়ল।

ঢুকেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল, তা এ বাড়িতে আগে সে কোন দিনই দেখে নি। মেঝের উপর আসন পেতে তারা খেতে বসেছে, সারদা পরিবেশন করছে, আর শ্যামাচরণ নিতান্ত ছোট মেয়েটির মতই তারার মুখে নিজের হাতে খাবার তুলে দিচ্ছে। তিন জনেরই উৎফুল্ল ভাব, তিন জনেরই মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, শৈশবের নিবিড় সাহচর্যে এসে সারদা আর শ্যামাচরণও যেন তখনকার মত শিশু হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সুবোধকে দেখেই শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল; তারার কাছ থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে সে বললে, একটু দেরি হয়ে গেল, সুবোধবাবু। মেয়েটা আমারই সঙ্গে খাবার জন্য এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে ব'সে ছিল; ওর কাছে তাই বসতে হ'ল আমাকে।

বেশ, বেশ।—সুবোধ হাসিমুখেই উত্তর দিলে, তাতে কিছুই ক্ষতি হয় নি। ওরা কেউ কাজে যাবে না, কোন ভাবনা নেই আমাদের। কিন্তু এখানে তুমিও এক সঙ্গেই খেয়ে নিলে না কেন? মেয়েকে অমন ভাবে আলাদা না খাইয়ে এক পাতে দুজনে বসলেই তো ভাল হ'ত, সময়ও বাঁচত তাতে।

শ্যামাচরণ কুণ্ঠিত হাসিমুখে উত্তর দিলে, আজ তো আমি খাব না, সুবোধ-বাবু,—আজ যে হরতাল।

ও, তা বটে।—ব'লে সুবোধ গম্ভীর হয়ে গেল।

সুবোধকে দেখেই তারার খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; খাওয়া ভুলে একদৃষ্টে সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। সারদাও সুবোধকে

দেখে খুশি হয় নি, পাছে আবার একটা অনর্থ উপস্থিত হয় এই ভেবে মনে মনে সে সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছিল। আর স্বয়ং শ্যামাচরণের লজ্জা ও অস্বস্তির অন্ত ছিল না। অপরাধীর মতই চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর সে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি না হয় যান, সুবোধবাবু; আমি একটু পরেই আসছি।

সুবোধ অন্যমনস্কের মত বললে, না, তার দরকার নেই। আমি এখানেই বসছি। তুমি ওকে খাওয়াও। তার পর দুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

তার পর হেসে ফেলে সে আবার বললে, যা দেখছি আর যার গন্ধ পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে যে, উপোস ক'রে তুমি ঠ'কে গিয়েছ, শ্যামাচরণদা। কি দরকার এমন ঠকবার? মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও কিছু খেয়ে নাও না!

উত্তর দিলে সারদা। সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে সে বললে, এ বেলা খাওয়া তো দূরের কথা, বলছে যে, রাত্রেও আজ ওর খাওয়া নেই। হ্যাঁ, সুবোধবাবু, আজকের হরতালে দু বেলাই উপোস করবার ব্যবস্থা নাকি? তাই বলেছেন আপনি?

কই, না তো!—সুবোধ বিস্মিত হয়ে বললে, দু বেলা দূরে থাক্, এক বেলা উপোস করতেও তো কাউকে বলি নি আমি।

মুহূর্তের জন্য সারদা যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল; কিন্তু ওর পরেই স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে উদ্ধত স্বরে সে বললে, তবে?

শ্যামাচরণ বিব্রত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু ওই ভাবটা গোপন করবার জন্যই যেন সে-ও উদ্ধত স্বরেই উত্তর দিলে, 'তবে' আবার কি! আমি কি বলেছি যে, সুবোধবাবু আমায় উপোস করতে হুকুম দিয়েছে! আমার খুশি আমি উপোস করছি।

সুবোধ কিছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল স্বরে বললে, কি হয়েছে, বউদি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে!

সারদা চট ক'রে আঁচল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে ফেলে গাঢ় স্বরে বললে, হবে আর কি! যা আমার অদৃষ্টে চিরকাল হয়ে এসেছে, তাই। ভোরে উঠে মুনিব-বাড়িতে কাজে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়েই শুনলাম সব গোলমালের কথা। কাজে আর মন লাগল না। গিন্নীমাকে বলতেই তিনিও ছুটি দিয়ে

দিলেন। বললেন, তা যাও তুমি, ঝি; আজ যখন সকলেরই হরতাল, তখন তোমারও কাজ বন্ধ থাকবে বইকি। চ'লে এলাম। পথে আসতে আসতে ছাই-পাঁশ কত কি মনে উঠতে লাগল! ভাবলাম, এই তো গোলমাল শুরু হ'ল, কার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! আজ যখন সময় পাওয়া গিয়েছে, তখন ভালমন্দ দুটি নিজের হাতে রেঁধে ওঁকে আজ খেতে দিই। অথচ বাড়িতে এসে আমায় রাঁধতে দেখেই উনি আমার উপর তম্বি করতে লাগলেন,—হ্যাঁ, আজ হ'ল গিয়ে হরতাল, আজ এ সব কেন, গলায় আটকে যাবে না এ সব জিনিস!—এই সব।

শ্যামাচরণ আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এতক্ষণ সে তলিয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করে নি। যে কারণে বাইরে কাজের তাড়া থাকলেও নিজে সে ছোট মেয়েটিকে নিজের হাতে খাওয়াতে বসেছে, ঠিক সেই কারণেই যে সারদা তার জন্য এত যত্নে এত সব খাবার তৈরি করেছে, তা এখন বুঝতে পেরে সারদার কাছেও নিজেকে তার অপরাধী মনে হতে লাগল। কিন্তু প্রকাশ্যে, বিশেষ ক'রে সুবোধের সামনে মুক্তকণ্ঠে নিজের দোষ সে স্বীকার করতে পারলে না; বরং কুণ্ঠিত ভাবটাকে গোপন করবার জন্যই আগের মত উদ্ধত স্বরেই সে বললে, কেন, অন্যায় কোন্ কথা া বলেছি আমি? আজ যে হরতাল, দোকান-পাট সব বন্ধ, তা তো নিজেই তুমি জান। তবু কি দরকার ছিল আজই ষোড়শোপচারে এই ভোজের আয়োজন করবার?

সারদা উত্তর দিলে সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে; বললে, শপথ ক'রেই আপনাকে আমি বলতে পারি, বাবু,—হরতাল আমি ভাঙি নি, বাজার থেকে এক পয়সার জিনিসও কিনি নি আমি। ঘরে আমার যা ছিল, তাই দিয়েই যতটুকু সম্ভব আয়োজন করেছি। কেবল দুধটুকু এনেছি গয়লা-বউয়ের কাছ থেকে, আর তা-ও নিজে সে আমায় দিতে চাইলে ব'লে। তার জন্যও দাম আজ দিই নি। নারকেলটি আমার মুনিব ঠাকরুণ নিজে যেচে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, সুবোধবাবু, এতে কি আমার দোষ হয়েছে?

শুনতে শুনতে সুবোধ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শেষের প্রশ্ন

শুনে সে সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠল ; সবেগে মাথা নেড়ে বললে, না, বউদি, আমি বলছি, কিছু দোষ হয় নি তোমার।

সারদা আঁচল দিয়ে আর এক বার চোখের কোণ দুটি মুছে ফেললে, তার পর বললে, অথচ ওঁর কাছে আমি মুখ পেলাম না। যা বকবার তা তো আমায় বকলেনই, তার পর আবার বলছে, যে, আজ রাত্রেও ওঁকে উপোস দিয়ে থাকতে হবে। এ শুধু আমায় দুঃখ দেবার ফন্দি নয় তো কি?

আরও অপ্রতিভ হয়ে শ্যামাচরণ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুবোধ ব'লে ফেললে, না, বউদি, না ; আমি তোমায় বলছি যে, রাত্রে শ্যামাচরণদাকে উপোস করতে হবে না ; যা তুমি রেঁধেছ, তা দাদা তো খাবেই, আমি নিজেও খাব। আর তার আগে এ বেলায় এক্ষুনি আমি কিছু খেয়ে নেব। তুমি জান তো বউদি যে, উপোস করা আমার ধাতে সয় না, একটু বেলা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলেই পিত্তি প'ড়ে আমার অসুখ করে। আজ হরতাল। হোটেল বন্ধ ; রাঁধবার মোটে সময়ই নেই। সেই জন্যই তো এই দুপুরবেলায় তোমার এখানে ছুটে এসেছি। দুটি ডাল-ভাত তোমার হাঁড়ি থেকে এক্ষুনি আমায় দাও, বউদি ; আর ওর সঙ্গে অন্তত একটি পিঠে।

কথাটা সারদা বিশ্বাসই করতে পারলে না ; ব'লেই ফেললে, সত্যি খাবেন, সুবোধবাবু?

'সত্যি' কি বলছ বউদি!—সুবোধ হেসে উত্তর দিলে, তিন সত্যি ক'রে বলছি—খাব, খাব, খাব। আর দেরি ক'রো না। ক্ষিধেয় আমার নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেল।

এবার খুশির আলোকে সারদার মুখখানি ঝলমল ক'রে জ্ব'লে উঠল। এই দিই।—ব'লে উঠে দাঁড়াল সে ; সঙ্গে সঙ্গেই হাত ধুয়ে সুবোধের জন্য ভাত বাড়তে বসল সে।

ব্যাপার দেখে শ্যামাচরণ কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ; তার মুখের দিকে চেয়ে সুবোধ কৌতুকের স্বরে বললে, তুমিও দুটি খেয়ে নাও না, শ্যামাচরণদা, কম ক'রে খেলে তোমার উপোসব্রত ভঙ্গ হবে না।

শ্যামাচরণ চমকে উঠল ; জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললে, না, সুবোধবাবু, তা হয় না।

কিন্তু আমি যে খাচ্ছি!—সুবোধ উত্তরে বললে।

শ্যামাচরণ এবার হেসে ফেলে উত্তর দিলে, আপনার কথা আলাদা, সুবোধবাবু। কোন নিয়ম আপনার না মানলেও চলে, আমাদের সন্ন্যাসীদের যেমন সন্ধ্যে-আহ্নিকের নিয়ম মানতে হয় না। কিন্তু আমি সংসারী লোক, হরতালের দিন উপোস আমাকে করতেই হবে।

সুবোধ আর হাসলে না; একটু বরং উদ্বিগ্ন হয়েই সে বললে, কিন্তু রাত্রে? রাত্রেও কি সত্যি তুমি উপোস করতে চাও?

শ্যামাচরণ এবার কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে; বললে, না, আপনি যখন বলছেন, তখন রাত্রে খাব। কিন্তু এ বেলা কিছুই নয়।

সুবোধ মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে; হেসে বললে, তা বেশ। কিন্তু তারার খাওয়াটাও মাঝখান থেকে নষ্ট করছ কেন? ও বেচারী যে সেই তখন থেকে মুখ চুন ক'রে ব'সে রয়েছে!

খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গাম চুকে যাবার পর শ্যামাচরণ ঘরের ভিতর থেকে ছাপা ইস্তাহারের একটা বড় বাণ্ডিল বের ক'রে নিয়ে এল।

তাই দেখে সারদা এগিয়ে এসে বললে, আমায় কিছু দিয়ে যাও।

তুমি ইস্তাহার দিয়ে কি করবে?—শ্যামাচরণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর হ'ল, কেন,—বাটব।

শ্যামাচরণ চমকে সুবোধের মুখের দিকে তাকাল; সুবোধ হেসে ফেলে বললে, তুমি ইস্তাহার বাটবে কি, বউদি? পুলিস দেখতে পেলে তক্ষুনি তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবে যে!

কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে তৎক্ষণাৎ সারদা উত্তর দিলে, নেয় নেবে। সবাই যদি জেলে যেতে পারে তো আমি পারব না?

সুবোধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সারদার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হঠাৎ সবেগে মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে সে বললে, না, বউদি, জেলে তোমার যাওয়া হবে না। বাইরে থেকে শুধু তোমার এই তারাকে তোমার নিজের মত ক'রে তুমি তৈরি ক'রে দিয়ে যাও, যাতে বড় হয়ে স্বামীর পায়ের শিকল হয়ে তার জীবনটাকে ও পঙ্গু না করে,—যাতে তোমারই মত সে তাকে পথ

চলবার, আগে যাবার শক্তি দেয়। তা হ'লেই দেশের খুব বড় সেবা করা হবে তোমার।

সারদার সঙ্গে আর কোন কথা তার হ'ল না; পথে এসেও আগের প্রসঙ্গের উল্লেখ পর্যন্ত না ক'রে শ্যামাচরণকে সে বললে, তুমি গা-ঢাকা দিয়ে থেকো, শ্যামাচরণদা, আমিও তাই থাকব। আর তা ছাড়া কাল সারা দিন আমি হয়-তো এ অঞ্চলেই থাকব না। অনর্থক আমার খোঁজ ক'রে হয়রান হ'য়ো না যেন।

শ্যামাচরণ উত্তরে শুধু বললে, তা বেশ

কিন্তু আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সে থমকে দাঁড়াল; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, একটা কাজ ভুলে এসেছি, সুবোধবাবু। আপনি যান, আমি একটু পরেই আসছি।

রোয়াকের একটা কোণে পা ঝুলিয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল সারদা। তার চোখে উন্মনা ভাব, মুখে বিষণ্ণ উদাসীনতা, দুই গালের উপর অশ্রুর সূক্ষ্ম দুটি ধারা ব'য়ে চলেছে। তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে তারা ক্রমাগতই তাকে কি যেন জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছিল। কিন্তু সারদার মুখে উত্তর নেই, মেয়ের কথাগুলি বোধ করি তার কানেও যাচ্ছিল না।

শ্যামাচরণকে দেখেই তারা উল্লসিত হয়ে বললে, এই যে, বাবা—

সারদা সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠল; ক্ষিপ্র হস্তে গায়ের কাপড় ঠিক ক'রে উঠে দাঁড়াল সে। তার ব্যবহারে এমন একটা ভাব প্রকাশ পেল, যেন স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে কি একটা কাজ করবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ সে ধরা প'ড়ে গিয়েছে।

কিন্তু ততক্ষণে তারা ছুটে এসে আবার দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল; শ্যামাচরণ তাকেই কোলে তুলে নিয়ে তার দুই গালে দুটি চুমো খেয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, তোমাকে এমন একটা জিনিস আজ দেব, মা, যা আগে তুমি কোন দিনই পাও নি।

তখনই ঘর থেকে টিনের ছোট একটি তোরঙ্গ সে বের ক'রে নিয়ে এল; ডালা খুলে সেটা উপুড় ক'রে ভিতরের সব জিনিস সে মাটিতে ছড়িয়ে দিলে; তার পর খুঁজে খুঁজে ঝক্‌ঝকে একটা আধুলি বের ক'রে সেটি তারার হাতে

দিয়ে পরে সে বললে, এই দিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে তুমি বায়স্কোপের ছবি দেখো; কিন্তু আজ নয়, কাল।

তারা উল্লসিত হয়ে বললে, সে বেশ মজা হবে, বাবা, কিন্তু তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে—হ্যাঁ, যেতেই হবে তোমাকে, নইলে যাব না তো আমি—কক্ষনো না।

শ্যামাচরণ হেসে ফেলে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে কাল দেখা যাবে 'খন। এখন তুমি একটু বাইরে যাও তো, মা, তোমার মাসীর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে এস। ততক্ষণে তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একটু কথা ব'লে নি।

তারাকে বিদায় ক'রেই শ্যামাচরণ সারদার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্যই ফিরে এলাম। সত্যি ইস্তাহার বাটতে চাও তুমি?

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে সারদা উত্তর দিলে, তাই তো সাধ ছিল, শুধু ইস্তাহার বাটবার কেন, আরও সব কাজ করবার। এমন একটা দিন! কে জানে, জীবনে এ দিন আর আসবে কি না!

কিন্তু সুবোধবাবু যা বললেন,—তোমার কিছু হ'লে তারার কি হবে?—শ্যামাচরণ বিব্রতের মত প্রশ্ন করলে।

সারদা উত্তরে বললে, তা-ও মোটামুটি ঠিক ক'রেই রেখেছি আমি। দেশে জমিজমা কিছু তো এখনও আমাদের আছে, বাড়ির কাছে তারার মাসীও আছে। তাই ভেবেছিলাম যে, তারাকে তার মাসীর কাছেই না হয় রেখে আসব।

সত্যি!—শ্যামাচরণ উৎফুল্ল হয়ে বললে, সত্যি এ কাজ পারবে তুমি? এই দেশে গিয়ে, মানে, তারাকে ছেড়ে—

বলতে বলতে বিভ্রান্তের মত থেমে গেল শ্যামাচরণ; তার পর কুণ্ঠিত ভাবে একটু হেসে সে আবার বললে, মানে, আগে কোন দিনই দেশে তুমি যেতে চাও নি কিনা, তাই কথাটা কেমন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

সারদার মুখেও বিষণ্ণ রকমের একটু হাসি ফুটে উঠল; উত্তরে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, তোমাকে ছাড়বার জন্য ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে যাওয়া আর তোমার সঙ্গে যাবার জন্যই মেয়েকে দেশে রেখে আসার তফাৎ যে কি, তা

তুমি কোন দিনই বোঝ নি; আজও না বুঝলে আমি আর কেমন ক'রে বোঝাব?

প্রায় একটি মিনিট শ্যামাচরণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল; তার পর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, তাই কর তবে। আজকালের মধ্যেই ওকে নিয়ে চ'লে যাও তুমি। আমি তো গা-ঢাকা দিয়েই আছি, এবার খুব শীগগির ধরা পড়ব না আশা করি।

একে যুদ্ধের বাজার, তায় আবার যে কারখানায় যুদ্ধের মালমসলা তৈরি হয় সেখানেই মজদুরের ধর্মঘট হয়েছে। তা-ও যে-সে ধর্মঘট নয়, রাজনৈতিক কারণে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মজদুরের ধর্মঘট। এ দিকের এই অসাধারণ অবস্থার জন্যই ওদিকের আয়োজনটাও হচ্ছিল জমকালো রকমের।

কারখানার ম্যানেজার হান্‌টার সাহেবের কাছ থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েই পুলিসসাহেব দু গাড়ি সশস্ত্র পুলিস পাঠিয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় থানার দারোগাও এসেছিল তার সব দলবল নিয়ে। তার পর আরও পুলিস এল, এল তাদের অফিসার। সাদা পোশাক-পরা গোয়েন্দা পুলিসও এল অনেক। ময়দানে অতিরিক্ত পুলিসের জন্য তাঁবু পড়ল সারি সারি। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পুলিস পাহারা মোতায়েন হ'ল; সশস্ত্র পুলিস গিয়ে মজদুরের ব্যারাক আর বস্তি ঘিরে ফেললে; সঙ্গীন-চড়ানো বন্দুক কাঁধে নিয়ে শাস্ত্রীরা পথে পথে টহল দিয়ে ফিরতে লাগল। কারখানার দরোয়ান আর চরেরা ব্যারাক আর বস্তির ভিতরে চ'লে গেল ধর্মঘটকারী মজদুরদের ভয় দেখিয়ে বা ভুলিয়ে কাজে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

কিন্তু এত আড়ম্বর ও এত চেষ্টাতেও ফল কিছুই হ'ল না। সন্ধ্যার পর রাত্রির কাজের জন্য মজদুরদের হাঁক দিয়ে আবার কারখানার বাঁশী বেজে উঠল, কিন্তু মজদুরেরা কাজে এল না। বৈকালের মত রাত্রেও কারখানা বন্ধ রইল। পরদিন ভোরে যথাসময়ে আবার বাঁশী বাজল; কিন্তু সে দিনও ফল হ'ল না। সিপাইসান্ত্রীর হেফাজতে যে ক'জন লোক কাজ করতে এল তারা সংখ্যায় এত কম যে, তাদের দিয়ে কেবল ইঞ্জিনটাও চালানো যায় না।

খানিকটা বেলা হতেই হান্টার সাহেবের লোক গিয়ে বিমলকে সাহেবের আপিসে ডেকে নিয়ে এল।

সাহেবের মেজাজ তখন পঞ্চমে চ'ড়ে গিয়েছে; বিমলকে দেখেই মুখ লাল ক'রে সে বললে, এ সব কি হচ্ছে ?

ব্যাপার দেখে বিমল নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তার সহানুভূতি একটুও নেই; হরতালের ফলে যে কারখানা অচল হয়ে যায়, তা সে কিছুতেই চায় না। অথচ তৎসত্ত্বেও হরতাল হয়েছে; তাকে এবং তার ইউনিয়নকে না জানিয়েই শত-করা প্রায় নিরানব্বই জন মজদুরই হরতাল ক'রে বসেছে। এ জন্য তার নিজেরই লজ্জা এবং ক্ষোভের অবধি ছিল না। কাজেই সাহেবের উদ্ধত কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে কুণ্ঠিত স্বরেই সে বললে, আমি ঠিক জানি নে। এ হয়তো গান্ধীজী আর নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ, মজদুরদের উত্তেজিত চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, এ হয়তো হরতাল।

না।—সাহেব প্রতিবাদ ক'রে বললে, এ হরতালের চেয়ে ঢের গুরুতর ঘটনা, এ ধর্মঘট। যুদ্ধকালে এ জিনিস রীতিমত বিদ্রোহ।

বিমল মুখ নামিয়ে বললে, তা যদি হয়ও, তা হ'লেও এর দায়িত্ব আমাদের নয়। আমরা ধর্মঘট করাই নি।

আলবৎ করিয়েছেন। আমি খবর পেয়েছি যে, ইউনিয়নের নামে ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে, সভা করা হয়েছে, মজদুরদের দস্তুরমত উত্তেজিত করা হয়েছে।

একটু ইতস্তত ক'রে বিমল বললে, তা যদি হয়েও থাকে, তা হ'লেও সে আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে হয় নি।

তবে কোন্ ইউনিয়ন ?

সোজা উত্তরটাকে এড়িয়ে বিমল বললে, আমাদের ইউনিয়ন ছাড়াও অন্য ইউনিয়ন এখানে আছে, তা আপনি জানেন।

টেবিলের উপর জোরে একটা ঘুষি মেরে সাহেব বললে, ও সব এক রকম পাখাওয়ালা পাখি। আমি আপনাদের সব ক'জনকে গ্রেপ্তার করাব।

বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল; কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠেই সে

বললে, আপনার যাকে খুশি তাকেই আপনি গ্রেপ্তার করাতে পারেন, কিন্তু মিথ্যে অভিযোগ করবেন না। আমাদের নীতি ওদের নীতির বিপরীত। আমরা ধর্মঘট চাই নে, ধর্মঘট ভাঙতে চাই; আমরা বিদ্রোহ চাই নে, সহযোগিতা করতে চাই।—এ কথা আপনার মত লোকের জানা উচিত।

সাহেব এবার ঈষৎ একটু অপ্রতিভ হয়েই বললে, তাই জানতাম ব'লেই তো এত দিন সব রকমে আপনাদের সাহায্য করেছি। কিন্তু সেটা যে আমাদের মারাত্মক একটা ভুল হয় নি, আজ এই এত বড় ধর্মঘটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনি তার কি প্রমাণ দিতে পারেন?

বিমল বললে, প্রমাণ আপনি আমাদের কাজের মধ্যেই দেখতে পাবেন, আমরাই এ ধর্মঘট ভাঙব।

শেষের কথাটা সে বেশ জোর দিয়েই বললে, এত জোর দিয়ে বললে যে, সাহেব কথাটাকে বিশ্বাস না করলেও সরাসরি উড়িয়েও দিতে পারলে না। তার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে বিমলই আবার বললে, আপনার ইচ্ছে হয়, আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারেন। কিন্তু তাতে আপনার লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হবে।

সাহেব ভিতরের সন্দিগ্ধ ভাবটা গোপন করবার জন্যই টেবিলের উপর আবার একটা ঘুষি মোর বললে, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি নে, আমি মিঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, তাই বলবেন। ইদানীং অনেক দিন তিনি কলকাতায় ছিলেন না; কিন্তু আপনাদের ভাগ্য ভাল, ঠিক সময়মতই তিনি ফিরে এসেছেন। আর তাঁর কাছে লোকও পাঠিয়েছি আমি, হয়তো এতক্ষণে তিনি এসেও গিয়েছেন।

সত্যই ওদিকে অরুণাংশু ইউনিয়নের আপিস-ঘরে বিমলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। সাহেবের ওখান থেকে ফিরে এসে বিমল সংক্ষেপে অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে বললে; উপসংহারে বললে, আমরা এখানে থাকতেও ধর্মঘট হ'ল দেখে সাহেব খুব চ'টে গিয়েছে।

উত্তরে অরুণাংশু বললে, সাহেবের চ'টে যাওয়াটা বড় কথা নয়, বিমল, ধর্মঘট যে হয়েছে এইটেই বড় কথা; আর আমাদের পক্ষে লজ্জার কথাও বটে।

বিমল মুখ ভার ক'রে আভি[illegible] স্বরে বললে, আপনি অনেক দিন এ দিকে না আসাতেই এ রকম হ'ল। আপনি থাকলে সুবোধদার কথায় ওরা হরতাল করে কখনও!

অরুণাংশু লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, এলাহাবাদ গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম কিনা! নইলে কি আর এখানে না আসি! গরজ আমার নিজের ব'লেই তো কংগ্রেসের প্রস্তাব পাস হতে না হতেই এখানে ছুটে এসেছি।

কিন্তু তার পর মুখ তুলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, তবে তোমার কথাও সবটা ঠিক নয়, বিমল। লজ্জা ঢাকবার জন্য নিজের কাছে নিজের দাম আমি বাড়াতে চাই নে। আমি এখানে থাকলেও হয়তো এ হরতাল আমি বন্ধ করতে পারতাম না। এ তো কেবল সুবোধের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতাই নয়,—এ প্রতিযোগিতা কংগ্রেসের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির। এর প্রথম খেলায় কংগ্রেস যে জিতে গিয়েছে, এই সত্য কথাটা অন্তত নিজেদের মধ্যে আমাদের মেনে নেওয়াই উচিত।

বিমলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কথাটা সত্য, সে নিজেও তা বুঝতে পেরেছে। তবু এত বড় একটা পরাজয় মেনে নেওয়া খুব সোজা নয়।

তার মনের ভাবটা আন্দাজ ক'রে নিলে অরুণাংশু; হাতের খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে ব'সে সে বললে, তুমি ভেবো না, বিমল; এই পরাজয়কেই আমি বিজয়ে পরিণত করব। ধর্মঘট আমি অবশ্যই ভাঙব, কিন্তু ধর্মঘট করাবার যে কৃতিত্ব সেটাও ছাড়ব না।

বিমল চমকে উঠে বললে, কিন্তু আমি যে সাহেবকে ব'লে এলাম—ধর্মঘট আমরা করাই নি!

তাতে কোনই দোষ হয় নি।—অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, কর্তৃপক্ষের কাছে সেই কথাই আমাদের বলতে হবে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে, মজদুরের কাছে কোন মতেই সে কথা আমরা স্বীকার করব না।

বিমল বিহ্বলের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে অরুণাংশুই অল্প একটু হেসে আবার বললে, কথাটা বুঝতে পারছ না? ধর্মঘট আমরা করাব না নিশ্চয়ই; কিন্তু তাই ব'লে আমরা ছাড়া আর কেউ মজদুরকে দিয়ে

ধর্মঘট করাতে পারে, এ কথা কি প্রকাশ্যে আমরা স্বীকার করতে পারি? সে যে আমাদের আত্মহত্যার সামিল হবে, বিমল।

হান্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে অরুণাংশু বললে, মজদুরকে আমি কাজে ফিরিয়ে আনব নিশ্চয়ই; কিন্তু আমাকে সভা আর মিছিল করবার সুযোগ দিতে হবে।

এবারকার বৈঠকে স্বয়ং পুলিস সাহেবও উপস্থিত ছিল; কথাটা শুনেই সে চমকে উঠে বললে, অসম্ভব।

অরুণাংশু অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, তা যদি অসম্ভব হয়, সাহেব, তবে ধর্মঘট ভাঙাও অসম্ভব হবে।

আলোচনার শুরুতেই যবনিকাপাত হয় দেখে হান্টার সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কিন্তু, মিঃ সেনগুপ্ত, সভা আপনি করতে চান কেন?

অরুণাংশু উত্তরে বললে, সভায় এদের একত্র করতে না পারলে আমার কথা সকলকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু এটা স্থূল কারণ; সভা করবার গূঢ় উদ্দেশ্য, মজদুরদের অন্তরের আবেগকে চরিতার্থ করা।

সাহেব কথাটা শুনেও মূঢ়ের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে অরুণাংশু অল্প একটু হেসে আবার বললে, ওদের ভিতরে যে বাষ্পটুকু জমেছে, তা বের ক'রে দিতে হবে না? সভা করলে সেফ্‌টি ভাল্‌ব খুলে তাই বের ক'রে দেওয়া হবে।

তথাপি সাহেব বিহ্বল স্বরে বললে, কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে?

লাভ হবে অনেক।—অরুণাংশু কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রে উত্তর দিলে, পাহাড় থেকে যে ঝরনাধারা ছুটে বের হয়ে এসেছে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করলে কারও কোন লাভ হয় না; কিন্তু যে লোক বুদ্ধিমান, সে ওই জলের গতি থেকেই বিজলী বের ক'রে নিয়ে তাকে অনেক দরকারী কাজে লাগাতে পারে। মজদুরের আবেগও প্রবল একটা জলোচ্ছ্বাসের মত। বাধা যদি আপনারা না দেন, তবে আজকের এই অসহযোগিতার আবেগকেই আমি সহযোগিতার পথে চালিয়ে দিতে পারব।

পুলিস সাহেব ভুরু কুঁচকে বললে, কিন্তু উল্টো ফল যদি হয়? মজদুরেরা জনসভায় সমবেত হ'লে দাঙ্গাহাঙ্গামা যদি শুরু হয়ে যায়?

এ বারও অরুণাংশু কিছুমাত্র ইতস্তত না ক'রেই উত্তর দিলে, আপনার সশস্ত্র শক্তির সমাবেশ এখানে তো নিতান্ত কম হয়েছে ব'লে মনে হয় না! এ কি কেবলই দেখাবার জিনিস, সাহেব? আপনার বন্দুকধারী সিপাইরা কি গুলি ছুঁড়তে জানে না?

পুলিস সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হান্টার সাহেবেরও মুখ লাল হয়ে উঠল। দুজনের কেউ কোন উত্তর দিলে না। একটু পরে অরুণাংশুই আবার বললে, শুধু সভা আর মিছিল করবার অনুমতি নয়, মিঃ হান্টার, মজদুরের মাগ্‌গী ভাতাও বাড়িয়ে দিতে হবে।

সাহেব চমকে উঠে বললে, কিন্তু, মিঃ সেনগুপ্ত, আমরা তো মাগ্‌গী ভাতা দিয়েছি, আর আর কোম্পানির চেয়ে বরং বেশিই দিয়েছি!

অরুণাংশু হেসে উত্তর দিলে, কিন্তু তার পর হাওড়ার পোলের তল দিয়ে কত জল ব'য়ে গিয়েছে, তা তো আপনার অজানা থাকবার কথা নয়, সাহেব! জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, সেই হারে ভাতা বাড়াবার জন্য এর মধ্যে উনিয়ন থেকে কত বার আমরা দরখাস্ত করেছি, তা-ও কি এখন আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

হান্টার সাহেব এতক্ষণ বিহ্বলের মত কথা বলছিল, এ বার বিরক্ত হয়ে বললে,আপনি নিতান্তই অবান্তর কথার অবতারণা করছেন, মিঃ সেনগুপ্ত। মাগ্‌গী ভাতার জন্য তো মজদুরেরা হরতাল করে নি, করেছে সরকারকে অচল করতে।

অরুণাংশু এমন ভাবে সাহেবের চোখের দিকে তাকাল যেন তাকে সে সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে; ঠিক ওই ভাবে চোখের দিকে চেয়েই সে বললে, কিন্তু ধর্মঘট তো করেছে! আর সেই ধর্মঘট আপনি ভাঙতে তো চাচ্ছেন! সে কি কেবল মুখের কথাতেই হবে, সাহেব? একেবারেই কি কোন দাম দিতে হবে না? আর দামের কথা যদি ছেড়েও দেন, যারা কাজ ছেড়ে চ'লে এসেছে, তাদের কাজে ফিরে যাবার জন্য সঙ্গত একটা উপলক্ষ্য দিতে হবে তো!

কিন্তু তা আমি কেমন ক'রে দেব?—সাহেব আরও বিরক্ত হয়ে বললে, গান্ধীকে ছেড়ে দেওয়া বা জাতীয় সরকার গঠন করার অধিকার তো আমার নেই।

নেই ব'লেই মাগ্‌গী ভাতা আপনাকে বাড়িয়ে দিতে বলছি।—অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে।

তার পর সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে হাসতে সে আবার বললে, সহযোগিতা কি এক তরফা হয়, সাহেব? আপনি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কেমন ক'রে আপনাকে সাহায্য করব?

দুই সাহেবের মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। তার পর হান্‌টার সাহেব অরুণাংশুকে বললে, আপনাকে একটু বসতে হবে, মিঃ সেনগুপ্ত। আমাদের দুজনের এক বার গোপনে আলাপ করা দরকার।

আধ ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে পুলিস সাহেব বললে, সভা আপনি ডাকতে পারেন, মিঃ সেনগুপ্ত; কিন্তু সভা হবে ধর্মঘট ভাঙবার জন্য। তার ব্যতিক্রম যদি হয়, তবে সভাক্ষেত্রেই আপনাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। আমার লোক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওখানে মজুত থাকবে।

পলকের জন্য অরুণাংশু একটু যেন ইতস্তত করলে; কিন্তু তার পর হেসে ফেলেই সে বললে. তা বেশ। কিন্তু মাগ্‌গী ভাতা? তা বাড়িয়ে দেবেন তো?

হান্‌টার সাহেব গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, তা দেব। কিন্তু সে হবে ধর্মঘট ভাঙবার পর, আগে নয়।

সে তো টাকা।—অরুণাংশু মুচকি হেসে বললে, কিন্তু ভাতা বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি আপনাকে আগেই দিতে হবে।

এবার হান্‌টার সাহেবের ঠোঁটের কোণেও অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল; বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, প্রতিশ্রুতি কাকে দেব, মিঃ সেনগুপ্ত? ভাতা যারা পাবে, তারা তো ধর্মঘট ক'রে ব'সে রয়েছে। আর আপনাদের আমি প্রতিশ্রুতি দেব কোন্ ভরসায়? আপনারাই যে মজদুরদের সত্যিকারের প্রতিনিধি, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তো এখনও আমি পাই নি!

অরুণাংশুর মুখ লাল হয়ে উঠল; ভুরু কুঁচকে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, প্রমাণ যদি আমি দিতে পারি, সাহেব? মাগ্‌গী ভাতা দাবি করবার জন্য এই তিন হাজার মজদুরকে যদি আমি আপনার বাংলোয় নিয়ে হাজির করতে পারি?

তা হ'লে অবশ্যই ভাতা বাড়িয়ে দেব।—সাহেব তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু অরুণাংশু চ'লে যাবার আগে মুখ গম্ভীর ক'রে সাহেব তাকে সতর্ক ক'রে দিলে, তবে মনে থাকে যেন, মিঃ সেনগুপ্ত ; জনতা শান্ত হওয়া চাই, আর দু-এক দিনের মধ্যেই কারখানা চালু ক'রে দেওয়া চাই।

বাইরে গিয়েই অরুণাংশু উৎফুল্ল স্বরে বললে, দেখলে, বিমল ? পুঁজির মালিক শ্রমের মালিককে আজ আর চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে পারে না, তাকে আজ তার তোয়াজ করতে হয়। এ তোয়াজ শক্তির পায়ে শঙ্কিতের অর্ঘ্যনিবেদন। মালিক জানে যে, মজদুরের এই শক্তিই তার মৃত্যুবাণ ; তবু—। বলতে বলতে অরুণাংশু শব্দ ক'রে হেসে উঠল, তবু যুদ্ধের পরিস্থিতির চাপে নিজের হাতেই আজ তাকে নিজের মৃত্যুবাণ তৈার করতে হচ্ছে।

কিন্তু বিমল হাসলে না। সে ভাবছিল কেবল বর্তমানের সমস্যার কথা। কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, সাহেবের কাছে অত জোর ক'রে আপনি যে ব'লে এলেন, অরুণদা, কার্যকালে ধর্মঘট যদি আমরা ভাঙতে না পারি ?

আলবৎ পারব।—অরুণাংশু দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, পারতেই হবে।

কিন্তু বিমলের সংশয় দূর হ'ল না। সেটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে অরুণাংশুই আবার বললে, ওদের তুলনায় আমাদের শক্তি তো আজ ঢের বেশি। ওদের যুক্তি নেই ; মজদুর যা বোঝে এবং চেনে, সে রকম দেবার মত কোন সম্পদ নেই ; ওদের সংগঠন নেই, সভা বা মিছিল করবার স্বাধীনতাও নেই। অথচ এর কোনটারই অভাব নেই আমাদের। তবু আবেগমাত্রসম্বল একটা ধর্মঘট যদি আমরা ভাঙতে না পারি, তবে রাজনৈতিক দল হিসাবে আমাদের তো আত্মহত্যা করা উচিত।

বোধ করি অরুণাংশুর কথাগুলিকেই আবেগ মনে ক'রে বিমল উত্তর না দিয়ে মাথা চুলকাতে শুরু করলে।

দেখে অরুণাংশু অসহিষ্ণুর মত বললে, অত ভাবছ কি, বিমল ? তোমার ভাবনা পরে ভেবো তুমি। আপাতত সভার আয়োজন করতে লেগে যাও। কাল দুপুরে সভা করতে হবে,—এমন সভা করতে হবে আগে যা কখনও এখানে হয় নি।

তথাপি বিমল কুণ্ঠিত স্বরে বললে, কিন্তু তার আগে আমাদের কার্যকরী সমিতির একটা সভা হওয়া চাই তো !

কিছু দরকার নেই।—অরুণাংশু মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, আজকের অসাধারণ অবস্থায় সাধারণ ব্যবস্থা একটাও চলবে না। বৈঠক আর আলোচনা আজকের জন্য নয়। আজ যুক্তি নয়, বক্তৃতাও নয়; আজ শুধু চাল আর জিগির। বিদ্যুতের গতিতে যে ধর্মঘট হয়েছে, বিদ্যুতের গতিতেই তা ভাঙতে হবে; যারা ধর্মঘট করিয়েছে, তারা কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঝড়ের বেগে মজদুরদের আমরা কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

আপিসে ফিরে গিয়ে অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ একটা ইস্তাহার লিখে ফেললে। সত্যই যুক্তি নয়, কেবল জিগির—মাগ্‌গী ভাতা দ্বিগুণ চাই, দেশনেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, জাতীয় সরকার কায়েম হোক—এই সব। খুব তলিয়ে না দেখলে বোঝবারই উপায় নেই যে, সেটা অরুণাংশুর তরফ থেকে বের হয়েছে, না সুবোধের।

কাগজখানা বিমলের হাতে দিয়ে অরুণাংশু বললে, আজই এটা ছাপিয়ে আন। কাল সভার আগেই হাতে হাতে পৌঁছে দিতে হবে এর এক এক খানা ইস্তাহার। হরতাল যারা করেছে, তাদের ভাবনার গতিটাকেই একেবারে আর এক দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

পরের দিন সভা হ'ল। সত্যই এমন সভা হ'ল যেমনটি এ অঞ্চলে আগে আর কখনও হয় নি।

ময়দানের বাইরে এক দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে অশ্বারোহী সশস্ত্র পুলিস, আর এক দিকে লাঠি বা বন্দুকধারী সিপাই। ঘোড়ার জিন, বন্দুকের সঙ্গীন আর কোমরের পিতলের চাপরাসে দুপুরের রোদ ঝকমক করছে। তাঁবুর ভিতরে, বড় রাস্তার উপরে, মোটর লরির মধ্যে সাজপোশাক আর হাতিয়ার প'রে দলে দলে আরও সব সিপাই তৈরি হয়ে রয়েছে,—এরা সব রিজার্ভ ফোর্স। দারোগা আর উপ-দারোগারা কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তদারক করে ফিরছে। পুলিস সাহেব নিজে স্টীল-হেল্‌মেট মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকেই পুলিসের আড়ম্বর। ময়দানটাকে দেখলে মনে হয়, যেন এক সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। অথচ ওরই মাঝখানে মজদুরদের জনসভা।

সেখানেও আয়োজন বা আড়ম্বরের ত্রুটি নেই। তক্তপোশ পেতে বেদী গড়া হয়েছে, টেবিল খাড়া ক'রে হয়েছে বক্তৃতামঞ্চ; সুদর্শনচক্রের মত মাইক্রোফোন মঞ্চের উপরে রৌদ্রে ঝকঝক ক'রে জ্বলছে। লাল ঝাণ্ডা কত যে উড়েছে তার হিসাব করা শক্ত; বাঁশ পুঁতে তার ডগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লাল কালিতে লেখা মোটা মোটা হরফের সব গালভরা শ্লোগান। বেদীর চারদিকে বিপুল জনসমাবেশ,—সে যেন অশান্ত, ক্ষুব্ধ, কল্লোলিত বিরাট এক মহাসাগর।

মজদুরেরা অধিকাংশই সভায় এসেছে, স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ট্যাঁড়া শুনেই সবাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দুদিন তারা কাজ বন্ধ ক'রে ঘরে ব'সে রয়েছে। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা ওদের ভাল লাগে নি। তাদের বুকের মধ্যে যে আবেগে গর্জন ক'রে ফুলে উঠেছিল, তা কেবল হরতাল ক'রেই চরিতার্থ হয় নি। সক্রিয় ভাবে আরও কিছু করবার জন্য একটা অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তাদের বুকের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল।

ঠিক এই রকম অবস্থায় ট্যাঁড়াওয়ালা সভার খবর ঘোষণা ক'রে গেল। সকলের ডাক পড়ল ইউনিয়নের নামে। সবাই শুনতে পেলে যে, বড় বড় নেতারা সভায় বক্তৃতা করবে, এমন কি, অরুণাংশুও। অনেক দিন এরা অরুণাংশুর দেখা পায় নি, তার বক্তৃতা শোনা দূরে থাক্। সে কি বলবে তা বড় কথা নয়, সে যে বলবে তা-ই এদের প্রধান আকর্ষণ। তার উপর আবার মিছিল। আগের দিনের নিষ্ক্রিয়তার তুলনায় এ আহ্বান কর্মের এবং কর্মের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশের সভা, বক্তৃতা এবং মিছিলের নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদনার নিমন্ত্রণ উচ্ছ্বসিত, কিন্তু অপরিতৃপ্ত আবেগের চরিতার্থতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মজদুরসাধারণকে চঞ্চল ক'রে তুললে। সভা আরম্ভ হবার কথা দুপুর দুটায়; কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই প্রকাণ্ড ময়দানটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

শ্যামাচরণও এল, কিন্তু অন্যান্য অনেকের মত উৎসাহিত বা উল্লসিত হয়ে নয়। একা সেই বেচারাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সকালবেলায় ট্যাঁড়া শুনেই আঁতকে উঠেছিল সে; বুঝেছিল যে, এ ডাক প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিস্ট ইউনিয়নের। রীতিমত ভয় পেয়ে তখনই সে ছুটে গিয়েছিল সুবোধের

খোঁজে। কিন্তু তার দেখা সে পায় নি। তাতেই সে উভয়সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিল। সভা করবার কোন কথাই ছিল না; বরং নাম-করা সব ক'জন কর্মীর প্রতিই নির্দেশ ছিল যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার। কিন্তু নিজে সে না গেলেও যে সভা অবশ্যই হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল যার ভিতর দিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল ক'রে নেবে, সেই সভাকে একেবারে উপেক্ষা ক'রে ঘরের মধ্যে সে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারে নি।

সভায় গিয়েই সে বুঝতে পারলে যে, তার আশঙ্কা অমূলক নয়, মজদুরদের অধিকাংশকেই কম্যুনিস্টরা জয় ক'রে নিয়েছে।

ঠিক জয় করা নয়, ভুলিয়ে নেওয়া। অবস্থা দেখে প্রথম দিকে শ্যামাচরণ এমনি বিহ্বল হয়ে পড়ল যে, করবার মত কিছু সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

সুবোধবাবু কই—সুবোধবাবু?

জনতার ভিতর থেকে কে এক জন ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলে। দু-তিন জায়গায় ওই জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনিও বেজে উঠল। কিন্তু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দুইই চাপা প'ড়ে গেল তুমুল জয়ধ্বনির নীচে,—লাল ঝাণ্ডাকী জয়!

জিগির আর শেষ হয় না। মঞ্চের উপর থেকে বিমলের এক জন সহচর ক্রমাগত জিগির দিয়ে যাচ্ছে, আর জনতা তুলছে তার প্রতিধ্বনি। এই জয়ধ্বনির মধ্যেই পিছন থেকে মঞ্চের উপর উঠে এল অরুণাংশু। তার পরনে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবি; মাথায় দুধের মত সাদা গান্ধী-টুপি। দু হাত জোড় ক'রে, মাথাটা একটু নামিয়ে জনতাকে সে অভিবাদন জানালে। পিছন থেকে তারই এক জন অনুচর ব'লে উঠল, অরুণাংশুবাবুকী জয়—

জনতা প্রতিধ্বনির মত বললে, অরুণাংশুবাবুকী জয়।

সে ধ্বনি থামতেই নীচের ভিড়ের ভিতর থেকে কে এক জন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, মহাত্মা গান্ধীকী জয়—

মৌচাকের গায়ে হঠাৎ ঢিল পড়লে যে অবস্থা হয়, সভায় ঠিক সেই রকম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মঞ্চের উপর অরুণাংশু আর তার অনুচরেরাও চঞ্চল হয়ে উঠল।

নীচে জনতাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, হাজার তিনেক লোক এক সঙ্গে হাত তুলে, মাথা নেড়ে গর্জন ক'রে উঠল, মহাত্মা গান্ধীকী জয়!

কিন্তু ওই এক বার মাত্রই। বিমল নিজে লাফ দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল; অরুণাংশুকেও ঠেলে সরিয়ে দিলে সে; নীচে জনতার ভিতর থেকে যে লোকটি মহাত্মা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল, সে অভ্যাস ও নিয়মমত দ্বিতীয় বার ওই জিগির সম্পূর্ণ করবার আগেই বিমল হাত তুলে শূন্যে বৃত্তের পর বৃত্ত আঁকতে আঁকতে পঞ্চমে স্বর চড়িয়ে বললে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়—

মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে ওই আওয়াজ হাজার গুণ উঁচু হয়ে বিশাল ময়দানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নীচের লোকটির ক্ষীণ কণ্ঠের অর্ধসমাপ্ত জয়ধ্বনি কণ্ঠ ও যন্ত্রের সম্মিলিত ওই গর্জনের নীচে চাপা প'ড়ে গেল।

নীচে জনতা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি জয়ধ্বনিই তিন বার উচ্চারণ করতে হয়, এটাই সভার সাধারণ নিয়ম। মহাত্মা গান্ধীর নামে জয়ধ্বনি হয়েছে মোটে এক বার; কাজেই আরও দু বার ওই মন্ত্রই উচ্চারণ করবার জন্য সবাই তৈরি হয়ে ছিল। অথচ অকস্মাৎ ভিন্ন একটা জয়ধ্বনি ওঠাতে হঠাৎ যেন গানের আসরে তাল কেটে গেল।

বিমলের আশানুরূপ প্রতিধ্বনিও উঠল না, কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত জনতা একেবারে চুপ ক'রে গেল।

অসাধারণ, অস্বাভাবিক অবস্থা; মাইক্রোফোনের গর্জন থেমে গিয়েছে, অথচ প্রতিধ্বনি ওঠে নি। অতগুলি লোক অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে পাথর হয়ে গিয়েছে। বিশাল সভাক্ষেত্র নিস্তব্ধ, নীরব; মনে হয়, যেন ছুঁচটি পড়লেও সবাই সে শব্দ শুনতে পাবে।

কিন্তু এ কেবল মুহূর্তের জন্য। নিয়ম এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী জনতার ভিতর থেকে প্রতিধ্বনি না উঠলেও বিমল আবার মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে তার চালিয়ে দিলে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়—

এ বার সাড়া দিলে অরুণাংশু নিজে। বেদীর উপরে এবং কাছাকাছি যারা অভিভূতের মত চুপ ক'রে গিয়েছিল, তারাও অরুণাংশুর গলার আওয়াজ শুনে সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে বললে, জয়—

নীচে অধিকাংশ লোকই তখনও বিহ্বলের মত স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল।

কাজেই ধ্বনি তেমন জমল না। তথাপি বিমল তৃতীয় বার বললে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়—

এটা জয়ধ্বনি। এর প্রাণ আছে, সংক্রামিত হবার শক্তি আছে। বিদ্যুতের প্রবাহের মতই ওই ধ্বনি ময়দানের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ওই বিহ্বল জনতাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুললে। এ বার অধিকাংশ লোকই প্রতিধ্বনি তুলে বললে, লাল ঝাণ্ডাকী জয়!

এর পর আর কোন বাধা রইল না। বিমলের দেওয়া নূতন জিগিরের নীচে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি তখনকার মত চাপা প'ড়ে গেল।

জিগির থামবার পর শুরু হ'ল বক্তৃতা। অরুণাংশু প্রথম বক্তা। সে হাসিমুখে মাইক্রোফোনের কাছে এগিয়ে গেল। পাকা বক্তা সে। দিব্য সপ্রতিভ ভাব, ঝরঝরে ভাষা, হাজার তিনেক শ্রোতাকে সে যেন মন্ত্রবলে মুগ্ধ ক'রে দিলে। ধর্মঘটের বিরুদ্ধে একটি কথাও সে বললে না; মহাত্মা গান্ধী ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের উল্লেখও সে করলে না। তবে ধর্মঘট করার জন্য মজদুরদের সে অভিনন্দন জানালে; আশ্বাস দিলে যে, সংহতি যদি তাদের ব্যাহত না হয়, সংঘ আর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা যদি তাদের অবিচলিত থাকে, তা হ'লে তাদের বর্তমান অভাব-অভিযোগের প্রতিকার তো হবেই, অদূর-ভবিষ্যতেই তাদের স্বপ্ন ও সাধনাও সার্থক হবে। সুদীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহারে সে ঘোষণা করলে যে, এই সভাতেই সকলের সম্মতি নিয়ে তাদের দাবির ফিরিস্তি তৈরি ক'রে সকলকে নিয়ে মিছিল ক'রে সে যাবে সাহেবের কাছে তাদের সেই দাবি পেশ করতে। বেশ জোর দিয়ে তার বক্তব্য সে শেষ করলে, সাহেব আমাদের দাবি যদি না মেনে নেয়, তবে আমরা কিছুতেই কাজে ফিরে যাব না, দিনের পর দিন আমাদের এই হরতাল চলতে থাকবে।

বক্তৃতার শেষে জয়ধ্বনি উঠল; লোকে হাততালিও দিলে। কিন্তু আগের মত গোটা সভাক্ষেত্রটা এবার কেঁপে উঠল না। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, সবাই এ বার জয়ধ্বনিতে যোগ দেয় নি, হাততালিও দেয় নি। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকের মুখে চোখেই কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব দেখা গেল; দু-তিন জায়গায় ফিসফাস-ফুসফাস ক'রে চাপা একটা আলোচনাও শুরু হয়ে গেল।

এই অবস্থাতেই বক্তৃতা দিতে উঠল মহম্মদ ইদ্রিস। পশ্চিমের মুসলমান

সে। এক দিন নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় সাধারণ কুলি হিসাবে এই করখানায় সে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু আজ সে অন্যতম সর্দার। এখন যেমন তার টাকা, তেমনি প্রতিপত্তি। এ অঞ্চলে যত গুণ্ডা আছে, সে তাদের অবিসংবাদিত নেতা। অনেক দিন আগে এই কারখানায় এক হরতালের সময়ে সে তার অনুচরদের নিয়ে কেবল লাঠির সাহায্যেই মৃতপ্রায় হরতালকে অনেক দিন পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছিল। সেই থেকেই মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে তার যোগ। আজ সে অরুণাংশুর ইউনিয়নের সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করছে।

অরুণাংশুর নির্দেশমত এই ইদ্রিস মিঞাই মজদুরের দাবি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিশাল তার দেহ, যেমনি দীর্ঘ—তেমনি প্রশস্ত! বিরাট গোঁফজোড়া আর ঘন কোঁকড়া চাপদাড়ি মেহেদির রঙে রাঙানো। ওরই মধ্যে ছোট ছোট চোখ দুটি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতই তীক্ষ্ণ এবং হিংস্র। শালোয়ার, পাঞ্জাবি আর প্রকাণ্ড পাগড়ি পরা তার পাহাড়ের মত বিরাট দেহটির ভারে মঞ্চের টেবিলটি যেন কেঁপে উঠল।

ইদ্রিসের হাতে প্রস্তাবের খসড়া। অরুণাংশুই দাবির ফিরিস্তি তৈরি ক'রে তার হাতে দিয়েছে। মাগ্‌গী ভাতা থেকে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি পর্যন্ত সব ওতে আছে। থেমে থেমে, প্রায় বানান ক'রে ক'রে ইদ্রিস প্রস্তাবটা সকলকে প'ড়ে শোনালে। তার পর শুরু হ'ল তার বক্তৃতা। সে বক্তৃতা কংগ্রেসের প্রতি এক তীব্র আক্রমণ। আগস্ট বিদ্রোহের ব্যাখ্যা সে করলে পঞ্চম বাহিনীর অপকীর্তি হিসাবে। তার পর গলাটা আরও কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়িয়ে সে বললে, আমরা মজদুর, আমাদের স্বার্থ আলাদা, জমায়েৎও আলাদা; অন্য কোন জমায়েতের তাঁবেদার আমরা নই; আমরা গরিব, আমরা বুভুক্ষু; আমরা আর কিছু চাই নে, শুধু পেট পুরে খেতে চাই; শুধু—

মিথ্যা কথা।

মাইক্রোফোনের গম্ভীর নির্ঘোষকেও যেন ডুবিয়ে জনতার ভিতর থেকে এক জন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

সে শ্যামাচরণ।

সবাই চমকে উঠল, মাইক্রোফোনের গলাটা হঠাৎ কে যেন টিপে ধরলে;

মুখের কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই ইদ্রিস মিঞা থতমত খেয়ে থেমে গেল। প্রায় হাজারজোড়া চোখের চকিত দৃষ্টি বিদ্যুতের বেগে শ্যামাচরণের মুখের উপরে গিয়েই একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

শ্যামাচরণ তখন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আত্মগোপন করবার জন্য সে আর মোটেই কোন চেষ্টা করলে না। মাথার চাদরখানা খুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে ইদ্রিসের কথার প্রতিবাদ ক'রে সে বললে, আমরা মজদুর, কিন্তু হিন্দুস্থানের মজদুর; আমরা গরিব, কিন্তু আমরা উদরসর্বস্ব জানোয়ার নই; আমরা পেট পুরে খেতে চাই, কিন্তু মনুষ্যত্বের মুল্যে অন্ন ক্রয় করি নে; আমরা বেঁচে থাকতে চাই, কিন্তু আদর্শের জন্য আমরা প্রাণ দিতেও পারি। মজদুর হ'লেও সকলের আগে আমরা হিন্দুস্থানের মানুষ। বল ভাই, বন্দে মাতরম্—

ময়দানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আবার যেন বিদ্যুতের একটা প্রবাহ ব'য়ে গেল; জনতা একসঙ্গে প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, বন্দে মাতরম্।

দুই হাতে ভিড় ঠেলে, কখনও ছুটে, কখনও লাফিয়ে, কত জনকে পায়ের নীচে চাপা দিয়ে শ্যামাচরণ পাগলের মত ছুটে চলল বেদীর দিকে; মুখে সে বলতে লাগল, আমরা হরতাল করেছি স্বরাজের জন্য, স্বরাজ না হ'লে কিছুতেই কাজে যাব না আমরা।

চক্ষের পলকে সভাক্ষেত্রে একটা যেন বিপর্যয় ঘ'টে গেল।

বেদীর উপরের সব কজন লোক হৈ-হৈ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে। নীচেও অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে,—কেউ শ্যামাচরণের ঠেলা খেয়ে, কেউ বা আবার ভিতরের ঠেলায়। জিগিরের সঙ্গে জিগিরের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। কেউ বলছে, বন্দে মাতরম্; কেউ বলছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ; কোলাহলে কান পাতা যায় না। সভা তো নয়, যেন বিশৃঙ্খল একটা মেলা। এরই মধ্যে দু-এক জায়গায় হাতাহাতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

পলকের জন্য শ্যামাচরণকে এক বার মঞ্চের উপর দেখা গেল. তার গায়ের জামা ছিঁড়ে গিয়েছে, চুলগুলি উঠেছে খাড়া হয়ে, চোখের তারা দুটি যেন চোখ থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসছে। মাইক্রোফোনের ধাতুদণ্ডটাকে দুই হাতে

শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ইদ্রিস তখনও মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে শ্যামাচরণ সুদর্শনচক্রটির কাছে মুখ নিয়ে বললে, ভাই-সব, এরা মজদুরের দুশমন, মালিক আর সরকারের দালাল; মজদুরদের কেবল জিগির দিয়ে ভুলিয়ে তাদের দিয়ে এরা—

মুখের কথা তার শেষ হ'ল না, পিছন থেকে কে এক জন হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলে; ইদ্রিস মিঞা নিজে উঠে বাঘের মত তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে এল আরও কয়েক জন; কিছুক্ষণ মঞ্চের উপর হুটোহুটি, লুটোপুটি চলল; তার পর শ্যামাচরণকে আর দেখাই গেল না।

এতগুলি ঘটনা, কিন্তু ঘটতে পুরা একটি মিনিটও লাগল না। শ্যামাচরণ উল্কার মত ছুটে মঞ্চের উপর গিয়ে উঠেছিল, হাজার হাজার দর্শকের বিহ্বল চোখে ধাঁধা লাগিয়ে উল্কার মতই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পর আবার সেই ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি, হাতাহাতি; জিগিরের সঙ্গে জিগিরের আবার সেই সংঘর্ষ। ইদ্রিস মাইক্রোফোনের পিছনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল, কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিলে না। ইদ্রিসকে সরিয়ে তখন তার জায়গায় এসে দাঁড়াল বিমল; কিন্তু তার চেনা গলার 'ভাই-সব' ডাকের প্রতিক্রিয়ায় অর্ধেক জনতা 'দূর দূর' 'সেম্ সেম্' 'হট যাও' ব'লে গর্জন ক'রে উঠল। সভার মাঝখান থেকে উঠে শক্ত, কালো কি একটা জিনিস শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে মঞ্চের উপর বিমলের পায়ের কাছে এসে পড়ল,—সেটা এক পাটি জুতো।

গোলমালে অরুণাংশু নিজেও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, এইবার গা ঝাড়া দিয়ে ওই জড় ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে নিজে সে মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিমলকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে সে; তার পর যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বললে, ভাই সব, আমার দুটি কথা শোন। আমি তোমাদের সভাপতি, —আমার কথা শুনবে না তোমরা?

ক্ষুব্ধ জনত অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল—অরুণাংশুকে তারা চিনতে পেরেছে। অন্যান্য সকলের মত মজদুরদের ঘরের মানুষ সে নয়, তাদের কাছে চিরদিনই সে সুদূরের বিস্ময়। তার রূপ, তার বেশ, তার গলার

আওয়াজ, সবই অসাধারণ। তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জনতা হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে পড়ল।

পিছনে বেদীর উপর থেকে কে এক জন জিগিরই দিয়ে উঠল, অরুণাংশু-বাবুকী জয়—

অনেকেই প্রতিধ্বনি তুললে। যারা সাড়া দিলে না, তারা গেল চুপ ক'রে; প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জিগির এ বার আর উঠল না।

দেখে অরুণাংশুর উদ্বিগ্ন মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক বার চারদিকে চেয়ে দেখলে সে; হেসে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নামিয়ে সে সম্বর্ধনার উত্তর দিলে; তার পর মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে বললে, ভাই-সব, সময় ব'য়ে যাচ্ছে; সকলে মিছিল ক'রে এখনই আমাদের সাহেবের কাছে যেতে হবে, তার পর আরও অনেক কাজ। আজ এমন মিছিল আমাদের হবে, যেমন আগে এখানে কখনও হয় নি। কিন্তু তার আগে প্রস্তাব পাস হওয়া চাই।

প্রস্তাব প'ড়ে শোনালে না সে; হাতের কাগজখানা উড়িয়ে উড়িয়ে সকলকে দেখিয়ে সে আবার বললে, ভাই-সব, এই আমাদের দাবির ফিরিস্তি। আমরা মাগ্‌গী ভাতা চাই। কেউ এখানে আছে, যে তা চায় না? না, কেউ নেই। আমরা আরও সস্তা দামে চাল চাই, আটা চাই, কাপড় চাই। কেউ এখানে আছে, যে তা চায় না? না, কেউ নেই। আমরা—

অরুণাংশুর গলার আওয়াজ ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগল। জনতা শান্ত হয়ে শুনলে; অনেকেই মাথা নেড়ে, কেউ কেউ মুখের কথায়ও সায় দিতে আরম্ভ করলে। দেখে অরুণাংশুর চোখ-মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটু থেমে এক বার দম নিয়ে সে দূরের কারখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে আবার বললে, ওই যে কারখানা দেখা যাচ্ছে, ভাই-সব, ও কারখানা কার? ম্যানেজার হান্‌টার সাহেবের নয়, জেম্‌সন টম্‌সন কোম্পানিরও নয়; ও কারখানা আমাদের। আমরা হাত সরিয়ে নিলেই ও কারখানা বন্ধ ক'রে দিতে পারি, আমরা ইচ্ছে করলেই ও কারখানা আবার চালাতেও পারি। দুদিন কারখানা যে বন্ধ রয়েছে, সে কার ইচ্ছায়—সাহেবের?

কক্ষনো নয়।—কাছেই কে এক জন উত্তর দিলে, কারখানা বন্ধ করেছি আমরা ; আমরা কাজে যাই নি ব'লেই তো—

অত বড় কারখানাটা বন্ধ হয়ে রয়েছে, অরুণাংশু নিজেই সায় দিয়ে কথাটাকে শেষ ক'রে দিয়ে।

তার পর মুখের ভাবে অনেকখানি গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে আবার বললে, কিন্তু কারখানা বন্ধ আমরা রাখতে চাই নে। ওই কারখানায় নিজের হাতে জাপানের মারণাস্ত্র তৈরি করছি আমরা। সে অস্ত্র জাপানকেই কেবল মারবে না, সেই সঙ্গে পুঁজিবাদকেও ধ্বংস ক'রে জগতের সর্বত্র মজদুর-রাজের প্রতিষ্ঠা করবে। কাজেই ওই কারখানায় আমাদের যে কাজ, তা আজকের দিনে আমাদের ধর্ম ব'লেই মনে করি আমরা। তথাপি হরতাল যে আমরা করেছি, সে কেবল পেটের দায়ে, মানে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে কর্মদক্ষতা যাতে আমাদের বাড়ে, ঠিক সেই জন্য।

কিন্তু হঠাৎ তাল কেটে গেল। সুবোধের দলের কয়েক জন লোক আগের গোলমালের সময় মঞ্চের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ; তাঁদেরই এক জন বাধা দিয়ে বিহ্বলের মত ব'লে উঠল, কিন্তু গান্ধীজী যে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন !

অরুণাংশু থতমত খেয়ে থেমে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। এক বার ঢোক গিলেই সে আবার বললে, ঠিকই তো, সে তো ভয়ঙ্কর অবিচার। তার প্রতিবাদ করি আমরা, গান্ধীজীর মুক্তি আমরা চাই।

আমরা স্বরাজও চাই।—আর এক জন আবার হঠাৎ ব'লে উঠল।

অরুণাংশুও প্রতিধ্বনির মতই তৎক্ষণাৎ বললে, তা-ও চাই আমরা, তাই তো আমাদের সব চেয়ে বড় দাবি। আমাদের দাবির ফিরিস্তির সকলের উপরে আমি লিখেছি আমাদের জাতীয় সরকারের দাবি। আমাদের এই দাবি আজই আমরা 'তার' করে লাটসাহেবের কাছে, বড়লাটের কাছে, বিলাতে ভারতসচিবের কাছে পাঠিয়ে দেব। যত দিন এ দাবি আমাদের না মেটে, তত দিন শান্ত হব না আমরা।

অরুণাংশু থামল। ওটা নাটকীয় সাময়িক বিরাম। তার পরেই গলার

স্বর আরও এক পর্দা উপরে চড়িয়ে সে আবার বললে, আমরা চাই জাতীয় সরকার, আমরা চাই স্বরাজ। কেউ এখানে আছে, যে তা চায় না?

পদ্মার বুকে সহসা যেন জোয়ার এসে গেল। অনেকগুলি কণ্ঠ এক সঙ্গে গর্জন ক'রে উঠল, কেউ নেই, কেউ নেই; আমরা সবাই স্বরাজ চাই, তাই তো আমাদের আসল দাবি। বল ভাই, স্বতন্ত্র ভারতকী জয়—

অরুণাংশু বাধা দিলে না, প্রতিবাদ করলে না; বরং নিজেও সে আর দশ জনের সঙ্গে ওই জয়ধ্বনিই তুললে। কিন্তু ধ্বনি যখন নীরব হ'ল, সভা হ'ল শান্ত, তখন আবার সে মাইক্রোফোনের কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, ভাই-সব, সেই স্বরাজ যাতে সত্যিকারের স্বরাজ হয়, জনকয়েক বড়লোকের জমিদারি না হয়ে মজদুরের রাজ হয়, সেই জন্যই এ যুদ্ধে জাপানকে আমরা রুখতে চাই। নিজেদের যত অভাব-অভিযোগই আমাদের থাকুক না কেন, এমন কিছু যেন আমরা না করি, যাতে জাপানের কোন রকম সহায়তা হয়।

ইংরেজেরও নয়।—কে এক জন নিকটেই হঠাৎ ব'লে উঠল, ইংরেজের সহায়তাও আমরা করব না।

অরুণাংশু থতমত খেয়ে থেমে গেল; কিন্তু পরের মুহূর্তেই দিব্য সপ্রতিভ ভাবেই সে বললে, না, ইংরেজকেও আমরা সাহায্য করব না; সাহায্য করব তাদের, যারা হিন্দুস্থানকে রক্ষা করবার জন্য জাপানের সঙ্গে লড়াই করছে। সেই জন্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা কারখানায় আমাদের কাজে ফিরে যেতে চাই।

না।—আবার কে এক জন প্রতিবাদ ক'রে বললে, আমরা কাজে যেতে চাই নে। আমরা হরতাল করেছি স্বরাজের জন্য, আমরা গান্ধীজী-জওহরলালজীর মুক্তি চাই।

আমিও চাই।—অরুণাংশুও তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললে, সব নেতাদের মুক্তি চাই আমরা। তাই তো আমাদের দাবি, আর সেই জিগিরই তো আমাদের সকল জিগিরের সেরা জিগির। বল ভাই, দেশনেতাদের মুক্তি চাই—

কথাটা সকলেরই মনের কথা, তিন হাজার শ্রোতাই সমস্বরে জিগির দিয়ে উঠল, দেশনেতাদের মুক্তি চাই।

অরুণাংশুর কপাল আর গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল, পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চট ক'রে মুখটা এক বার মুছে নিলে সে; এক বার চারদিকে তাকিয়ে দেখলে; তার পর আবার মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, কিন্তু, ভাই-সব, খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাদের। দেশের নেতাদের নামে, স্বরাজের নামে জাপানের অনেক গুপ্তচর আমাদের বিপথে ভুলিয়ে নিতে চাচ্ছে, চাচ্ছে আমাদের মজদুরদের দিয়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াতে। পঞ্চমবাহিনীর সেই ষড়যন্ত্র আমাদের বিফল করতে হবে—

ব'লে নাটকীয় ধরনে অরুণাংশু থেমে গেল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যা হ'ল তা তার আশানুরূপ নয় কেউ প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু কেউ সায়ও দিলে না। বরং কল্লোলমুখর মহাসমুদ্রের মত অত বড় সভাস্থলটা হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আবার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলে অরুণাংশু; তার পর হাতের কাগজখানা সকলকে দেখিয়ে গলার স্বর উঁচু ক'রে সে আবার বললে, ভাই-সব, এই আমাদের দাবি; এর মর্ম সবাই তোমরা শুনেছ; এখন বল তো, এ সব তোমাদের মঞ্জুর ?

অল্প কয়েক জন লোক উত্তরে বললে, মঞ্জুর।

গলার স্বর আরও এক পর্দা উঁচুতে চড়িয়ে অরুণাংশু তখন বললে, তবে চল, ভাই, আমাদের এই দাবি পেশ করবার জন্য এক্ষুনি আমরা মিছিল ক'রে যাব কারখানার ম্যানেজারের কাছে। সাহেব যদি আমাদের দাবি মেনে না নেয়, মাগ্‌গী ভাতা যদি বাড়িয়ে না দেয়, তবে কিছুতেই আমরা কাজে ফিরে যাব না। কেমন, এ প্রস্তাবও সকলের মঞ্জুর ?

মন্ত্রমুগ্ধের মত অনেকেই উত্তর দিলে, মঞ্জুর।

তবে চল, ভাই-সব।—হাতের কাগজখানি আকাশে উড়িয়ে অরুণাংশু বললে, এগিয়ে চল। তোমরা সবাই যদি আমার পিছনে থাক, তবে এর প্রত্যেকটি দাবিই আমি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নিতে পারব।

বেদীর উপর বিমল এবং আরও কয়েক জন লোক লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে

উঠে দাঁড়াল ; কে এক জন একটা ঝাণ্ডা অরুণাংশুর হাতের মধ্যেও গুঁজে দিলে। সেই ঝাণ্ডা উড়িয়ে অরুণাংশু বললে, চল, ভাই, চল।

সঙ্গে সঙ্গেই জনতার মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দিল ; বিমলের ইঙ্গিতে 'চল' 'চল' ধ্বনি করতে করতে দু-তিন জন লোক বেদীর উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। রোল উঠল, 'চল', 'চল'। এক জন দিলে জিগির, ইন্‌কালাব জিন্দাবাদ—

কিন্তু চলার মুখেই বাধা পড়ল। সুবোধেরই এক জন অনুচর, তার ইউনিয়নের অন্যতম ত্যাগী ও কর্মনিষ্ঠ যুবক কর্মী সোহন সিং হঠাৎ মঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠে মাইক্রোফোনের ভিতর দিয়ে জনতাকে সম্বোধন ক'রে বললে, ভাই সব, এরা তোমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সব ইংরেজের দালাল এরা। স্বরাজের জন্য আমরা যে হরতাল করেছি, তাই এরা ভেঙে দেবার চেষ্টা করছে। শ্যামাচরণ ভাইকে গুম করেছে এরা। এদের কথা কিছুতেই শুনো না তোমরা। সুবোধবাবুর কথামত হরতাল করেছি আমরা, তার হুকুম না পেলে কিছুতেই আমরা কাজে ফিরে যাব না।

নীচের জনতার ভিতর থেকে জনকয়েক লোক সমস্বরে সায় দিয়ে বললে, ঠিক ঠিক ; সুবোধবাবুর হুকুম চাই আমরা। সুবোধবাবু কোথায় ?

উপরে আহত ভুজঙ্গের মত গর্জন ক'রে অরুণাংশু বললে, সুবোধবাবু ! কোথায় তোমাদের সুবোধবাবু ? সে তো পালিয়েছে, তোমাদের সকলকে কারখানা থেকে পথে বের ক'রে এনেই নিজে সে গা-ঢাকা দিয়ে স'রে পড়েছে। আর তাকে পাবে কোথায় তোমরা ?

একটু থেমে, মাইক্রোফোনের দণ্ডটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সে আবার বললে, আজকের দিনে হরতাল ক'রে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকলে কি ফল হবে, তা ভেবে দেখেছ তোমরা ? স্বরাজের সকল সম্ভাবনা ফ্যাসিস্ত-দস্যুদের বুটের নীচে গুঁড়ো হয়ে যাবে আর ঘরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র নিয়ে তোমরা সব মরবে অনাহারে। তাই চাও তোমরা, স্ত্রীপুত্রকে শুকিয়ে মারতে চাও ?

এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপে আবার তুমুল একটা কোলাহল উঠল। কেউ বললে, না, না ; কেউ বললে, চল চল ; কেউ বললে, এরা দুশমন, আমরা কিছুতেই যাব না। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি আর চেঁচামেচির সঙ্গে নানা রকম

প্রতিদ্বন্দ্বী জিগির উঠতে লাগল। সভার দু-এক জায়গায় এক-একটা খণ্ডযুদ্ধও শুরু হয়ে গেল।

দেখে অরুণাংশুর মত লোকও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকবার পর সে হঠাৎ বিমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, আর এক মিনিটও দেরি করা নয়, বিমল। সবাই আমাদের সঙ্গে হয়তো যাবে না; কিন্তু যারা যাবে, দেরি করলে তাদেরও হয়তো আর পাব না আমরা।

হাতের ঝাণ্ডাটা আস্ফালন করতে করতে জনতার দিকে চেয়ে সে আবার বললে, এগিয়ে চল, ভাই, সবাইকে যেতে হবে সাহেবের বাংলোয়। আমাদের দাবি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় না ক'রে সেখান থেকে কেউ আমরা ঘরে ফিরব না। চল, ভাই, এগিয়ে চল।

হাতের ঝাণ্ডা উঁচু ক'রে বিমলও বললে, চল ভাই, চল; সব চল সাহেবের বাংলোয়। বলতে বলতে নিজেই সে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

মাইক্রোফোনের নিকট থেকে একটু দূরে স'রে গিয়ে অরুণাংশু আর এক জনের কানে কানে বললে, মাইক্রোফোন কেটে দিতে বল, সব ভেঙে দাও। এমন ক'রে নষ্ট কর, যাতে আর কেউ এখানে সভা করতে না পারে।

সভা ততক্ষণে একেবারেই ভেঙে গিয়েছে। একটু পরেই বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত জনতা চারদিকে ছিটকে পড়ল। চলা বা বলা কোনটাতেই শৃঙ্খলা একেবারেই রইল না। অনেক লোক বিমলের অনুসরণ ক'রে কারখানার দিকে চলতে আরম্ভ করলে। অরুণাংশু নিজে ওই মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়েই দু হাতে দুটি পতাকা আস্ফালন করতে করতে সেই এক কথা বার বার ব'লে যেতে লাগল, এগিয়ে চল ভাই, এগিয়ে চল—

মাইক্রোফোন নেই, বক্তৃতামঞ্চ ভেঙে পড়েছে। তক্তপোশের বেদী নির্লজ্জ নগ্নতায় কুৎসিত। উপরের শতরঞ্চিখানি স্তূপীকৃত অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে আছে। পতাকাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন। দগ্ধ বনানীর পত্রহীন বৃক্ষকাণ্ডের মত নিরলঙ্কার খুঁটিগুলি হেলে পড়েছে। প্রাচীরপত্রগুলির অধিকাংশই আর নেই। যে দু-একটি আছে, তারা থামের গায়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে; ধ্বজের

ভাঙা হাতের মত। হালকা লাল কাপড়ের ছোট সামিয়ানা কোথায় যে উড়ে গিয়েছে, তার ঠিক নেই। বিচিত্র সভামণ্ডপের এই শবদেহটিকে ঘিরে রয়েছে বিশৃঙ্খল ছোট একটি জনতা। আকাশ আর বাতাসকে একান্তভাবে অধিকার ক'রে নেবার জন্যই যেন মাটির ধূলি আর মানুষের গলার অর্থহীন কোলাহলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।

বিমল ও অরুণাংশু তাদের মিছিল নিয়ে চ'লে যাবার পরেও সভার এই ভগ্নাবশেষ ময়দানেই থেকে গেল।

আর থাকল দূরে অশ্বারোহী আর পদাতিক পুলিস-বাহিনীর বেশ মোটা একটা অংশ।

বিহ্বল বিশৃঙ্খল জনতার কোলাহল ক্রমেই বেড়ে চলছিল। কিন্তু ওরই মধ্যে সোহন সিং জনতাকে সম্বোধন ক'রে আবার বললে, ওরা সব কোম্পানির দালাল আর ইংরেজের তাবেদার। আমাদের হরতাল ওরা ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু তা কিছুতেই হবে না। গান্ধীজী-জওহরলালজী মুক্তি না পেলে, দেশে স্বরাজ না হ'লে কিছুতেই কাজে যাব না আমরা। ভাই-সব, ব'সে পড় যার যার জায়গায়। আমরা আবার সভা করব।

আর এক জন কে বললে, সুবোধবাবু কোথায়? তাঁকে খবর দাও।

আরও একজন বললে, শ্যামাচরণদা কোথায় গেল? সে তো এখানেই ছিল!

হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, চেঁচামেচি চলল একটানা,—শ্যামাচরণদা, সুবোধ-বাবু, বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধীকী জয়,—এ কি, এখানে প'ড়ে রয়েছে কে? ফিট হয়েছে ভাই, ফিট; জল আন, জল,—এই তো শ্যামাচরণদা, এই দিকে, এই দিকে—

অনেকগুলি লোক একসঙ্গে বেদীর দক্ষিণ দিকে ছুটে গেল; কয়েক জন নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ল; কয়েক জন হাত তুলে, ঘুষি বাগিয়ে ঘনায়মান জনতাকে দূরে ঠেলে দিতে লাগল; রব উঠল, জল, জল,—হাওয়া ছাড়,— স'রে যাও—

জনকয়েক লোক ধরাধরি ক'রে একটি লোককে তক্তপোশের উপর তুলে আনলে।

সে এক অসাধারণ দৃশ্য,—যেমনি করুণ তেমনি বীভৎস!

লোক তো নয়, যেন কাপড়ের একটি পুটুলি। তারই পরনের কাপড় দিয়ে তার হাত দুটি পিছমোড়া ক'রে আর পা-দুটিকে ঘাড়ের সঙ্গে একত্র ক'রে এঁটে বাঁধা হয়েছে। তার মুখও বন্ধ,—কেবল বাইরে থেকেই নয়, মুখের ভিতরেও অনেকখানি কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। তার মাথায় কোন একটা জায়গা যেন কেটে গিয়েছে। কপালে, গালে লাল রক্ত জ'মে কালো হয়ে উঠেছে। তবু অজ্ঞান হয় নি লোকটি, হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়বার জন্য তখনও অনবরত চেষ্টা করছে সে।

দু-তিন জন লোক তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। এক জন ব'লে উঠল, এই তো শ্যামাচরণদা!

সত্যই সে শ্যামাচরণ। হাত-পায়ের বাঁধন অল্প একটু আলগা হতেই সে বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়াল; পাগলের মত দুই হাত আকাশে তুলে সে চীৎকার ক'রে বললে, ওরা দুশমন, সব ইংরেজের দালাল। আমাদের হরতাল ওরা ভেঙে দিচ্ছে। কিন্তু তা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। হরতাল চালাব আমরা, যত দিন স্বরাজ না হয়।

এক জন ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, এ কেমন ক'রে হ'ল, শ্যামাচরণদা, এ দশা তোমার কে করলে?

শ্যামাচরণ প্রশ্নের উত্তর দিলে না, কাছের লোক কটিকে দূরে ঠেলে দিয়ে সে লাফিয়ে মঞ্চের উপরে গিয়ে উঠল; হাত তুলে বললে, বল, ভাই—মহাত্মা গান্ধীকী জয়—

কাছে যারা ছিল, তারা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে। গোলমালে যারা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তারা সজাগ হয়ে বেদীর দিকে ছুটে এল। যারা কিছুই বুঝতে না পেরে বস্তিতে ফিরবার উপক্রম করেছিল, তারাও জিগির শুনে থমকে দাঁড়াল।

জিগির থামতে না থামতেই শ্যামাচরণ অসহিষ্ণুর মত বললে, জিগির নয়, কেবলই জিগির আর নয়। আজ চাই কাজ। হরতাল চালাতে হবে আমাদের। কেবল আমাদের কারখানায় হরতাল চালানো নয়, কাছাকাছি আর সব কারখানায় হরতাল করাতে হবে। কারখানা, আদালত, পুলিস, ফৌজ, সব

জায়গায় হরতাল করিয়ে এই বিজাতীয় সরকারকে আমাদের অচল ক'রে দিতে হবে। যত দিন—

চোপরাও।

শ্যামাচরণের কথাটা শেষ হবার আগেই একটা কর্কশ, বিজাতীয় কণ্ঠ হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

তার পরেই একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

এতক্ষণ যে সব অশ্বারোহী আর পদাতিক সশস্ত্র পুলিস বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা সকলেই এক সঙ্গে ছুটে এসে তিন দিক থেকে জনতাকে ঘিরে ফেললে। অনেকগুলি কন্‌স্টেব্‌ল আর জন কয়েক দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিসসাহেব নিজে পিছনের জনতাকে ছত্রভঙ্গ ক'রে গট্‌গট্‌ ক'রে বেদীর উপরে উঠে এল। শ্যামাচরণ চমকে পিছনে ফিরে তাকাল; কিন্তু সে বা আর কেউ অবস্থাটা ঠিক ঠিক বুঝবার আগেই সাহেব হান্‌টার তুলে শ্যামাচরণকে দেখিয়ে বললে, গ্রেপ্তার কর।

হুকুম সঙ্গে সঙ্গেই তামিল হয়ে গেল। কেবল শ্যামাচরণই নয়, বেদীর উপর আর যারা ছিল, তাদেরও অধিকাংশকেই ধ'রে কন্‌স্টেব্‌লরা মারতে মারতে একটা গাড়ির ভিতরে পুরে দিলে।

সাদা-পোশাকপরা এক জন লোকের মুখের দিকে চেয়ে সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলে, গ্রাট্ট কেলো, ব্যানার্জি,—এদের মধ্যে আছে ?

লোকটি সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে উত্তর দিলে; না, স্যার।

তাকেও আমি চাই, আজকের মধ্যেই তাকেও গ্রেপ্তার করা চাই।

তার পর জনতার দিকে চেয়ে হাতের হান্‌টারটি আস্ফালন করতে করতে সাহেব আবার বললে, এ জনতা অবৈধ। এক্ষুনি স'রে যাও সবাই, নইলে জোর ক'রে এ সভা ভেঙে দেওয়া হবে।

কিন্তু ততক্ষণে জনতার বিহ্বল ভাবটা কেটে গিয়েছে। হুকুম তামিল ক'রে স'রে যাওয়া দূরে থাক্, প্রবল একটা জলোচ্ছ্বাসের মত অধিকাংশ লোকই বেদীর দিকে ছুটে এল। এক জন জিগির তুললে, মহাত্মা গান্ধীকী জয়—

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনিও গর্জন ক'রে উঠল, মহাত্মা গান্ধীকী জয়!

সাহেব তখন বললে, সভা ভেঙে দাও।

তার পর বাজল বাঁশী।

তার পর?

অনেকগুলি ঘোড়া এক সঙ্গে চিহিঁ চিঁ ক'রে ডেকে উঠল। খুর বাজতে লাগল খট্‌খট্—খট্‌খট্! ইস্পাতের সঙ্গীনে সূর্যের আলোক ঝিলিক দিয়ে ফুটে ফুটে উঠতে লাগল।—লাঠি চলল, বন্দুকও বার কয়েক গর্জন ক'রে উঠল, গুড়ুম, গুড়ুম, গুম!

মিনিট পনরো পর ময়দান একেবারে খালি হয়ে গেল। রইল কেবল পুলিসসাহেব আর তার লোকজন। আর রইল হাত পা বা মাথাভাঙা জনকয়েক নিরস্ত্র মজদুর। তাদের কেউ কেউ মাটিতে প'ড়ে কাতরাচ্ছে।

তাদের কাতর প্রার্থনায় কানও দিলে না কেউ। সাহেব আবার হুকুম দিলে, সুবোধ ব্যানার্জিকে আমি চাই, আর চাই তার ইউনিয়নের সব কটি পাণ্ডাকে। যেমন ক'রে হোক, তাদের গেপ্তার ক'রে নিয়ে এস।

হুকুম তামিল করবার জন্য তখনই পুলিসের লোকেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বস্তির দিকে চ'লে গেল। এক দল সোজা গিয়ে উপস্থিত হ'ল শ্যামাচরণের বাসায়।

তখন বেলা প'ড়ে এসেছে।

সাধারণত এ সময়ে সারদা বাসায় থাকে না। দুপুরে নাকে-মুখে দুটি শাকভাত গুঁজেই সে তার মুনিব-বাড়িতে কাজ করতে যায়; ফিরে আসে সন্ধ্যার অনেক পরে। কিন্তু আজ সে ঘরের দাওয়ায় চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তার মুখ।

অন্যান্য দিনের মতই সে দিনও কাজে গিয়েছিল সে। কিন্তু মনটা তার ভাল ছিল না। সকালেই সভার খবর সে পেয়েছিল। কাজে যাবার পথে নিজের চোখেই সে দেখেও গিয়েছিল ময়দানে পুলিসের আড়ম্বর। ময়দান থেকে তার মুনিব-বাড়ির দূরত্ব খুব বেশি নয়। সেখানে ব'সেও মাঝে মাঝেই ঝড়ের এক-একটা ঝাপটার মত কোলাহল শুনতে পাচ্ছিল সে। চেষ্টা ক'রেও কাজে সে মন দিতে পারে নি।

তার পর সে পেয়েছিল খবর, ময়দানে মারপিট শুরু হয়েছে। শুনে সে আর কাজ করতে পারে নি, ছুটি নিয়ে বাসায় ফিরে গিয়েছিল।

তার পর সে খবরের সেরা খবর শুনেছিল তার প্রতিবেশী অনন্ত মিস্ত্রীর মুখ থেকে। মিস্ত্রী শ্যামাচরণের সাহসের কথা, তার উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা, তার গ্রেপ্তারের কথা, তার কপালের সেই ক্ষতটার কথা,—সব সারদাকে খুলে বলেছিল,—একটু অতিরঞ্জিত ক'রেই বলেছিল। উত্তরে সারদা একটি কথাও বলে নি। কাছে ব'সে তারা তাকে আবোল-তাবোল কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল, তারও কোন উত্তর দেয় নি সে। শুধু মাঝখানে এক বার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাকে কোলের উপর টেনে এনেই আবার যেন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কাহিনী শেষ ক'রে অনন্ত মিস্ত্রী কখন যে উঠে গিয়েছিল, বোধ করি সারদা তা জানতেও পারে নি।

পুলিসের জুতার গটগট মসমস শব্দ শুনে হঠাৎ সে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

যারা এল, তারা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। কন্‌স্টেব্‌লদের হাতে বড় বড় লাঠি; দারোগার হাতে হান্‌টার, কোমরে রিভল্‌ভার।

ওই দারোগাই সারদার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধ ব্যানার্জি এখানে আছে?

সারদার চোখের ঘোর তখনও কাটে নি; সে মাথাটা নেড়ে অস্ফুট স্বরে বললে, কই, না তো!

আলবৎ এখানেই লুকিয়ে আছে সে।—দারোগা এ বার হুঙ্কার দিয়ে বললে, বল্‌ শীগগির, নইলে—

বাকি কথা-কটি তারার আর্তকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনির নীচে চাপা প'ড়ে গেল।

পুলিস দেখেই তারা ভয় পেয়েছিল; দারোগার ধমক শুনে সে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

কিন্তু মেয়ের ওই কান্নার শব্দ কানে যেতেই সারদার আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারেই কেটে গেল। বাঘিনীর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; গর্জন ক'রে বললে, নইলে কি করবে তুমি?—দারোগার প্রায় মুখের কাছে দু হাত নেড়ে সে আমার বললে, আর কি করবে, শুনি? আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছ তোমরা, মারপিট ক'রে হয়তো মেরেই ফেলেছ। আর আমার কি সর্বনাশ করবে? আর কি ক্ষমতা আছে তোমাদের?

ও বাব্বাঃ!—ব'লে দারোগা দু-পা পিছনে স'রে গেল। সারদার ভাব দেখে বোধ করি ভয়ই পেলে সে।

কিন্তু সারদা থামলে না; গলাটা আরও একটু চড়িয়ে সে আবার বললে, ভাল মানুষের উপর জুলুম করতে লজ্জা করে না তোমাদের? কেন, কাজ ছেড়ে কি দোষ করেছে এরা? সভা করাটা কোন পাপের কাজ হয়েছে?

দারোগার মুখে কথা ফুটল না, কিন্তু তার পিছন থেকে এক জন কন্‌স্টেব্‌ল ধমক দিয়ে ব'লে উঠল, চোপরাও, ভারি দজ্জাল মাগী তো! গুঁতো খেতে সাধ হয়েছে বুঝি?

বলতে বলতে লোকটি সারদার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আর এক জন কন্‌স্টেব্‌ল তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে বললে, এই, খবরদার, স্ত্রী-লোকের গায়ে হাত তুললে তোমার ও হাত আমিই ভেঙে দেব।

তার পর সারদার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে সে সম্ভ্রমের স্বরে বললে, মা, আমরা হুকুমের চাকর; আপনার বাড়িতে খানাতল্লাশি করবার জন্য আমাদের উপর হুকুম হয়েছে। সে হুকুম তো আমাদের তামিল করতেই হবে।

সারদা কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত লোকটির মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, বেশ তো, খানাতল্লাশি কর তোমরা। কিন্তু আমি সত্য কথাই বলেছি, সুবোধবাবু কেন, কোন লোকই আমার ঘরে লুকিয়ে নেই।

দুই হাতে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধ'রে তারা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; দ্বিতীয় কন্‌স্টেব্‌লটি আঙুল দিয়ে তাকেই নির্দেশ ক'রে বললে, আপনার মেয়ে কাঁদছে; ওকে কোলে নিন, মা। বলুন যে, ওর কোন ভয় নেই।

সারদা চমকে উঠল, কিন্তু কোন কথা সে বললে না। আর এক বার কন্‌স্টেব্‌লটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেই তারাকে টেনে কাঁধে তুলে নিয়ে সে অনেকটা দূরে স'রে গেল।

এত বড় একটা দক্ষযজ্ঞের কোন খবরই সুবোধের জানা ছিল না।

আগের দিনই সে কলকাতায় গিয়েছিল। উদ্দেশ্য নেতা আর সহকর্মীদের

সঙ্গে দেখা ক'রে আলোচনা করা আর কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করা। দুপুরের আগেই তার ফিরে আসবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফিরতে রাত হয়ে গেল। স্টেশনে নেমেই সে হেঁটে চলল কারখানার দিকে।

একে কৃষ্ণপক্ষের রাত, তায় আবার নিষ্প্রদীপের জন্য পথে আলো জ্বলে নি। আকাশের এক কোণে কালো মেঘ ঘন হয়ে জ'মে উঠেছিল। বাতাস নেই, অসহ্য গুমোট। পথে লোকজন বড় একটা ছিল না। যানবাহন ও জনমুখর কলকাতার তুলনায় এই শহরতলিতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর নিস্তব্ধ, নিঝুম ভাব।

কিন্তু ওই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাকে মন্থন ক'রে হঠাৎ একটা শব্দ উঠল, ধুক ধুক ধুক!

শব্দ আগে থেকেই ছিল, সুবোধের কানে সেটা এল হঠাৎ।

সে চমকে থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ অন্যমনস্কের মত পথ চলছিল সে। চমকে মুখ তুলে তাকাতেই অন্ধকারে নিবিড়তর অন্ধকারের বিরাট একটা স্তূপের মত কারখানাটা তার চোখে পড়ল।

আওয়াজ উঠছিল ওই কারখানার ভিতর থেকে, ওই কারখানারই বিরাট হৃদ্‌যন্ত্রটার অবিরাম গতির একটানা ধুক্ ধুক্ ধুক্। ওই আওয়াজ তার কানে আসতেই সুবোধের নিজের হৃদ্‌যন্ত্রটার গতিই অকস্মাৎ যেন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

কারখানা চলছে? মজদুরেরা কাজে ফিরে গিয়েছে? এও কি সম্ভব? মজদুরদের উৎসাহ সে নিজের চোখেই দেখে গিয়েছে,—অবিসংবাদিত প্রমাণ পেয়েছে তাদের অনমনীয় সঙ্কল্পের। এই তো কয় ঘণ্টার মাত্র ব্যবধান! এরই মধ্যে সে সবই কর্পূরের মত উড়ে যাবে, অতীতকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলে মজদুরেরা কাজে ফিরে যাবে, এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য।

কিন্তু ওই—ধুক ধুক ধুক। এ আওয়াজ সে ভাল ক'রেই চেনে। কারখানা যে চলছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুবোধ বিহ্বলের মত ডান হাতের দুটি আঙুল দিয়ে কপালের দু দিকের দুটি রগ জোরে টিপে ধরলে। কিন্তু পরক্ষণেই হাত নামিয়ে ছুটে চলল সে বস্তির দিকে

চেনা পথ, তেমন দীর্ঘও নয়। তথাপি সুবোধের মনে হতে লাগল যে, পথের যেন আর শেষ নেই, ওই পথ অতিক্রম ক'রে লক্ষ্যস্থলে সে হয়তো পৌঁছতেই পারবে না।

হঠাৎ চেনা গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল সে। ততক্ষণে সে ময়দান পার হয়ে বস্তির এলাকার মধ্যে এসে গিয়েছে। পথের দু দিকেই নানা রকমের দোকান। তারই একটা দোকান থেকে করিম সেখ তাকে ডাকছে। সুবোধ থামতেই করিম তার কাছে ছুটে এল।

সে কারখানার সাধারণ একটি কুলি, সুবোধেরই ইউনিয়নের এক আনার সদস্য।

সে কাছে আসতেই সুবোধ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, করিম? কারখানা যে চলছে? লোকজন কাজে ফিরে গিয়েছে নাকি?

করিম বিস্ময়ের স্বরে বললে, কিছু জানেন না আপনি?

সুবোধ ভাষায় উত্তর দিতে পারলে না, একটা দুর্নিবার লজ্জা, অপরাধের একটা তীব্র অনুভূতি হঠাৎ যেন তার গলা টিপে ধরলে। কেবল ঘাড় নেড়েই করিমকে সে জানিয়ে দিলে যে, সে কিছুই জানে না।

চট ক'রে চারদিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে করিম সুবোধের একখানা হাত ধ'রে বললে, এখানে নয়, ব্যানার্জিবাবু,—একটা গলির মধ্যে চলুন; পুলিসের কেউ দেখলেই আপনাকে ধ'রে ফেলবে।

পাশের অন্ধকার একটা গলির মধ্যে সুবোধকে টেনে নিয়ে গিয়ে করিম সংক্ষেপে সকল কথাই তাকে খুলে বললে। এক দিকে কারখানার ম্যানেজার মজদুরের মাগ্‌গী ভাতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, আর এক দিকে ময়দানে মজদুরের সভায় হয়েছে দক্ষযজ্ঞ। কিন্তু সেখানেই কাহিনীর শেষ হয় নি। অনেক ঘরে খানাতল্লাশি হয়েছে, অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, সুবোধের ইউনিয়নকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, যে মজদুর কাজে না যাবে, তাকেই চিরদিনের মত বরখাস্ত করা হবে।

সবটা শোনবার পরে সুবোধ সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, শ্যামাচরণদার বাড়ির খবর কিছু জান?

করিম যেন শিউরে উঠে উত্তর দিলে, সেখানেও খানাতাল্লাশি হয়েছে, আর সব চেয়ে বেশিই হয়েছে।

সুবোধের বিবর্ণ মুখ আরও বেশি বিবর্ণ হয়ে গেল; সে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু বউদি? তাদের মেয়ে তারা? তাদের কোন খবর জান তুমি?

করিম এ বার মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, তা জানি নে, ব্যানার্জি-বাবু। সেখানে যেতে আমার সাহস হয় নি।

সুবোধ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলে করিমই আবার বললে, এই পুলিস তো কালও এখানে ছিল—কই, কাল তো কিছুই হয় নি। মজদুরেরা কাল সবাই ছিল একজোট। আজ ওই ব্যারিস্টার-সাহেব এসে যেই আমাদের এক দলকে মাগগী ভাতার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেল, অমনি পুলিসও বাকি মজদুরকে সায়েস্তা করবার সুযোগ পেলে।

একটু থেমে সে আবার বললে, ওদের জন্যই আমাদের এই সর্বনাশ হ'ল, না ব্যানার্জিবাবু?

সুবোধ হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; শরীরটাকে বেশ জোরে এক বার নাড়া দিয়ে সে বললে, আমি এখন যাই, করিম।

করিমও চমকে উঠে বললে, কোথায় যাবেন?

আপাতত শ্যামাচরণদার স্ত্রী-কন্যার খোঁজ নিতে হবে।

কিন্তু পুলিস যে আপনাকে খুঁজছে, দেখতে পেলেই ধ'রে ফেলবে যে!

সুবোধ উত্তর দিলে না, কেবল দূরের অন্ধকার থেকে নিরানন্দ হাসির শুকনো, কাঁপা, কর্কশ একটা আওয়াজ এক বার উঠেই তৎক্ষণাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সুবোধ আবার ছুটে চলেছিল, কিন্তু আবার থামতে হ'ল তাকে। মোড়ের চায়ের দোকানটার কাছাকাছি এসেই নিজেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। সন্ত্রস্ত কণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদের মত তার মুখ থেকে বের হ'ল—অরুণাংশু!

সত্যই অরুণাংশু। চায়ের দোকানটার সামনে পথের উপর পাতা লোহার চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে সে আর বিমল গল্প করছিল। সুবোধের গলার

আওয়াজ শুনে নিজেও সে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে প্রায় তেমনি কণ্ঠেই বললে, সুবোধ!

ব'লেই উঠে ছুটে গিয়ে সুবোধের ডান হাতখানা চেপে ধরলে সে; তার পর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বললে, কি ভাগ্য যে তোমায় পেয়ে গেলাম! কাল থেকে কেবল তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম, সুবোধ। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। কিন্তু এস, চা খাও আগে।—এখানে নয়, চল একেবারে ভিতরে গিয়ে বসি।

বলতে বলতে সুবোধকে এক রকম জোর ক'রেই সে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল; কাছে বসিয়ে পরে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিলে তুমি এ দু দিন? এখানে এই কাণ্ড বাধিয়ে—

কথাটা তার শেষ হ'ল না; আবার আগের মতই আর্তকণ্ঠে সুবোধ বললে, হাত ছেড়ে দাও, অরুণাংশু; কাজের সময় এখানে না থেকে দ্বিতীয় বার আমি যে অন্যায় করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাকি আছে আমার—

বলতে বলতে এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুবোধ উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু অরুণাংশুও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে আবার সুবোধের হাত চেপে ধরলে; তার পর তাকে এক রকম জড়িয়ে ধ'রেই সে বললে, থাক্, সুবোধ, ও কথাই আজ আর নয়, ওর জন্য তোমায় আমি খুঁজি নি। ব'স তুমি, চা খাও আগে।—বলতে বলতে আরও এক বার এক রকম জোর ক'রেই তাকে সে চেয়ারে বসিয়ে দিলে; তার হাতখানা চেপে ধ'রে রেখেই সে দোকানদারকে উদ্দেশ ক'রে আবার বললে, ওহে, শীগ্‌গির তিন কাপ চা দাও দেখি, আর কখানা বিস্কুট।

চা আসতেই অনেকটা অনুনয়ের মত ক'রেই সে সুবোধকে বললে, চা খাও সুবোধ,—কথা যা আছে তা পরে হবে।

ততক্ষণে সুবোধ কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল; কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই সে চায়ের বাটি কাছে টেনে নিলে, হাতে তুলে চুমুকও দিলে এক বার; কিন্তু পরক্ষণেই বাটিটি আবার পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললে, এই অভিনয় করতে তোমার লজ্জা করে না, অরুণাংশু?

অরুণাংশু চমকে তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু হেসে ফেলেই সে উত্তর দিলে, না ; কারণ, প্রথমত এ অভিনয় নয়, আর দ্বিতীয়ত লজ্জিত হবার মত কোন কাজই আমি করি নি।

কর নি!—সুবোধ উত্তেজিত হয়ে বললে, মজদুরদের হরতাল তুমি ভেঙে দাও নি?

তা হয়তো দিয়েছি।

'হয়তো' নয়, নিশ্চয়ই দিয়েছ।

তা হ'লেও সেটা কোন অন্যায় কাজ করা হয় নি।

হয় নি!

না।—ব'লে অরুণাংশু আবার হেসে ফেললে ; আবার বললে, দু দিন পরেই আপনা থেকেই যে হরতাল ভেঙে যেত, তাকেই দু দিন আগে ভেঙে দিয়ে মজদুরদের দুটো পয়সাই পাইয়ে দিয়েছি আমি।

কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

তুমি হয়তো বলবে, দেশের স্বাধীনতার। কিন্তু তা যে মানি নে আমি, তা তুমি জান। কজেই এ আলোচনা এখন থাক্। চা খাও তুমি, জিনিসটা জুড়িয়ে যাচ্ছে।—ব'লে অরুণাংশু খুব সহজ ভাবেই চায়েব বাটিতে চুমুক দিলে।

কিন্তু সুবোধ নিজের বাটিতে হাতও দিলে না ; অরুণাংশুর মুখেব দিকে চেয়ে মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, আজ কি এখানে ঘটেছে তার খবব জান, অরুণাংশু? আমার হরতালই কেবল ভেঙে যায় নি, আমার নির্দোষ মজদুব ভাইরা দলে দলে গ্রেপ্তার হয়েছে, লাঠি খেয়েছে, গুলি খেয়ে মরেছেও কয়েক জন। এর পর তোমার মুখে চা-বিস্কুট রুচতে পারে, কিন্তু আমার গলা দিয়ে জলও আজ গলবে না।

চায়ের বাটি নামিয়ে রেখে অরুণাংশু সুবোধেব মুখের দিকে তাকাল। এ বার মুখে আর তার হাসি নেই। গম্ভীর স্বরে সে বললে, সেই জন্যই বলি, সুবোধ, যে, অন্যায় আমি করি নি,—অন্যায় করেছ তোমরা, তোমাদেব নেতারা, তোমাদের কংগ্রেস, হুগলীর এই বিশেষ জায়গাটাতে তুমি নিজে।

সুবোধ হাসলে, ছুরির ফলার মত শাণিত তার দীপ্তি, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য

কাঁপা তার আওয়াজ। মুখ ফিরিয়ে সে বললে, তোমার মত সম্মোহিত অন্ধের মুখে এই রকম কথাই শোভা পায়।

কিন্তু উত্তরে অরুণাংশু আগের মতই গম্ভীর স্বরে বললে, আমার মুখে শোভা পায় কি না, তা তেমন বড় কথা নয়। আসল কথা এই যে, এ কথা সত্য। এক বেলা কাজ না করলে স্ত্রীপুত্র নিয়ে যারা অনাহারে মরবে, সেই সব মূর্খ দরিদ্র সংহতিশক্তিহীন মজদুরের বিচারবুদ্ধিহীন আবেগের সুযোগ নিয়ে তাদের দিয়ে তুমি হরতাল করিয়েছ; ফিরে যাবার সোজা পথ দূরে থাক্, বাঁকা একটা পথও খোলা রাখ নি। আমি মানে মানে তাদের ফিরিয়ে না নিলে দু দিন পরে নিছক পেটের জ্বালায়ই কাজে ফিরে যেত না তারা? অবমাননাকর পরাজয় ছাড়া তোমার এই হরতালের আর কি পরিণতি হতে পারত?

মুখ না ফিরিয়েই সুবোধ বললে, মানুষকে যারা উদরসর্বস্ব পশু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, তারা সে পরিণতি কল্পনাও করতে পারে না।

অরুণাংশু বললে, স্তুতির মদে মাতাল ক'রে মানুষকে যারা ছাগল-ভেড়ার মত কসাইখানার ভিতরে চালিয়ে নিয়ে যায়, তারা এমনি ক'রেই সত্যকে অস্বীকার করে। কিন্তু থাক্ সে কথা। তোমার আগের কথাটারই সবটুকু জবাব এখনও দেওয়া হয় নি। আজ যারা ধরা পড়েছে বা লাঠিগুলির ঘায়ে জখম হয়েছে, তারা সবাই তো তোমারই অনুচর। আবেগসর্বস্ব নিরস্ত্র জনতাকে তুমিই লেলিয়ে দিয়েছ সশস্ত্র রাজশক্তির বিরুদ্ধে, রাজার হাতে মার খেয়ে এবং ম'রেই তার সুষুপ্ত বিবেককে নৈতিক আবেদনের সাহায্যে জাগিয়ে তুলবার গান্ধী-মার্কা রণকৌশল হিসাবে। কাজেই আজ যা ঘটেছে, এ তো তোমারই বাঞ্ছিত পরিণতি। এর জন্য খুশি না হয়ে উলটো আবার অভিযোগ করছ কেন? স্বখাদসলিলে ডুবে মরবার মুখে অভিযোগ করলে অনুকম্পার চেয়ে উপহাসই তো পেতে হয় বেশি।

সুবোধ মুখ ফিরিয়ে গর্বিত স্বরে বললে, তোমার অনুকম্পা আমি চাই নি—

তোমায় উপহাসও আমি করতে চাই নে।—অরুণাংশু বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু কথাটা তুমিই তুললে ব'লে জিজ্ঞাসা আমি না ক'রে পারছি নে, এ কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা তোমাদের!

কোন্‌টা ?—সুবোধ একটু যেন বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে।

অরুণাংশু উত্তরে বললে, কোন্‌টা নয় ? বিদেশী শত্রু যখন দেশের দরজায় এসে হানা দিয়েছে, তখন তোমরা চাচ্ছ দেশের শাসনযন্ত্রটাকে বিকল করতে। দেশরক্ষার দায়িত্ব তোমাদের ঘাড়ের উপর এসে প'ড়ে থাকলেও শুধু কথায় নয়, কাজেও তাকে তোমরা এড়িয়ে যাচ্ছ ; কোন একটা কার্যক্রম পর্যন্ত ঠিক না ক'রে অজ্ঞ দরিদ্র জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে পথে বের ক'রে নিয়ে এসেছ। এ যে অমার্জনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

সুবোধ বললে, হয়ও যদি, তবু তা দেশদ্রোহিতার চেয়ে উঁচু স্তরের জিনিস।

অরুণাংশু উত্তেজিত হয়ে বললে, দেশদ্রোহী আমরা নই, তোমরা।

সুবোধ আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উত্তর দিলে, কথাটা যে মিথ্যে তার প্রমাণ আজ আমাদেরই ময়দানে দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী মজদুরের রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছে। তোমাদের কংগ্রেসদ্রোহিতা চরমে উঠেছে আজ।

অরুণাংশু বললে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করলেই তা দেশদ্রোহিতা হয় না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসদ্রোহিতার যে অভিযোগ তুমি করছ, তাও ন্যায্য নয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করি নি।

কর নি ! আমার হরতাল ভেঙে দাও নি তুমি ?

তা নিশ্চয়ই দিয়েছি। কিন্তু তুমি যে হরতাল করিয়েছ, সে যে কংগ্রেসেরও হরতাল তার কোন প্রমাণ দিতে পার তুমি ?

সুবোধ হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেল। দেখে অরুণাংশুই শব্দ ক'রে হেসে উঠে আবার বললে, তা তুমি পার না, সুবোধ, তোমাদের কংগ্রেসের যারা এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনা করছে, তারা কেউ পারে না। কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবে এ রকম কোনও নির্দেশ নেই ; কংগ্রেসের কোন নেতা বা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের নির্বাচিত কর্ণধার গান্ধী-মহারাজও এ রকম কোন নির্দেশ দিয়ে যান নি।

কিন্তু ততক্ষণে সুবোধ নিজেকে সামলে নিয়েছিল ; উত্তরে সে দৃঢ় হয়েই বললে, তা হ'লেও সব নির্দেশের সেরা নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন, অবিলম্বে

পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য প্রত্যেক কংগ্রেস্‌সেবী, প্রত্যেক ভারতবাসীই জীবনপণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত বিজাতীয় সরকারকে আক্রমণ করবে।

অরুণাংশুর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠল; সুবোধের চোখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, সে জন্যই বুঝি যুদ্ধের মাল-মসলা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করছ তুমি?

সুবোধ উত্তরে বললে, হ্যাঁ, ঠিক সেই জন্যই।

সেই জন্যই বুঝি সব জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কাটা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

সেই জন্যই বুঝি জায়গায় জায়গায় রেল তুলে, স্টেশন পুড়িয়ে পুলিস-ফৌজের চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে?

হ্যাঁ।

সেই জন্যই বুঝি পোস্ট-আপিস, আদালত, ইউনিয়ন-বোর্ড, মায় ইস্কুল-ঘরও পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে?

হ্যাঁ।

এ সবই হচ্ছে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন?

সত্যাগ্রহ আন্দোলন হোক আর না হোক, কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিশ্চয়ই।

অরুণাংশু এবার শব্দ ক'রে হেসে উঠল; হাসির ফাঁকে ফাঁকেই সে বললে, বলিহারি তোমার কংগ্রেসকে, আর তার চেয়েও বেশি বলিহারি তোমাদের কংগ্রেসের চার-আনার সদস্য না হয়েও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা গান্ধী-মহারাজকে। ঠিক ঝোপ বুঝেই কোপ দিয়েছেন তিনি। এমন চমৎকার সময়ে এমন চমৎকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি যে, মানুষের ইতিহাসের কোথাও এ রকম স্ট্রাটেজির নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফ্যাশিস্তবাদ আর ফ্যাশিস্ত জাপানকে নিন্দা করা হয়েছে, আবার ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে অসহযোগ আর ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করা হয়েছে। জনসাধারণকে বলা হয়েছে, প্রাণ দিয়েও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে একেবারে অচল ক'রে দিতে, অথচ কি যে তারা করবে, তার কোন নির্দেশও দেওয়া হয় নি।

তোমাদের এই প্রস্তাবে নেতৃত্বের বাহাদুরি যা প্রকাশ পেয়েছে, তা সত্যি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

সুবোধ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললে, সে নেতৃত্বকে বুঝবার মত শক্তিই তোমার নেই, অরুণাংশু।

শক্তি নেই তোমার।—অরুণাংশুও উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলে, আর নেই তোমারই মত আবেগসর্বস্ব আরও যারা দেশে আছে, যাদের সরল বিশ্বাস আর নিরেট মূর্খতার মধ্যে পার্থক্য একটুও নেই।

তার পরেই গলার আওয়াজ অনেকগুলি পর্দা নীচে নামিয়ে প্রায় ফিস-ফিস ক'রেই অরুণাংশু আবার বললে, দিনের আলোর মতই যা স্পষ্ট তোমাদের বোম্বাই প্রস্তাবের সেই শঠতা দেখতে পাচ্ছ না কেন, সুবোধ? সব পথই এতে খোলা রাখা আছে। ইংরেজকে হারিয়ে জাপান যদি এ দেশ জয় ক'রে নেয়, তবে তোমাদের নেতারা তখন বলতে পারবেন যে, ইংরেজকে সাহায্য তাঁরা করেন নি, ইংরেজের সঙ্গে বরং সংগ্রামই তাঁরা করেছেন। আবার যুদ্ধে না হেরে ইংরেজের জয়ই যদি হয়, তা হ'লেও তাঁরা বলতে পারবেন যে, ফ্যাশিস্তবাদ তথা জাপানকে আগাগোড়া তাঁরা নিন্দাই করেছেন। তার পর যে সংগ্রামের উপলক্ষে তুমি একেবারে ক্ষেপে গিয়েছ, তারও সিদ্ধান্তের মধ্যে ঠিক অমনি শঠতাই ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নেতারা স্বয়ং কোন নির্দেশ দেন নি, বরং প্রাণপণ সংগ্রামের হুকুম জারি ক'রেই পুলিসসাহেবের নির্দেশক্রমে সুড়সুড় ক'রে সম্পূর্ণ নিরাপদ জেলের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তোমার মত ক্ষেপা লোকেরা যা করছ, তাতে প্রতিষ্ঠিত সরকার সত্যই যদি অচল হয়ে যায়, সত্যই তারই ফলে স্বরাজ যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে প্রত্যেকটি নেতাই গর্ব ক'রে বলবেন যে, তাদেরই নেতৃত্বে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে। আর জলের উপর বুদ্বুদের মতই তোমাদের এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ব্যর্থ যদি হয়, বিজয়ী ভারত সরকার ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নেতাদের কাছে এই সব হিংসামূলক কার্যের কৈফিয়ৎ দাবি করে, সেদিন বুক ফুলিয়ে, গলা চড়িয়ে এরা বলতে পারবেন যে, এ রকম কোন কাজ করবার নির্দেশ দেশের লোককে তাঁরা দেন নি। পারবেন কেন বলছি? আমি ঠিক জানি সুবোধ,—আন্দোলন বল, সংগ্রাম বল, তোমাদের এই হিংসা-

মূলক ধ্বংসাত্মক কাজ চরম পরীক্ষার সময় তোমাদের নেতারা সম্পূর্ণ গম্ভীর ভাবেই অস্বীকার করবেন।

অরুণাংশু আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবোধ বাধা দিয়ে বললে, নেতারা অস্বীকার করলেও কিছু এসে যায় না,—ইতিহাসের কাছে আমরা স্বীকৃতি পাব।

কণ্ঠস্বর সঙ্কল্পে দৃঢ়,—হঠাৎ যেন একটা আঘাত পেলে অরুণাংশু। বিহ্বলের মত, কতকটা আহতের মতই কিছুক্ষণ সুবোধের মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ স্বরে সে বললে, একটু শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, সুবোধ। তোমাদের এই অসহযোগের পথ, 'নেতি'র পথ অনুসরণ ক'রে কোথায় যাবে তুমি? মরুভূমির ভিতর দিয়ে এর গতি, এর সমাপ্তি পরিপূর্ণ ব্যর্থতায়।

তবু এ পথ কর্মের।—সুবোধ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, এ পথ সংগ্রামের। ইতিহাসের স্মৃতিপবিত্র এই কণ্টকিত বন্ধুর পথই সকল দেশের স্বাধীনতা-কামীদের একমাত্র রাজপথ।

আবার একটি নিশ্বাস পড়ল অরুণাংশুর; একটু চুপ ক'রে থেকে অধিকতর বিষণ্ণ স্বরে সে বললে, কিন্তু এ কি সংগ্রাম সুবোধ? ইংরেজের মত এত বড় একটা সশস্ত্র রাজশক্তির সঙ্গে তুমি শিক্ষাহীন, শৃঙ্খলহীন, আবেগমাত্রসম্বল, নিরস্ত্র একটা জনতা নিয়ে কি সংগ্রাম করবে? কি করতে পারবে তুমি?

সুবোধের চোখ দুটি হঠাৎ ধক্‌ধক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল; সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কিছু না করতে পারি, মরতে তো পারব—

ব'লেই মুখে ফিরিয়ে সে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এটা অপ্রত্যাশিত; অরুণাংশু বিহ্বলের মত বললে, এ কি, সুবোধ, চ'লে যাচ্ছ কেন?—বলতে বলতে নিজেও উঠে দাঁড়াল সে।

ততক্ষণ দোরের আড়ালে সুবোধ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সেই দিকে চেয়ে বিমল একটু বিরক্ত হয়েই বললে, সময় আর শক্তির অপচয় করছেন কেন, অরুণদা? এ সব কথা বুঝবার শক্তি কি আর ওঁর আছে!

কিন্তু অরুণাংশু বিমলের দিকে এক বার ফিরেও তাকাল না,—'সুবোধ' ব'লে ডাকতে ডাকতে সেও পথেই বের হয়ে গেল।

বাইরে তখন টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, অন্ধকার মনে হচ্ছে যেন আরও বেশি কালো। হঠাৎ আলোকিত ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে অরুণাংশু কিছুই দেখতে পেলে না।

প্রায় পাগলের মতই সে ডাকলে, সুবোধ, সুবোধ—

তার পর অনেক দূরে অপস্রিয়মান একটা ছায়ামূর্তির মত দেখতে পেয়ে সে ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলে।

সত্যই সে সুবোধ, শ্যামাচরণের বাসার দিকে ছুটে চলেছিল সে। অরুণাংশু তার হাত চেপে ধ'রে সনির্বন্ধ স্বরে বললে, আমায় মাফ কর, সুবোধ,—রাজনীতির কথা আর একটাও বলব না আমি, ওটা তুলবার ইচ্ছেই ছিল না আমার। তোমার সঙ্গে অন্য একটা জরুরি কথা আছে। সেটা শেষ না ক'রে যেতে পারবে না তুমি। কিন্তু চল, ওই গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ানো যাক, বৃষ্টি আর বিমলের চোখ—এ দুইই ওখানে এড়ানো যাবে।

অনিচ্ছুক সুবোধকে গাছের নীচে টেনে নিয়ে গিয়েই অরুণাংশু তাকে জিজ্ঞাসা করলে, সুভদ্রা কোথায়, সুবোধ?

সুবোধ চমকে উঠে বললে, কে?

সুভদ্রা।—অরুণাংশু ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, খবরটা আজ আমায় বলতে হবে। কোথায় আছে সে?

সুবোধের মাথার চুলই কেবল নয়, তার গায়ের সবগুলি লোমও যেন এক সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল। প্রশ্নটা তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, এতক্ষণ যে জগতে সে ছিল সেখানে সুভদ্রার অস্তিত্ব নেই। সেই যে মাসখানেক আগে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে তার কাছে সে বিদায় নিয়ে এসেছিল, তার পর সুভদ্রার সঙ্গে আর তার মোটে দেখাই হয় নি। ইদানীং তো সুভদ্রার কথা ভাববারও সময় তার ছিল না, তেমন কোন উপলক্ষও উপস্থিত হয় নি। আজ অরুণাংশুকে দেখেও সুভদ্রাকে তার মনে পড়ে নি।

কিন্তু অরুণাংশুর প্রশ্ন শুনবার পর এক সঙ্গেই সকল কথাই তার মনে প'ড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে ও ভিতরে সবই বদলে গেল। এক নিমেষেই সুবোধের মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত কঠিন; চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল

একটা হিংস্র তীক্ষ্ণতা। তৎক্ষণাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে, এই অরুণাংশু কেবল আজ তার হরতালই ভেঙে দেয় নি, তার প্রিয়তমা প্রেয়সী সুভদ্রাকেও তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে আত্মসাৎ করেছে, তাকে পবিত্রতার স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়েছে একেবারে কদর্যতার পঙ্ককুণ্ডে। উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধ'রে ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক বার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে সে ; তার পরেই উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দ ক'রে হেসে উঠে সে বললে, চমৎকার অভিনয় করতে পার তো তুমি! এ যে শিশির ভাদুড়ীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

অরুণাংশু আহতের মত এক বার সুবোধের মুখের দিকে তাকাল ; কিন্তু তার পর হেসে ফেলেই সে বললে, তুমি ভুল করেছ, সুবোধ। আমি আর যা-ই করি, অভিনয় করি নে। সুভদ্রাকে আমার দরকার খুব বেশি, অথচ সত্যি তার ঠিকানা আমার জানা নেই।

জানা নেই!—সুবোধ উত্তেজিত হয়ে বললে, আমার চোখের দিকে চেয়ে উত্তর দাও তো, সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে দেখা হয় নি তোমার?

অরুণাংশু এ বার কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে ; বার দুই ঢোঁক গিলে অস্ফুট স্বরে সে বললে, হয়েছিল, শুধু একবার, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। কিন্তু সে শুধু দেখাই ; তার সঙ্গে কথা আমার হয় নি।

সুবোধ চমকে উঠল ; অরুণাংশুর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে সে বললে, কথা হয় নি?

না, কোন কথাই হয় নি।

তবে তিনি যে বললেন, বলতে বলতে— সুবোধ হঠাৎ থেমে গেল।

কিন্তু অরুণাংশু তার মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, কি বললেন তিনি?

সুবোধ বিব্রতের মত উত্তর দিলে, না, কিছু বলেন নি। কিন্তু তার পরেই আগ্রহের স্বরে সে আবার বললে, কিন্তু তুমি? তুমি কি তার সম্বন্ধে কিছুই জান না?

না।

কিন্তু তিনি তো তোমার বিয়ের কথা জানেন।

বিয়ে!—অরুণাংশু হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠল, তা সে জানতে পারে। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি নে, সুবোধ, জানবার কোন সুযোগই সে আমায় দেয় নি।

মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর; ওতে একটু যেন বিষণ্ণতার আমেজ আছে, কিন্তু নাটকীয়তার কোন আভাসই তাতে নেই। বিস্ময়ে সুবোধ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল,—এক মুহূর্তেই তার ভিতরে একটা বিপ্লবও ঘ'টে গেল। তার মুখের চেহারা গেল বদলে; একটি নিমেষের মধ্যেই তার মন দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে কলকাতায় সুভদ্রার ফ্ল্যাটবাড়ির বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চোখের সামনে সে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেলে, সে অরুণাংশু নয়,—সুভদ্রা। তার মনের মধ্যে বিশ্বাসের ভিত্তির গায়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পদ্মার প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের মত প্রবল বিক্রমে সংশয় এসে আঘাত করলে,—সুভদ্রার পাণ্ডুর মুখের উপরকার সে দিনের সেই চটুল হাসি, সে কি তার জমাট অশ্রুর উপরকার সযত্নরচিত আবরণ? সেই হাসি দেখে নিজে যা সে অনুমান করেছিল, সে কি সব ভুল?

মিনিট খানেক উত্তরের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর অরুণাংশুই হাত বাড়িয়ে সুবোধের একখানি হাত চেপে ধ'রে অনুনয়ের স্বরে বললে, সুবোধ, ভাই, সুভদ্রার ঠিকানাটা আমায় দাও,—তাকে আমার বড্ড দরকার।

সুবোধ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলে সে; কিন্তু অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে সে বললে, তুমি ঠিক বলছ, অরুণাংশু? সুভদ্রা দেবীর কোনও খবর জান না তুমি?

শুকনো রকমের একটু হাসি হেসে অরুণাংশু উত্তর দিলে, জানলে কি আর এত রাত্রে এমন একটা নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করতাম আমি?

তার পরেই হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমায় বিশ্বাস কর, সুবোধ, তোমার সঙ্গে সে বার ঘোরতর তর্ক যে দিন হয়, সুভদ্রার সঙ্গেও আমার সে দিনের দেখাই শেষ দেখা। মাঝে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে হঠাৎ এক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু সে দিন কথা

বলবার সুযোগই মোটে হয় নি। তার পর জানাশোনা প্রত্যেকটি সূত্র ধ'রে তাকে আমি অনেক খুঁজেছি, কিন্তু তার দেখা পাই নি। বিবেকানন্দ রোডের উপর যে মেসে সে থাকত, খোঁজ নিয়ে সেখানেও আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে শুনলাম যে, সুভদ্রা সেখান থেকে চ'লে গিয়েছে; কোথায় গিয়েছে তা মেসের কেউ বলতে পারলে না। তোমার কাছে খবর পাব আশা ক'রে তোমার খোঁজে তখনই এখানেও এসেছিলাম আমি। কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে, তোমার দেখা পেলাম না। তার পর বাড়ির একটা গোলমালের জন্য আমি নিজে এলাহাবাদে আটকে গেলাম। গোলমাল যখন মিটল, তখন হ'ল অসুখ। সব মিটিয়ে কলকাতায় ফিরেছি, তো মোটে হপ্তাখানেক আগে।

শুনতে শুনতে সুবোধের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অরুণাংশুর বর্ণনার সঙ্গে তার নিজের অভিজ্ঞতা হুবহু মিলে যাচ্ছে। অরুণাংশুর মুখের কথা সে আর অবিশ্বাস করতে পারলে না। এক নিমেষেই সুভদ্রার সমগ্র জীবনটাই যেন ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পেলে সে। মনে পড়ল, সুভদ্রার চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা, তার অপরাজেয় আত্মনির্ভরশীলতা, তার দুর্জয় অভিমান; মনে পড়ল অরুণাংশুর ভালবাসার অবসান হয়েছে জেনেই নারীর চরম লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়েও নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সময়, সুযোগ এবং সাফল্যের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকতেও অরুণাংশুকে কোন কথা না জানিয়ে একক জীবন যাপন করবার সেই তার অপরিবর্তনীয় সঙ্কল্প। সুবোধের বুকের মধ্যে তার হৃদ্‌যন্ত্রটা হঠাৎ যেন অনেকখানি নীচে নেমে গেল। তার মনে হ'ল যে, এক দিনের বিশিষ্ট একটি অভিব্যক্তিকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখে, সুভদ্রার মুখের অসম্পূর্ণ একটা বর্ণনা থেকে তার ও অরুণাংশুর সম্বন্ধের কুৎসিত একটা পরিণতি কল্পনা ক'রে নিয়ে সে দিন হয়তো সে মারাত্মক রকমের একটা ভুলই ক'রে এসেছে।

হঠাৎ কমলার মুখের সে দিনের সেই মন্তব্যটি সুবোধের মনে প'ড়ে গেল। এই অরুণাংশুরই নাম ও ঠিকানা সুভদ্রা যে কমলার কাছেও কিছুতেই প্রকাশ করে নি, খেদের স্বরে সেই অভিযোগ করতে করতে কমলা সে দিন হঠাৎ

ব'লে ফেলেছিল, যে লোকটা ওর এত বড় সর্বনাশ করতে পেরেছে, তাকেই এত ভাল ও বাসল কেমন ক'রে ?

কেবল কমলার মুখের কথাই নয়, মাস কয়েক আগের সেই চিরস্মরণীয় রাতটিতে সুভদ্রার নিজের মুখের যে কথা তার কানে যেতেই তার নিজের মাথার মধ্যে দপ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, সেই কথাটাও সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে প'ড়ে গেল ; কিন্তু আমি তো আজও তাকেই ভালবাসি !

কথাটা মনে পড়তেই সুবোধ চমকে উঠল, শেষ রহস্যটুকুও এ বার যেন কেটে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আজও তার মাথার মধ্যে সেই রাত্রের মতই দপ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠলেও সেই আগুনের আলোতেই যেন সত্যটাকে আজ সে স্পষ্ট দেখতে পেলে, আসন্ন মাতৃত্বের সুস্পষ্ট ছাপ-আঁকা সুভদ্রার করুণ পাণ্ডুর মুখখানিই তার চোখের সামনে আরও যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়ল যে, সুভদ্রার যে রূপটাকে প্রত্যক্ষ ক'রে কমলা সসম্ভ্রম বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই রূপই বার বার নিজেও সে দেখতে পেয়েছে ; ওরই বাইরের দুর্ভেদ্য বর্মের গায়ে ঠেকে তার নিজের মুগ্ধ চিত্তের অশান্ত কামনা বার বার প্রত্যাহত হয়ে ফিরে এসেছে। নিজের বুকটা তার ব্যথায় টনটন ক'রে উঠলেও ওই অনুভূতির মধ্যেই আরও একটা উপলব্ধি এখন নিবিড় হয়ে জ'মে উঠল, অরুণাংশুর সন্তানই কেবল সুভদ্রার গর্ভে নেই, স্বয়ং অরুণাংশুও আজও সুভদ্রার গোটা হৃদয়টাই জুড়ে ব'সে রয়েছে, এবং রয়েছে ব'লেই অরুণাংশুর বিয়ের খবর জানতে পেরেও তারই সুখ, সন্তুষ্টি আর শান্তির জন্য সুভদ্রা নিজের সকল সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে আর একটি "মিষ্টি মেয়েকে" পথ ছেড়ে দিয়ে শকুন্তলার মত অজ্ঞাতবাসে গিয়ে আত্মগোপন করেছে।

কি ভাবছ সুবোধ ?—উত্তর না পেয়ে অরুণাংশুই আবার জিজ্ঞাসা করলে।

সুবোধ চমকে উঠল, তার সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাংশু,—সুভদ্রা নয়। হঠাৎ তার নিষ্প্রভ চোখ দুটি ধকধক ক'রে জ্ব'লে উঠল ; হিংস্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল, অরুণাংশু ; বাজারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তোমায় বেত মারা উচিত।

অরুণাংশুর মুখখানা আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এ বারও ওই মুখখানাই হাসবার মত ক'রে সে বললে, তা হয়তো ঠিক। কিন্তু অতি বড় পাপীরও তো

একটা ভবিষ্যৎ আছে!—মন্দ ব'লেই ভাল হবার সুযোগও কি আমি পাব না!

কিন্তু উত্তরটা বোধ করি সুবোধের কানেও গেল না। ততক্ষণে তার চোখ দুটিতে আবার স্বপ্নের আবেশ নেমে এসেছে; স্থান ও কালের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আবার সে যেন কলকাতার সেই ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অরুণাংশু তখন আর তার চোখের সামনে নেই; আবার ফুটে উঠেছে সুভদ্রার সে দিনের সেই অশ্রুকলঙ্কিত করুণ, পাণ্ডুর মুখ,—পরিপূর্ণ সর্বনাশের একখানি জীবন্ত আলেখ্য!

চুপ ক'রে রইলে কেন, সুবোধ?

অরুণাংশুর ডাকেই এবারও সুবোধের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

অরুণাংশুই অনুনয়ের স্বরে আবার বললে, সুবোধ, ভাই, সুভদ্রার ঠিকানাটা আমি চাই। আজও কি তার নিষেধ তুমি অমান্য করতে পারবে না?

সুবোধের বুকের মধ্যে যেন অকস্মাৎ প্রবল একটা আবেগ ফেনিয়ে উঠল। অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অসহায়ের স্বরে সে বললে, সুভদ্রা দেবীর ঠিকানা আজ তুমি জানতে চাচ্ছ কেন? বিয়ে করবার পর তার ঠিকানা জেনে কি করবে তুমি?

বিয়ে!—ব'লে অরুণাংশু আবার উদ্‌ভ্রান্তের মত হেসে উঠল, বার বার বিয়ের কথা কি বলছ, সুবোধ? বিয়ে তো আমার হয় নি।

সুবোধ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বললে, হয় নি?

না, হয় নি।

বিয়ে হয় নি তোমার?

না।

এ বার সুবোধ নিজেই হাত বাড়িয়ে অরুণাংশুর একখানা হাত চেপে ধরলে; রুদ্ধ নিশ্বাসে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি বলছ, অরুণাংশু, সত্যি বিয়ে হয় নি তোমার?

অরুণাংশু ঘাড় নেড়ে বললে, না।

অরুণাংশুর হাতের উপর সুবোধের হাতের মুঠা প্রথমে যেন আগের চেয়েও

দৃঢ় হয়ে চেপে বসল ; কিন্তু পরক্ষণেই হাত ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে স'রে গেল সে।

অরুণাংশু বিস্মিত হয়ে বললে, কি হ'ল সুবোধ ?

সুবোধ অন্যমনস্কের মত উত্তর দিলে, না, কিছু না।

একটু চুপ ক'রে থেকে অরুণাংশু সংশয়ের স্বরে বললে, সে দিন তুমি যে নিষেধের কথা বলেছিলে, তা কি আজও বহাল আছে ? আজও কি তা অমান্য করতে পারবে না তুমি ?

সুবোধ আবার যেন চমকে উঠল ; নিজের হাত দুটি জামার নীচের দুই পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই তা আবার টেনে তুলে নিলে সে ; তার পর অরুণাংশুর দিকে আবার একটু এগিয়ে গিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে সে বললে, সুভদ্রা দেবীর নিষেধ আজও বলবৎ আছে, অরুণাংশু ; কিন্তু আজ লোভ আর আমার নেই। তাই তার নিষেধ অমান্য করতে আজ কুণ্ঠাও আমার নেই। একটু দাঁড়াও তুমি, ঠিকানাটা তোমায় লিখে দিচ্ছি। তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমার হয়ে তাকে তুমি ব'লো যে, তার মঙ্গলের জন্যই তার আদেশ আমি অমান্য করেছি।

কতকটা মাতালের মতই টলতে টলতে সুবোধ দূরের ল্যাম্প-পোস্টটির কাছে চ'লে গেল ; পকেট থেকে কাগজ আর পেন্সিল বের ক'রে লোহার মোটা থামটিকেই টেবিল ক'রে বড় বড় অক্ষরে সুভদ্রার ঠিকানা লিখে ফেললে সে ; ফিরে এসে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, তোমাদের দলে প'ড়ে ভগবানে পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আজ বুঝলাম যে, তিনি আছেন ; আমরা কেউ তাঁকে না মানলেও তুমি, আমি এবং সুভদ্রা দেবী—তিন জনকেই তিনি অনেক দুঃখ দিয়েও ভিতর এবং বাইরের চরম বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করেছেন।

অরুণাংশু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, ভগবানের কথা জানি নে, সুবোধ ; তোমাদের কথাও নয়। কিন্তু ঠিকানাটা দিয়ে তুমি যে আমায় বাঁচালে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

কিন্তু কাগজখানা তার হাতে দিয়ে সুবোধ গম্ভীর স্বরে বললে, তোমার মন্তব্যের উত্তর দেব না আমি। ভগবানে বিশ্বাস যদি তুমি না করতে চাও,

না-ই করলে। কিন্তু আমার একটা কথা বিশ্বাস কর তুমি,—যা তুমি শুনেছ, যা তুমি ভেবেছ, তার কিছুই ঠিক নয়। তোমার প্রত্যাখ্যানের মতই আমার চাওয়াকেও উপেক্ষা ক'রে সুভদ্রা দেবী আজও তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাকে অবিশ্বাস ক'রে তার এত বড় ভালবাসার অপমান ক'রো না যেন।

একটু থেমে সে আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে আবার বললে, সুভদ্রা দেবীকে হয়তো এ বার আর একা পাবে না তুমি; হয়তো তার কোলেই তার সন্তানকেও দেখতে পাবে, সে সন্তান তোমার।

ব'লেই দ্রুতপদে সে দূরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন রাত অনেক। ব্যারাক এবং বস্তিতে অধিকাংশ লোকই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ময়দান পার হয়ে বস্তির পথ ধ'রে সুবোধ শ্যামাচরণের বাসার দিকে ছুটে চলল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হবার পর যা তার চোখে পড়ল, তাতে তার পা দুটিই কেবল নয়, তার সম্পূর্ণ শরীরটাই যেন পাথর হয়ে গেল। বাড়িতে আলো জ্বলে নি। নক্ষত্রের আলোকে যা দেখা যাচ্ছে, সে যেন বিভীষিকা। হাঁড়ি-কুড়ি, কাঁথা-বালিশ, চারপাই-আসবাব প্রভৃতি গরিবের সংসারের সব সরঞ্জাম উঠানে ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে। বাড়ি আর বাড়ি নেই, মনে হচ্ছে যেন চষা ক্ষেত।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সুবোধ ভয়ে ভয়ে ডাকলে, তারা, তারা,—বউদি, ও বউদি—

কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিলে না; কেবল কাছের একটা গাছ থেকে একটা প্যাঁচা বিকট শব্দ ক'রে সুবোধের মাথার উপর দিয়েই কোথায় যেন উড়ে চ'লে গেল।

অরুণাংশু বিমলের কাছে ফিরে যখন এল, তখন তার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।

বিমল তাকে দেখেই প্রায় আঁতকে উঠেই বললে, ইস্, অরুণদা, একেবারে যে ভিজে গিয়েছেন দেখছি!

তার পর বিরক্ত কণ্ঠে সে আবার বললে, বুনো হাঁসের পিছনে কেন ছুটতে

গিয়েছেন, বলুন তো! চলুন, চলুন : ওদিকে ভাত-ডাল জুড়িয়ে বোধ হয় জল হয়ে গেল।

উত্তরে অরুণাংশু শুধু বললে, চল। তারপর নিজেই হনহন ক'রে এগিয়ে চলল সে। সারাটা পথ বিমলের সঙ্গে আর একটি কথাও সে বললে না।

কিন্তু বাসার কাছে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে; বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি খেয়ে নাও গে, বিমল; আমায় এক্ষুনি একবার থানায় যেতে হবে।

থানায়! বিমল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, অরুণদা?

কাজ আছে।—ব'লেই অরুণাংশু আবার বিপরীত দিকে চলতে শুরু ক'রে দিলে।

বিমল বিস্মিত হ'ল, বিরক্তও হ'ল; কিন্তু পিছন থেকে দু-তিনবার ডেকেও অরুণাংশুর কোন সাড়া না পেয়ে অনিচ্ছা ও বিরক্তি সত্ত্বেও সেও অরুণাংশুরই অনুসরণ ক'রে চললে।

থানায় বড় দারোগা তখন অনুপস্থিত, ছোট দারোগাকেই অরুণাংশু জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধ ব্যানার্জিকে গ্রেপ্তার করেছেন আপনারা?

দারোগা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলে, না; তাকে এখনও পাওয়া যায় নি।

থানায় ব'সে সিগারেট ফুঁকলেই ফেরারী আসামীকে পাওয়া যায় নাকি?—অরুণাংশু বিরক্ত কণ্ঠে বললে, সুবোধকে ধরবার জন্য কি চেষ্টা করেছেন আপনারা?

দারোগা বিস্মিত এবং বিব্রত হয়ে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু অরুণাংশু অসহিষ্ণুর মত তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, লোকজন নিয়ে এক্ষুনি শ্যামাচরণের বাড়িতে চ'লে যান আপনি। সুবোধ সেখানেই আছে। এক্ষুনি যান, এক মিনিটও আর দেরি করবেন না।

দারোগা লাফিয়ে উঠে বললে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করবার পর আমার কথা তাকে বলবেন না যেন।—অরুণাংশু চোখ আর ভুরুর বিশেষ একটা ভঙ্গী ক'রে বললে।

উত্তরে দারোগা প্রায় সব কটি দাঁত বের ক'রে আপ্যায়নের স্বরে বললে,

সে কি কথা! তা কেন বলব! হেঁ-হেঁ,—কি যে বলেন আপনি! এত দিন পুলিসের চাকরি করছি, এটুকু কি আর বুঝি নে!

কিন্তু ততক্ষণে অরুণাংশু পথে বের হয়ে পড়েছে। হনহন ক'রে বাসার দিকেই আবার ছুটে চলল সে। বিহ্বল বিমল তার পাশে এসে যখন উপস্থিত হ'ল, তখন উত্তেজনা ও পরিশ্রমে তার হাঁফ ধরবার উপক্রম হয়েছে।

তথাপি কাছাকাছি এসেই অভিযোগের স্বরে সে বললে, ছিঃ, অরুণদা, এ কি করলেন আপনি! সুবোধদার সঙ্গে আমাদের মতের মিল হচ্ছে না ব'লেই তাকে আমরা পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেব নাকি!

তুমি কিচ্ছু বোঝ না, বিমল।—বলতে বলতে অরুণাংশু থমকে দাঁড়াল; ফিরে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গী ক'রে সে বললে, দেখছ না, সুবোধ ক্ষেপে গিয়েছে। যা-তা একটা কিছু ক'রে, হয়তো বা গুলির মুখে এগিয়ে গিয়ে আত্মহত্যাই করবে সে, অথচ ভাববে যে, দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে। ও জেলের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকলে ওর প্রাণটা তো অন্তত বাঁচবে! এ রকম একটা প্রাণের দাম তো কম নয়!

উত্তরে বিমলের মুখে কথাই ফুটল না।

৮

তখনও ভোর হয় নি। পূবের আকাশে অল্প একটু রঙ ধ'রে থাকবে, কিন্তু কলকাতায় তা বোঝা যায় না। অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে মহানগরী তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু কমলার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে নবজাত শিশুর কাঁচা গলার চিঁ-চিঁ সুরের কান্না তার কানে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। জেগেও সে বুঝতে পারলে যে, সে স্বপ্ন দেখে নি, সত্যই খোকা কাঁদছে;—সুভদ্রার খোকা।

দিন সাতেক মাত্র আগে সুভদ্রা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে।

হাসপাতালে যাবার প্রয়োজন তার উপস্থিত হয়েছিল নিতান্তই অকস্মাৎ। সে দিন মাঝরাত্রে সুভদ্রার কাতর কণ্ঠের ডাক শুনে কমলার ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল। দোর খুলতেই তার চোখে পড়েছিল,—ঠিক দোরের সামনেই মাটিতে প'ড়ে সুভদ্রা কাটা ছাগলের মত ছটফট করছে; তার মুখ নীলবর্ণ, চোখের তারা দুটি যেন কোটর থেকে ছুটে বের হয়ে আসছে। কিন্তু ওই অবস্থায়ও কমলার একখানি হাত চেপে ধ'রে কাতর স্বরে সুভদ্রা বলেছিল, আমি তো চললাম, কিন্তু আমার খোকা? তাকে তুমি দেখবে তো, কমলা?

কমলা সুভদ্রাকে ধমক দিয়েছিল, সান্ত্বনাও দিয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় তার নিতান্ত কম হয় নি,—এত শিগগির এ পরিণতি সে আশা করে নি।

তবে শেষ পর্যন্ত শিশু বা প্রসূতি, কারও কোন অমঙ্গল হয় নি। সুভদ্রার কষ্ট একটু বেশি হ'লেও সে পেয়েছিল ঠিক তাই, যা সে সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিল,—মেয়ে নয়, ছেলে; আকারে একটু ছোট, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারেরা তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল যে, নবজাত শিশুর দেহের গঠনে অসম্পূর্ণতা থাকলেও তার বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গেই মারাত্মক কোন ত্রুটি নেই, বরং প্রকৃতি উদার হয়ে তাকে জীবনের সকল উপকরণ দিয়ে সাজিয়েই সংসারে পাঠিয়েছে।

সুভদ্রার জীবনের সে এক অবিস্মরণীয় দিন। কেবল তার সন্তানের জন্মদিনই তা নয়, সে দিন যেন তার নিজেরও নবজন্মের।

বিশেষ ক'রে সেই সময়টা। হাসপাতালের বিছানার উপর সুভদ্রা অর্ধ-মূর্ছিতের মত প'ড়ে ছিল। কি যে হয়ে গিয়েছে, সে সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না; তেমনি কি যে হবে, সে সম্বন্ধেও নয়। এমনি অবস্থায় হঠাৎ এক সময়ে তার মনে হয়েছিল যে, কে যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে নাম ধ'রে তাকে ডাকছে।

অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা জানা সুরের মূর্ছনার মত সে আহ্বান তার আচ্ছন্ন মনকে যেন দোলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিল।

চোখ মেলেই সে দেখতে পেয়েছিল, তার বিছানার কাছে কমলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কোলে নবজাত শিশু।

কমলা হেসে বলেছিল, কোলে নিবি নে? দেখ্, কি সুন্দর খোকা হয়েছে!

সুভদ্রা তার চোখ বা কান কোনটাকেই বিশ্বাস করতে পারে নি; অভিভূতের মত সে কেবল তাকিয়েই ছিল।

দেখে খুব মিষ্টি রকমের একটা ভ্রূভঙ্গি ক'রে কমলাই আবার বলেছিল, অমন হাবার মত তাকিয়ে রইলি যে? নে।—বলতে বলতে নিজেই সে খোকাকে সুভদ্রার বুকে তুলে দিয়েছিল।

স্থান আর উত্তাপের পরিবর্তন অনুভব ক'রে শিশু তার ছোট শ্বাসযন্ত্র দুটির সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে কেঁদে উঠেছিল।

সে যেন বাঁশীর মত মিহি সুরে অনৈসর্গিক কি এক রাগিণীর অপরিস্ফুট ঝঙ্কার!

সুভদ্রা চমকে উঠেছিল। অতুলনীয় সে দিনের তার সেই অভিজ্ঞতা, অননুভূতপূর্ব সেই মুহূর্তের উপলব্ধি।

সদ্যোজাত শিশুদেহের সুকোমল, উষ্ণ স্পর্শ মুহূর্তমধ্যে যেন সুভদ্রার প্রত্যেকটি লোমকূপের ভিতর দিয়ে অমৃতধারা সঞ্চারিত ক'রে তার বেদনাক্লিষ্ট অবসন্ন দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুকে পর্যন্ত সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছিল। মুখে তখন তার কথা ফোটে নি; কিন্তু তার দুর্বল বাহু দুটি তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল আগ্রহে প্রসারিত হয়ে রোরুদ্যমান শিশুকে জড়িয়ে ধরেছিল, আধখোলা নিষ্প্রভ চোখ দুটি হঠাৎ যেন আগুনের মত জ্ব'লে উঠে বিদ্যুদ্বেগে শিশুর মুখের উপর গিয়ে পড়েছিল।

নিজে সে ধাত্রী। অতীতে কত নবজাত শিশুকেই সে বুকে তুলে নিয়েছে, কত শত সদ্যোজাত শিশুদেহের সুকোমল স্পর্শের মধুর স্মৃতি তার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে জ'মে রয়েছে। কিন্তু ওই বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তটিতে তার মনোজগতে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয় নি,—তার সে দিনের অনুভূতি একেবারেই নূতন।

সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনকুঞ্চিত মুখের উপর সে দিন সুভদ্রার চোখ গিয়ে পড়তেই তার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন অসীম একটা মহাসাগর গর্জন ক'রে ফুলে এবং দুলে উঠেছিল। হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা দিয়েই সেই মুহূর্তেই সে নিঃসংশয়ে অনুভব করেছিল যে, কমলা আজ যাকে তার বুকে তুলে দিয়েছে সে তো কেবল নবজাত অসহায় শিশুই নয়, সে যে তার নিজের

সন্তান,—তার কামনার পরিতৃপ্তি, তার দীর্ঘ কালের দুশ্চর সাধনার পরিপূর্ণ সিদ্ধি ; সে শিশু অপর কেউ নয়, অন্য কারও নয় ; জগতের আর সকল শিশু থেকে স্বতন্ত্র সে শিশু একান্ত ভাবে তারই নিজস্ব সম্পদ—তার নিজের পরিণত ও পুরাতন দেহেরই সুকুমার ও সুকোমল অভিনব এক রূপান্তর, তার নিজেরই আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও ভালবাসা, স্বপ্ন ও কল্পনাই ওই শিশুর মধ্যে রূপ ধ'রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দুঃসহ দুঃখের অবসানে তেমনি দুঃসহ ওই সুখ।

ব্যাকুল আগ্রহে খোকাকে বুকের উপর চেপে ধ'রে সুভদ্রা সে দিন ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল।

তার পর থেকে সুভদ্রার কাছে জগৎ ও জীবন দুইই যেন বদলে গিয়েছে।

অন্ধকার দূর হয়েছে, অবসর ভ'রে উঠেছে, খালি বাড়ির নিস্তব্ধতা মুখর হয়ে উঠেছে। জীবনটা সুভদ্রার কাছে এখন আর নিরর্থক অস্তিত্বের দুর্বহ একটা বোঝা মনে হয় না, তার ম্লান মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে।

কমলার জীবনের ধারাটাও বদলে গিয়েছে। তারও আনন্দের অবধি নেই ; বরং উল্লাস ও উচ্ছ্বাস সুভদ্রার চেয়েও তারই যেন বেশি ; উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাও তেমনি। সুভদ্রা যে কদিন হাসপাতালে ছিল, সে কদিন কমলাও দিনরাত হাসপাতালেই কাটিয়েছে। নাওয়া-খাওয়ার জন্য রোজই দুবার ক'রে বাসায় সে আসত বটে, তবে তা নিজের গরজে ততটা নয় যতটা সুভদ্রারই তাগিদে। সুভদ্রাকে নিয়ে বাসায় ফিরবার পরেও মূলত তার সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। তার প্রাক্‌টিস এখনও এক রকম বন্ধই আছে। সুভদ্রার ছেলেকে নিয়েই মেতে উঠেছে সে,—যেন এ শিশু তারই গর্ভজাত সন্তান।

প্রথম মাতৃত্বের মধুর সঙ্কোচটুকু সুভদ্রা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। শিশুর পরিচর্যা করবার আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্ব, কোনটিরই তার অভাব না থাকলেও কমলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে এখনও মাথাটা তার কুণ্ঠাভরে নত হয়ে পড়ে, হাত যায় কেঁপে। এতেই কমলার সুবিধা হয়ে গিয়েছে। সুভদ্রার কাজের কোন না কোন একটা খুঁৎ ধ'রে শিশুকে তার কোল থেকে সে কেড়ে নেয়। সুভদ্রা রাগ করে না, দুঃখিতও হয় না ; ছেলেকে কমলার কোলে

তুলে দিয়ে সলজ্জ সহাস্য মুখে কাছে দাঁড়িয়ে সে তার পরিচর্যা দেখতে থাকে ; —এত দিন পর কমলাকে সে বুঝতে পেরেছে।

সুভদ্রার ছেলের সমস্ত দায়িত্বই যেন কমলা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে। তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, তেল মাখানো, ঘুম পাড়ানো প্রভৃতি যত রকমের কাজ আছে, তার কোনটাই যেন নিজের হাতে না করলে কমলার তৃপ্তি হয় না। নিজের আহার-নিদ্রা, আরাম-বিশ্রাম সম্বন্ধে তার একেবারেই কোনও খেয়াল নেই। কলের জল বন্ধ হয়ে যায়, তার স্নান করবার সময় হয় না ; রাঁধা ভাত ঢাকার নীচে জুড়িয়ে জল হয়ে যায়, ওদিকে কমলা দোলনা দুলিয়ে ঘুমন্ত শিশুকে ঘুম পাড়াতে থাকে। সুভদ্রা নাওয়া-খাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করতে গেলে সে রাগের ভান ক'রে দূর দূর ক'রে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; কোন দিন আবার ঘুমন্ত শিশুকে আলগোছে চিমটি কেটে জাগিয়ে দিয়ে তাকে দিয়েই নিজের বিলম্বের সমর্থন করিয়ে নেয়।

খোকাকে ফেলে কমলা বাইরে যেতে চায় না। খুব দরকার পড়লে বাধ্য হয়ে যদি তাকে বাইরে যেতে হয়, তা হ'লেও বেশিক্ষণ সে বাইরে থাকতে পারে না, হয়তো কাজ ফেলেই সে বাসায় ফিরে আসে। বাইরে গেলেই ফিরবার সময় খোকার জন্য হয়তো একটা জামা, না হয় এক টুকরা ছিটের কাপড়, না হয় একটা শিশুর খাদ্য, নয়তো কোন রকমের একটা খেলনা সে অবশ্যই কিনে নিয়ে আসে। দিনের বেলায় যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই সে খোকাকে চোখের আড়াল করতে দেয় না। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ওই খোকাকেই সে স্বপ্ন দেখে। প্রায় রাত্রেই একবার জেগে উঠে ঘুমন্ত সুভদ্রার ঘুম ভাঙিয়ে তার ঘরে গিয়ে খোকাকে সে দেখে আসে, —সুভদ্রাকে তার যেন বিশ্বাস হয় না।

একেবারে কচি শিশু,—অন্ধকারের কোলের উপর অপরিস্ফুট উষার আলোর মত জীবনের অস্পষ্ট এক রেখাচিত্র মাত্র। অপরিণত তার দেহ, মাখনের মত নরম মুখখানির গড়নটি পর্যন্ত তখনও স্পষ্ট হয় নি। এখনও কণ্ঠে তার ভাষা নেই, ঠোঁটে হাসিটুকু পর্যন্ত ফোটে নি। মানুষ হয়ে উঠতে এখনও তার অনেক বাকি। আজও সে ব্যক্তিত্বহীন, বৈশিষ্ট্যহীন, জীবন্ত একটি

মাংসপিণ্ড মাত্র। তথাপি এই অপরিচিত শিশুর অগঠিত মুখখানিই দেখে দেখে কমলার যেন আর তৃপ্তি হয় না।

সুভদ্রার এই নবজাত পুত্রের মধ্যে কমলা যেন অনেক দিন পর তার নিজের হারানো সন্তানকেই আবার ফিরে পেয়েছে।

ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁ-য়া—

খোকা কাঁদছে, কমলা স্পষ্ট শুনতে পেলে। কেবল বেদনা নয়, শিশুর ছোট বুকের দুরন্ত অভিমান আর অদম্য বিরক্তিও যেন ওই কান্নার সঙ্গে ফেটে ফেটে পড়ছে।

কমলা ধড়মড় ক রে উঠে বসল। চোখ মুছে কান পেতে শুনলে সে। তার যে ভুল হয় নি, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই তখনই সে দোর খুলে ছুটে বের হয়ে পড়ল। সুভদ্রার ঘরের বন্ধ দরজায় জোরে জোরে করাঘাত করতে করতে সে অসহিষ্ণুর মত ডাকলে, সুভদ্রা, শুনতে পাচ্ছিস নে?—ও শুভা,—ও পোড়ারমুখী—

একটু পরে সুভদ্রা দোর খুলে দিতেই কমলা যেন পাগলের মত তার উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল; বললে, হতভাগী, তুই কি ম'রে প'ড়ে ছিলি? এই কি ঘুম? এমন কান্না, ও-ঘর থেকে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর তোর—

সত্যি, শুনতে পাই নি, ভাই।—মুখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, ঘুমিয়েছি এই একটু আগে। প্রথম রাতে কি যে হ'ল, কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। মাথার মধ্যে কত যে ছাইপাঁশ ভাবনা উঠতে লাগল—

কমলা তার কৈফিয়তে কানও দিলে না। কেবল সুভদ্রার মুখের দিকে কটমটিয়ে এক বার তাকিয়েই ছুটে গিয়ে খোকাকে সে বুকে তুলে নিলে। কিন্তু ওর দেহের স্পর্শ নিজের বুকের উপর অনুভব ক'রেই শিউরে উঠে সে বললে, ইস, ও যে ভিজে একেবারে হিম হয়ে গিয়েছে, সাধে কি এত কান্না! আর তুই?—সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কমলা যেন আর এক বার জ্ব'লে উঠল, আর তুই ওর এত কাছে শুয়েও বুঝতে পারিস নি? ধিক তোর ঘুমকে, তোর নিজেকে আরও বেশি ধিক।

কথা বলতে বলতেই কমলা শিশুর ইজের-জামা বদলে দিলে; বিছানার

উপরের রবারের কাপড়খানা তুলে ফেলে, চাদর বদলে আর একখানি চাদর এবং ম্যাকিন্‌টসের আর একটি টুকরা পরিপাটি ক'রে পেতে দিলে ; তার পর বুকের উপরেই খোকাকে দোল দিতে দিতে ঘুরে ঘুরে সে বলতে লাগল, বাবা আমার, ধন আমার, সোনা আমার—

কিন্তু এত যত্ন এবং এত আদর পেয়েও খোকার কান্না থামল না ; বরং ঠোঁট উলটিয়ে, চোখ বুজে, হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে আরও জোরে চীৎকার ক'রে কাঁদতে শুরু করলে।

কমলার ধমক খেয়ে সুভদ্রা প্রতিবাদ করে নি ; বরং একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে কমলার ব্যবহারটাকে সে উপভোগ করছিল। কিন্তু খোকার কান্না কিছুতেই যখন থামল না, তখন একটু এগিয়ে এসে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, ওকে আমার কাছে দাও, কমলা ; দেখি, আমি যদি ওর কান্না থামাতে পারি। যে রকম চেঁচাচ্ছে, হয়তো পাড়ার সকল লোকেরই ঘুম ভেঙে যাবে।

হাত বাড়িয়ে কমলার কোল থেকে খোকাকে সে এক রকম টেনেই নিজের বুকে তুলে নিলে। প্রথমে খোকা আরও জোরে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল ; তার ছোট কোমল শরীরটা যেন বিরক্তি ও ক্রোধে ধনুকের মত বেঁকে গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই, মায়ের বুকের পরিচিত স্পর্শ অনুভব ক'রেই শান্ত হয়ে, কান্না থামিয়ে সে চোখ মেলে তাকাল।

সুভদ্রা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললে, দেখলে, কি দুষ্টু !

কমলাও হাসলে ; সুভদ্রার কাছে এসে খোকার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে আলগোছে তার একটি গাল টিপে ধ'রে কমলা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, ইস, মায়ের প্রতি টান তো কম নয় ! মায়ের কোলে গিয়েই একেবারে চুপ। তবু যদি তোর মা এক বারও তোর দিকে চেয়ে দেখত ! তা-ও তো সে চায় না !—তুই কেঁদে ম'রে গেলেও তো ঘুম ভাঙে না তার ! তোর এই মাসীকেই যে ঘুম ছেড়ে, বিছানা ছেড়ে তোর ভিজে কাপড় বদলে দিতে ছুটে আসতে হয় !

খোকা আর কাঁদল না, এক বার নড়লও না। শুধু দুই চোখ মেলে এক দৃষ্টে কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শুধু ওই চোখ দুটি। ভাষা নয়, হাসি নয়, রূপ নয়, বর্ণ পর্যন্ত নয় ;—ফুটেছে

কেবল ওই দুটি চোখ। অন্যমনস্ক শিল্পীর হাতের অসম্পূর্ণ মূর্তির মত নবনীত কোমল মানবদেহের এক তাল উপাদানের মধ্যে সূর্যকরোজ্জ্বল সরোবরের মত শান্ত ও স্নিগ্ধ দুটি চোখ,—তেমনি নীল, তেমনি গভীর, তেমনি স্বচ্ছ। বিশ্বের সমস্ত বিস্ময় সেই চোখ দুটির মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত হয়ে জ'মে রয়েছে; শাশ্বত মানবচিত্তের শত লক্ষ মূক জিজ্ঞাসা অন্তরের অন্ধকার অন্তঃপুর পার হয়ে এসে যেন ওই চোখ দুটির একাগ্র দৃষ্টির মধ্যে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে থেমে গিয়েছে।

মূর্তিমান বিস্ময়ের মত ওই চোখ দুটির দিকে চেয়ে কমলা নিজেও যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সুভদ্রাও চুপ ক'রে রইল, তার পর কুণ্ঠিত স্বরে বললে, তুমি শুতে যাও, কমলা; আমিই ওকে ঘুম পাড়াচ্ছি।

কমলা চমকে উঠল, যেন চুরি করতে করতে ধরা প'ড়ে গিয়েছে সে। খোকার গালটা ছেড়ে দিয়ে লজ্জিত ভাবে সে একটু দূরে স'রে গেল; তার পর ওই অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকবার জন্যই যেন কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ একটা ঝঙ্কার তুলে সে বললে, শুতে যাবার কথা আর কি বলছিস তুই? রাত কি আর আছে যে, শুতে যাব!

সুভদ্রা বিস্মিত হয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। অবস্থাটা সে সঠিক বুঝতে পারলে না,—ঘরে আলো জ্বলছিল, বাইরেও আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কমলার দিকে ফিরে তাকিয়ে কি একটা কথা সে বলবার উপক্রম করতেই কমলাই আবার বললে, না, ভাই, শোওয়া আর নয়। আমাকে আজ এক বার বাইরে যেতে হবে, অনেক কাজ রয়েছে। ডাক্তার সেন কি জানি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, সেখানে এক বার যেতে হবে। তাগাদা করতে যেতে হবে দু জায়গায়। মীরার সঙ্গে বহু দিন দেখা হয় না, সেখানেও একবার—

কিন্তু সে জন্য এত ভোরে বেরুবার কথা কি বলছ তুমি?—সুভদ্রা বাধা দিয়ে বললে, বাইরে এখনও তো অন্ধকার রয়েছে!

কমলা মাথা নেড়ে বললে, ওটা অন্ধকার নয়, মেঘ ক'রে আছে ব'লেই অমন দেখাচ্ছে। তবে তুমি যদি আবার শুতে চাও তো শোও।

একটু থেমে সে আবার বললে, সকাল সকাল গিয়ে সকাল সকাল ফিরে আসাই ভাল। যা কাণ্ড চলছে কদিন ধ'রে,—একটু বেলা হ'লেই তো আবার গোলাগুলি চলতে শুরু হবে,—মা গো, মা!—বলতে বলতে কমলা যেন অমনি একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল।

সুভদ্রা আর প্রতিবাদ করলে না, হঠাৎ উন্মনা হয়ে পড়ল সে।

সত্যই কদিন যাবৎ কলকাতায় প্রকাশ্য একটা বিদ্রোহ চলছিল।

এটা মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দের আকস্মিক গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের বোম্বাই প্রস্তাবে গৃহীত সঙ্কল্পের বাহ্য বাস্তব অভিব্যক্তি।

নেতাদের গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় তেমন কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নি। কিন্তু লণ্ডনের পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব যখন ওই স্তব্ধ নিষ্ক্রিয়তাকে বাংলা দেশ তথা বাঙালী জাতি কর্তৃক কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ ব'লে ব্যাখ্যা করলেন, তখন ওর প্রত্যুত্তরেই যেন বাংলা দেশ আর বাঙালী জাতির চেহারাটা হঠাৎ একেবারে বদলে গেল। কংগ্রেসের নাম-করা যারা নেতা, তাঁরা উর্ধ্বতন নেতাদের কোন নির্দেশ না পাওয়ার অজুহাতে হয় ভাল ছেলের মত ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে বসলেন, নয় তো শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে যা কিছু একটা ক'রে তাড়াতাড়ি জেলের মধ্যে গিয়ে প্রাণ ও মান দুইই বজায় রাখলেন। কিন্তু সাধারণ কর্মীরা এবং তাদের চেয়েও বেশি অখ্যাত অজ্ঞাত রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষাহীন জনসাধারণ কংগ্রেসের মোটা নির্দেশটাকেই চরম নির্দেশ মনে ক'রে নিজেরাই স্ব স্ব শক্তি, সাধ্য ও বিচারবুদ্ধিমত স্বরাজের জন্য চরম সংগ্রাম শুরু ক'রে দিলে। তারা না রাখলে শুচিতা, না মানলে পদ্ধতির গতানুগতিকতা। সরকার নামক সত্ত্বাটার প্রাণ ঠিক কোথায় যে আছে, তা সঠিক বুঝতে না পারার জন্যই যেন সরকারের প্রত্যেকটি প্রতীককেই তারা আক্রমণ ক'রে বসল।

যা ঘটল, তা অসাধারণ ও অভূতপূর্ব। ছেলেরা স্কুল থেকে বের হ'য়ে এল, মজদুরেরা এল কারখানা থেকে। দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করলে। তার পর ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ সকলে

মিলে পথে বের হয়ে এল বিজাতীয় আমলাতান্ত্রিক সরকারকে আক্রমণ করতে।

রব উঠল—সরকারকে অচল করতে হবে। আক্রমণ চলল যা কিছু সচল, তারই উপর।

আজ কদিন ধ'রেই সেই আক্রমণ চলেছে। বে-সামরিক জনসাধারণের আবাসভূমি কলকাতা হয়ে উঠেছে যেন রীতিমত একটা রণক্ষেত্র।

পথ দিয়ে ট্রাম-বাস চলে,—ব'য়ে নিয়ে যায় সেই সব কর্মচারীদের, যারা দপ্তরে আদালতে আর থানায় ব'সে সরকারী যন্ত্রটাকে তেল দিয়ে, গতি দিয়ে চালু রাখে। পথ দিয়েই চলে মিলিটারি আর পুলিসের লরি,—জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর উদ্যমকে হত্যা করবার মারণাস্ত্র। এই সত্যটাই জনতা অস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছে। তাই আক্রমণ চলেছে, বিশেষ ক'রে ওই পথের উপর,—উদ্দেশ্য সচল সরকারের গতিটাকে পঙ্গু করা। ট্রামগাড়ির তার কেটে দেওয় হচ্ছে; কাটা তার আবার জোড়া লাগে দেখে চলন্ত গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন। পাথরের পথে পরিখা কাটা যায় না; তাই দু-দশ হাত পরে পরেই প্রাচীর তুলে ছোটখাটো এক-একটা যেন দুর্গ তৈরি করা হচ্ছে। অদ্ভুত সব উপকরণ সে সব দুর্গের। ভাঙা ইট, পাথরের কুচি, কাঠের দোকান থেকে তুলে আনা ছোটবড় কাঠের গুড়ি, প্যাকিং বাক্স, উপরে তোলা পথের ধারের ল্যাম্প-পোস্ট আর চিঠির বাক্স, টেলিগ্রাফ, টেলি-ফোন আর ট্রামগাড়ির কাটা তার দিয়ে একত্র বেঁধে তৈরি হচ্ছে এক-একটা প্রাচীর। জাতীয় ফৌজের বিশৃঙ্খল সেনাকে তারা বর্মের মত রক্ষা নাও যদি করতে পারে, বড় বড় মিলিটারি লরিকেও থামিয়ে দিতে তাদের কার্যকারিতা অসীম। পুলিসের পক্ষে ওগুলিকে ভাঙা সোজা হ'লেও জনতার পক্ষে ওসব গড়াও তেমন শক্ত নয়। সে কালের রক্তবীজের মতই ওর এক-একটা দুর্গ-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ থেকে সারি সারি প্রাচীর আবার গ'ড়ে উঠছে।

বড় বড় মোড় আর ছোট ছোট গলির মুখে ছোট-বড় জনতার ভীড়। সে যেন এক-একটা সেনাদল, না-ই বা থাকল তাদের সাজপোশাক বা অস্ত্রশস্ত্র। যে কোন সুশিক্ষিত সৈন্যদলের যা প্রাণ, সেই দুর্জয় সংকল্প, দুর্দম সাহস,

আত্মরক্ষার ইচ্ছার চেয়েও আক্রমণ করবার অপরিমেয় উৎসাহ তাদের আছে। আর আছে আত্মবিশ্বাস।

সে যেন দুর্বল কিন্তু কৃতসংকল্প জাতির গেরিলা-বাহিনী,—জাতির অন্তরের প্রেরণায় রাতারাতিই তৈরি হয়ে গিয়েছে।

যা কিছু সরকারের প্রতীক, তারই উপর এ বাহিনীর আক্রমণ চলেছে। সশস্ত্র পুলিস আর সাঁজোয়া গাড়ির ভয় গিয়েছে ঘুচে।

এক-একটা জনতার ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল ছুটে আসছে; আর উঠছে জয়ধ্বনি,—মহাত্মা গান্ধীকি জয়—ইংরেজ-রাজ বরবাদ।

অপর পক্ষেও তোড়জোড়ের অন্ত নেই।

কলকাতার যত পুলিস সব যেন আজ পথে। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে বন্দুক। মিলিটারি থেকেও লোক আনা হয়েছে বিস্তর। দেশী আছে, গোরাও আছে। চাইলেই চোখে পড়ে লাল পাগড়ী আর সাদা বা খাকী রঙের জমকালো উর্দির হিংস্র আড়ম্বর। পথে পথে সুসজ্জিত পুলিসবাহিনীর উদ্যত সুদীর্ঘ লাঠির ভয়ঙ্কর চলন্ত প্রদর্শনীর মধ্যে পত্রহীন উলঙ্গ বনানীর উদ্ধত রুক্ষতা নীবিড় ও কুটিল হয়ে ফুটে ওঠে; মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যালোকে বন্দুকের মাথায় মাথায় সঙ্গিনের শাণিত ফলার শুভ্র তীক্ষ্ণতার গায়ে পলকে পলকে বিষাক্ত নাগিনীর লোলুপ রসনার পিচ্ছিল বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে খেলে যায়।

গতির সঙ্গে গতির প্রতিযোগিতা চলছে। ঝঞ্চার মত উদ্দাম ঘটনার দ্রুতগতিকে অনুসরণ ক'রে উন্মত্ত কর্তৃত্ব বিদ্যুতের বেগে ছুটে চলেছে। পদচারী পুলিসবাহিনী দিয়ে কাজ আর চলে না,—যান্ত্রিক-বাহিনী যন্ত্রযানে চ'ড়ে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পথে পথে আজ ত্রিপলের ঘেরাটোপ দেওয়া সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত মোটর লরি,—বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত তাদের রঙ, সহস্রচক্ষু দেবতার ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষের ক্রূর দৃষ্টির মত তাদের সর্বাঙ্গের অগণিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গুলিভরা বন্দুকের ঝক্‌ঝকে শাণিত ডগাগুলি উদ্যত হয়ে রয়েছে। গলিতে গলিতে গোরা সার্জেন্টের মোটর-সাইকেল হুংকার দিয়ে সিংহবিক্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—ওদের আরোহীদের মাথায় লোহার টুপি, হাতে গুলিভরা পিস্তল, চোখে শ্যেনপক্ষীর মত তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি।

ক্রিয়ার পিছনে চলেছে প্রতিক্রিয়া। ক্লান্তি কোন পক্ষেরই নেই। দিন আর রাতের স্বাভাবিক পার্থক্যও এখন যেন দূর হয়ে গিয়েছে।

জয়ধ্বনির প্রত্যুত্তরে লাঠি চলছে, টিলের প্রত্যুত্তরে চলছে গুলি। এক-একটা অবরোধ বা পরিখার কাছে এসে পুলিসের গাড়ি পথ না পেয়ে থেমে যাচ্ছে; দলে দলে সিপাই আর সার্জেণ্ট নেমে পড়ছে; কাছাকাছি যাকেই চোখে পড়ছে তাকেই তারা ধ'রে এনে তার ঘাড়ের কাছে পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে তাকে দিয়েই ওই অবরোধ ভাঙিয়ে রাজপথ মুক্ত করিয়ে নিচ্ছে।

শহরের সর্বত্রই একটা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। কি যেন একটা অদৃশ্য চুম্বকশক্তির আকর্ষণে স্থানে স্থানে জনতা জ'মে ওঠে, পুলিসের গাড়ি বীরদর্পে রাজপথ কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ছুটে আসে, কোথা থেকে যেন ছোট একটি টিল বা বড় জোর একখানা মাত্র ইট ওই গাড়ির উপরে বা কাছে এসে পড়ে, পরক্ষণেই পুলিসের হাতের বন্দুক গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে গর্জন ক'রে ওঠে। সন্ত্রস্ত জনতা কোলাহল ক'রে ছুটে পালিয়ে যায়, হুঙ্কার দিয়ে গাড়িও চ'লে যায় তার নিজের কাজে। আহতের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আর্তনাদ ওই গুরুগম্ভীর নিনাদকে ছাপিয়ে উপরে উঠতে পারে না, কেবল রাজপথের কালো পাথর মানুষের রক্তে স্নান ক'রে ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠতে থাকে।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মতই সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রেড-ক্রশ ছাপ-আঁকা অ্যাম্বুলেন্স-গাড়ি হত ও আহতের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

মহানগরীর বুকের উপর যেন মুক্তজটা নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য চলছে।

পথের দিকের খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা গত দুই দিনে অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখেছে; বাসার চাকর আর প্রতিবেশীদের মুখেও সে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনেছে। শহরের খবরের কাগজগুলি কদিন থেকেই বন্ধ। সুতরাং অধিকাংশ সত্যই লোকের মুখে মুখে পল্লবিত ও কল্পনার রঙে অতিরঞ্জিত হয়েই তার কাছে এসেছে। তার নিজের কল্পনাও ওর উপর অন্য রঙ ছড়ায় নি।

কাজেই কমলার মুখে শহরের ওই অস্বাভাবিক অবস্থার উল্লেখমাত্রেই

সুভদ্রার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। তার পর সারা সকালটাই সে উন্মনা হয়েই রইল।

বেলা দশটার কাছাকাছি সে পথের দিকের জানালা খুলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। তেমন ভয়ঙ্কর কিছু তার চোখে পড়ল না। কলকাতা আজ অপেক্ষাকৃত শান্ত। দু-একখানি মাত্র পুলিসের টহলদার গাড়ি পথ দিয়ে তীরবেগে ছুটে চ'লে গেল। তথাপি সুভদ্রা ওই খোলা জানালার ধারেই পাথরের মূর্তির মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। পাশেই দোলনার উপর তার খোকা চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল, কিন্তু তাতেও সুভদ্রার ধ্যান ভাঙল না।

ভাঙল কমলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীব্র ভর্ৎসনায়।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতেই কমলা বোধ করি খোকার কান্না শুনতে পেয়েছিল; এক-এক বার দু-দুটো সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল সে। কিন্তু সুভদ্রার অবস্থা দেখে দোরের কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে ডাকলে, শুভা!

সুভদ্রা চমকে ফিরে তাকাল, তার চোখ দুটিতে তখনও স্বপ্নের ঘোর লেগে রয়েছে।

কিন্তু তাই দেখেই কমলা আরও চ'টে গেল; গলার স্বর আরও এক পরদা উঁচুতে চড়িয়ে সে বললে, শুভা, তুই কি? খোকা যে কেঁদে সারা হয়ে গেল। রাত্রেই না হয় ঘুমিয়ে ম'রে ছিলি তুই। কিন্তু এখন? এখনও কি ওর কান্না তোর কানে যায় না?

সুভদ্রা লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে; আড়চোখে রোরুদ্যমান শিশুর মুখখানা একবার দেখে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, একটু কাঁদুক না,— কাঁদলে তো ফুসফুসের ব্যায়াম হয়। কেন? বইতে পড়ি নি আমরা যে, শিশু কাঁদলেই তাকে খাবার বা আদর দিতে নেই!

তুই থাম্।—কমলা ধমক দিয়ে সুভদ্রাকে থামিয়ে দিলে; ছুটে গিয়ে খোকাকে বুকে তুলে নিলে সে; তার পর জলন্ত দৃষ্টিতে আবার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার কাছে আর তোর বিদ্যে ফলাতে হবে না। বই-পড়া বিদ্যে দিয়ে উনি ছেলে মানুষ করবেন, তবেই হয়েছে আর কি!—

বলতে বলতে খোকাকে নিয়েই দুম দুম ক'রে নিজের ঘরে চ'লে গেল সে।

কিন্তু মিনিট পনরো পর আবার এ ঘরে এসে রুক্ষ কণ্ঠে সে বললে, খোকাকে তেল মাখানো, নাওয়ানো—এ সব কিছুই এখনও হয় নি তো?

সত্যিই হয় নি।—ঘড়ির দিকে চেয়ে সুভদ্রা চমকে উঠল। কেমন ক'রে সময় কেটেছে সে তা জানতেও পারে নি, এমনি উন্মনা হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে ফেলেই সে উত্তর দিলে, না, হয় নি। ভাবলাম যে, আমার হাতের কাজ তোমার তো পছন্দ হবে না, বকুনি আমায় খেতেই হবে। কাজেই কাজ না ক'রেই বকুনি খাওয়া ভাল।

উত্তর শুনে কমলাও হেসে ফেললে; হাসতে হাসতেই বললে, আচ্ছা, হাতের কাজ সারি আগে; তার পর পেট ভ'রে তোমায় বকুনি খাওয়াব, দেখব কত খেতে পার তুমি।

পা ছড়িয়ে তেলের বাটি নিয়ে কমলা তখনই খোকাকে তেল মাখাতে বসল। কাছে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা কিছুক্ষণ তার কাজ দেখলে; তার পর প্রায় তার গা ঘেঁষে ব'সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তার সেন কি বললেন, কমলা? তোমায় ডেকেছিলেন কেন?

কমলার ভিতরটা তখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে; সে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, বললেন একটা কেসের কথা। টাইফয়েডের রোগী, অনেক দিন হাতে থাকবে। দক্ষিণাও বললেন ভালই পাওয়া যাবে। আমায় ডেকেছিলেন কেসটা আমায় দেবেন ব'লে।

তুমি রাজী হয়ে এসেছ?—সুভদ্রা আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

কমলা ঘাড় নেড়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, না, আমি ব'লে এসেছি যে, আমি পারব না।

সুভদ্রা স্তব্ধ হয়ে গেল। কারণটা মনে মনে সে আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ক্ষোভের স্বরে সে বললে, ভাল কর নি, কমলা; এত বড় একটা কেস, এতগুলো টাকা পাওয়া যাবে, এটা ছেড়ে দেওয়া—

কথাটা সে শেষ করতে পারলে না, শূলের মত কমলার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মুখের উপর এসে পড়তেই থতমত খেয়ে থেমে গেল সে।

কমলা বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি তো কেবল টাকাটাই দেখছ। কিন্তু আমি দেখছি যে, এই কেসটা হাতে নিলে রাত্রেও আমায় রোগীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। তখন খোকাকে দেখবে কে? তুমি?

কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক পর জলে-ধোওয়া এক সাজি জুঁইফুলের মত সদ্যস্নাত শিশুকে বুকে নিয়ে কমলা যখন স্নানের ঘর থেকে বের হয়ে এল, তখন বিরক্তি আর অপ্রসন্নতার শেষ রেখাটি পর্যন্ত তার মুখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। হাসিমুখে সুভদ্রার কাছে এসে উৎফুল্ল স্বরে সে বললে, দেখ, দেখ সুভদ্রা, কি সুন্দর!

সুভদ্রা হেসে খোকাকে কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু কমলা তৎক্ষণাৎ অনেকটা পিছনে স'রে গিয়ে কুটিল কটাক্ষে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, ইস্, অমনি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা! কেন? ওর উপর তোর দাবি কিসের? পেটে ধরলেই বুঝি মা হওয়া যায়? ওকে মানুষ করছি তো আমি,—ও তো আমার।

সুভদ্রার সহাস্য মুখখানি আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সে সায় দিয়ে বললে, ঠিকই তো, আমিও তো সেই কথাই বলি। ওর জন্মের আগেই ওকে তো তোমায়ই দিয়ে রেখেছি আমি।

কমলা উত্তর দিলে না; মুখ নামিয়ে খোকার কপালে আলগোছে একটি চুমো খেয়ে এগিয়ে সুভদ্রার কাছে এসে বললে, নে, তোর ছেলেকে তুই নে। আমি স্নানটা সেরে আসি এই ফাঁকে।

সুভদ্রা হাসিমুখে খোকাকে বুকে তুলে নিলে। কিন্তু বৈকালে চা খাবার পর হঠাৎ সে রীতিমত গম্ভীর হয়েই কমলাকে বললে, ঠাট্টা নয়, কমলা, খোকাকে নেবে তুমি? নিয়ে ছুটি দেবে আমায়?

কথাটা বুঝতে না পেরে কমলা হতবুদ্ধির মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ওই দৃষ্টিটা সইতে না পেরেই যেন সুভদ্রা চোখ নামিয়ে নিলে; কুণ্ঠিত স্বরে বললে, সত্যি বলছি, ভাই, ছুটি দেবে আমায়? আমার মনটা বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। খোকাকে যদি তুমি রাখ তো আমি এক বার হুগলী যেতে চাই।

এবারও কথাটাকে বুঝতে না পেরে কমলা বিহ্বল স্বরে বললে, কি ? কি বলছিস তুই ?

বললাম তো।—কমলা ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, এক বার হুগলী যেতে চাই।

কেন ?

ব'সে ব'সে আর ভাল লাগে না। কাজকর্ম ছেড়ে কত দিন ঘরের কোণে বন্দী হয়ে রয়েছি, এক বার মনে কর তো! এবার কাজে ফিরে যেতে চাই আমি।

কিন্তু কি কাজ ?—কমলা আরও বেশি বিহ্বল হয়ে বললে, কি কাজের কথা বলছিস তুই ?

কুণ্ঠিত ভাবে একটু হাসলে সুভদ্রা; চোখ নামিয়ে বললে, দেখছ না, কমলা, বাইরে কি হচ্ছে! এ সময়ে ঘরের মধ্যে ব'সে কি থাকা যায়!

কি!—কমলা তথাপি বিহ্বলের মতই বললে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনের সব কুয়াশাই যেন কেটে পরিষ্কার হয়ে গেল। হঠাৎ শিউরে উঠল সে; ভুরু বেঁকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে, শুভা!

সুভদ্রার মাথাটা আরও নত হয়ে পড়ল; কিন্তু মুখের হাসিটুকু বজায় রেখেই সে বললে, আচ্ছা, বেশি দিন না হয়, শুধু হপ্তাখানেকের ছুটি দাও আমায়। ওখানে কে কেমন আছে দেখেই চ'লে আসব আমি। এই কটি দিনের জন্য খোকার ভার নিয়ে ছুটি দেবে আমায় ?

কিন্তু কথাটা সে শেষ করবার আগেই কমলা তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললে, গাজনের বাদ্য শুনেই তোর পিঠে সুড়সুড়ি শুরু হয়েছে বুঝি ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—এমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারলি তুই ? মা হয়ে এমন কচি শিশুকে আর এক জনের হাতে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবার কথা অনায়াসে তুই মনে ভাবতে পারলি ? ঝাঁটা মারি এমন দেশপ্রীতির মুখে।

সুভদ্রা কুণ্ঠিত ভাবে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা না শুনেই কমলা আবার বললে, না, বাপু, তোমার সঙ্গে বাস করতে গেলে আমিও পাগল হয়ে যাব। তুমি যাও, যেখানে তোমার প্রাণ চায়, সেখানেই চ'লে যাও তুমি। কিন্তু তোমার ছেলেকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও, তোমরা দুজনেই

চির কালের মত মুক্তি দিয়ে যাও আমায়। মা গো, মা, এমন রাক্ষুসী মানুষ জগতে থাকতে পারে তা যে আগে আমি কল্পনাও করতে পারি নি!

কথা তো নয়, যেন তুবড়ি থেকে আগুনের ফুলকি সব থোকায় থোকায় ছড়িয়ে পড়ছে। সুভদ্রার দিক থেকে কোন সাড়া না এলেও কমলা আপন মনেই বকতে বকতে কিছুক্ষণ পর বাড়ি ছেড়েই চ'লে গেল।

ফিরে এসে সুভদ্রার সঙ্গে ভাল ক'রে সে কথাই বললে না, অন্যান্য দিনের মত খোকাকেও সে তেমন আদর-যত্ন করলে না। পরদিন ভোরে উঠেই সাজগোজ ক'রে সে 'কাজ আছে' ব'লে বাইরে চ'লে গেল। ফিরে এল বেলা দশটার পর।

কিন্তু বাড়িতে ফিরেই সোজা সে সুভদ্রার কাছে চ'লে গেল। সুভদ্রা কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই নিজে থেকেই সে বললে, ডাক্তার সেনের সেই কেস্‌টা আমিই হাতে নিলাম, সুভদ্রা; মীরার সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে কাজ করব। ভেবে দেখলাম যে, অতগুলো টাকা এ দুর্দিনে ছেড়ে দেওয়া মোটেই সমীচীন হবে না।

সুভদ্রা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কমলার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর হেসে ফেলে বললে, বেশ করেছ, আমিও তো তোমায় নিতেই বলেছিলাম।

আমিও সেই জন্যই নিয়েছি।—কমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন। বাইরে গাধার খাটুনি খাটবার পর বাসায় এসে আবার তোমার খোকার পরিচর্যা করতে পারব না আমি। ও কাজ এখন থেকে তোমাকেই করতে হবে।

ওটা কথার কথা যে নয়, বোধ করি, তাই প্রমাণ করবার জন্যই খোকার দিকে এক বার চেয়েও দেখলে না সে। কথাটা শেষ ক'রেই গম্ভীর ভাবে সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

দিন দুই পরের কথা।

বৈকালে সুভদ্রা তাদের বসবার ঘরে ক্যানভাসের চৌকিটার উপর পা গুটিয়ে ব'সে খোকার জন্য একটা পশমের জামা বুনছিল। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কমলা দুপুরে খাওয়ার পরেই সেই টাইফয়েডের রোগীটির পরিচর্যা

করতে চ'লে গিয়েছে। চাকর দাশু ছুটি নিয়ে গিয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে। খোকা এক পেট দুধ খেয়ে দোলনার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট বাড়িখানি নিস্তব্ধ, নিঝুম। সুভদ্রা অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পশম বুনে চলছিল।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে চমকে উঠল।

আওয়াজটা নূতন রকমের। সুভদ্রা বুঝতে পারলে যে, চাকরের হাতের কড়া নাড়ার আওয়াজ ওটা নয়, কমলাও ও রকম ক'রে কড়া নাড়ে না। বিস্মিত হয়ে উঠে গিয়ে দোর খুলে দিলে সে। কিন্তু বাইরে আগন্তুকের উপর চোখ পড়তেই হঠাৎ তার সারা শরীরটাই যেন পাথর হয়ে গেল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অরুণাংশু, সিঁড়ির আবছায়া আলোকেও তাকে সে নিঃসংশয়েই চিনতে পারলে।

প্রায় এক মিনিট কাল দুজনের কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। তার পর অরুণাংশুই বার-দুই ঢোঁক গিলে কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে বললে, আসতে পারি?

সুভদ্রা চমকে উঠল,—আওয়াজ তো নয়, যেন বিদ্যুৎ-অনুপ্রেরিত একটা তারের ছোঁয়া লেগেছে তার গায়ে। দু পা পিছনে স'রে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলে সে; অস্ফুট স্বরে বললে, এস।

কিন্তু দোরের কাছ থেকে বসবার ঘর পর্যন্ত যেতে যেতেই নিজেকে সামলে নিলে সে। ঘরে গিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। সুভদ্রার মুখে উত্তেজনার চিহ্নমাত্রও নেই, বিস্ময়ও নেই; যেন অরুণাংশুর আসাটা তার কাছে অসাধারণ কোন ঘটনা নয়, যেন রোজই এই সময়ে অরুণাংশুকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে আসতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

ঠিক অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়েই অকম্পিত স্বরে সুভদ্রা বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

তার পরেই ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে সে আবার বললে, বউ কোথায়? তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?

চোখের পাতা দুটির সঙ্গে সঙ্গে অরুণাংশুর সমগ্র মুখখানিই নত হয়ে পড়ল। তার কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর ফুটল না।

কিন্তু সুভদ্রার চোখ-মুখ আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; ছেলেমানুষের মত কতকটা আবদার, কতকটা অভিমানের স্বরে সে বললে, না, এ তোমার ভারি অন্যায়। কত দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি! কেন, বউকে নিয়ে এলে না কেন ?

অরুণাংশুর মাথাটা আরও নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, কিন্তু এ বার সে জোর ক'রেই চোখ তুলে মুখখানা হাসবার মত ক'রে বললে, বউ নেই, তাই আনি নি।

নেই !—সুভদ্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল,—তার মানে ?

তার মানে, বউ নেই। বিয়ে হ'লে তবে তো বউ থাকবে।

বিয়ে হয় নি এখনও ?

না, যে বিয়ের কথা তুমি বলছ তা এখনও হয় নি, পরেও হবে না।

সুভদ্রা বিহ্বল স্বরে বললে, কিন্তু—কিন্তু আমি যে শুনলাম—

তুমি ঠিকই শুনেছিলে।—অরুণাংশু বাধা দিয়ে মুচকি হেসে উত্তর দিলে, শুনতে ভুল হয় নি তোমার। তবে আমার বিয়ে যে হয় নি, সে কথাও ঠিক। আসল কথা এই যে, সে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে !—সুভদ্রা টেনে টেনে অস্ফুট স্বরে বললে, কেন, কেন বিয়ে ভেঙে গেল ?

অরুণাংশু এ বার চোখ নামিয়ে নিলে, মৃদু স্বরে বললে, থাক্‌, সে কথা তুমি না-ই শুনলে।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সুভদ্রার মুখে কোন কথাই ফুটল না ; কিন্তু অরুণাংশু আবার কি একটা কথা বলবার উপক্রম করতেই সে বাধা দিয়ে আগ্রহের স্বরে বললে, না না, সব কথা খুলে বল আমায়। কেন বিয়ে ভেঙে গেল ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে না দেখে সুভদ্রাই একটু পরে আবার বললে, না না, ঘাড় নাড়লে চলবে না ; সব কথা আমায় খুলে বলতেই হবে। নইলে ছাড়ব না তোমায়।

বলছি।—ব'লে অরুণাংশু ন'ড়ে চ'ড়ে সোজা হয়ে বসল ; তার পর সুভদ্রার

মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে সে আবার বললে, সব কথা তোমায় খুলেই বলব, নইলে আমার স্বীকারোক্তিও তো সম্পূর্ণ হবে না।

থেমে থেমে অরুণাংশু সকল কথাই খুলে বললে, এমন ভাবে বললে যেন অনুতপ্ত অপরাধী বিচারকের কাছে দোষ স্বীকার করছে। অনামিকাকে সে সত্যই ভালবেসেছিল; ভালবেসে তার নিজের জীবনের সকল কথাই, মায় সুভদ্রার কথাও তাকে সে খুলে বলেছিল; দু পক্ষের অভিভাবকেরাই উদ্যোগী হয়ে এ বিয়ের পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন, স্বয়ং অনামিকারও আপত্তি ছিল না। কাজেই এক বিয়ের দিনটা ছাড়া আর সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ কিছু না ঘটলে এত দিন হিন্দুমতে অনামিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েই যেত। কিন্তু তার আগেই মস্ত একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। মেয়ের নিজের বাড়িতেই তার নিজের আর তার বাপের চোখের সামনে সুভদ্রার সঙ্গে অরুণাংশুর দেখা হয়ে গেল।

সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে, ডান হাতের তালুর উপর মুখখানি রেখে সুভদ্রা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অরুণাংশুর গল্প শুনে যাচ্ছিল; প্রতুলবাবুর বাড়ির ঘটনাটা বর্ণনা করতে করতে অরুণাংশু হঠাৎ চুপ ক'রে গেল ব'লেই সুভদ্রা চমকে উঠে বিহ্বল স্বরে বললে, কেন? তাতে কি হ'ল? তাতে বিয়ে ভেঙে গেল কেন?

অরুণাংশু হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত শব্দ ক'রে হেসে উঠল; বললে, ভাঙবে না? অনু তোমায় চিনতে পেরেছিল যে, আর তার মুখ থেকে জানতে পেরেছিলেন তার বাপ। বাস্—আর কি! সম্ভ্রান্ত সমাজের ধার্মিক পিতা তখনই ঠিক ক'রে বসলেন যে, আমার মত চরিত্রহীনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি দেবেন না।

একটু থেমে সে আবার বললে, তোমার সঙ্গে সে দিন আমার দেখা তো হ'ল সন্ধ্যার একটু আগে। সেই রাত্রেই আমি চরমপত্র পেয়ে গেলাম; আর বাবা-মা এলাহাবাদে ব'সে পেলেন 'তার'।

এর পরেও সুভদ্রা কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত ব'সে রইল; তার পর মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, শেষে আমারই জন্য তোমার বিয়ে ভেঙে গেল!

অরুণাংশু ইতিমধ্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সুভদ্রার বিষণ্ণ

কণ্ঠস্বর তার কানে যেতেই সে চমকে সোজা হয়ে বসল; খুব জোরে মাথা ঝেঁকে সে বললে, না না, সুভদ্রা, তোমার জন্য আমার বিয়ে ভেঙে যায় নি,—ভেঙেছে আমার পায়ের শিকল। তোমার জন্যই সে দিন আমি চরমতম দুর্ভাগ্যের কবল থেকে অক্ষত দেহে বেঁচে আসতে পেরেছি।

কিন্তু অরুণাংশুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর বোধ করি সুভদ্রার কানেই গেল না; হঠাৎ অরুণাংশুর দিকে আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে আগ্রহের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বাপই না হয় বিয়ে ভেঙে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে,—অনামিকা দেবী? তিনি কি বললেন?

অরুণাংশু বিব্রত ভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, তা ঠিক বলতে পারি নে আমি। সে দিনের বৈকালের ঘটনার পর তার সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় নি।

দেখাই হয় নি!

না।

কেন? দেখা কর নি তুমি?

না, তা নয়; দেখা করতে চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু দেখা পাই নি।

সে কি কথা! কেন?

কারণ তিনি আমায় দেখা দেন নি।

তার মানে?

তার মানে সম্ভ্রান্ত ঘরের পিতৃভক্ত মেয়ে চরিত্রহীনের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন নি।—ব'লে অরুণাংশু সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

কিন্তু সুভদ্রা সে হাসিতে যোগ দিলে না। সে বিহ্বল স্বরে বললে, কি বলছ তুমি? অনামিকা দেবী নিজে তোমায় এই কথা বললেন?

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে বললে, না, তা তিনি বলেন নি; সামনা-সামনি কিছুই বলেন নি তিনি। তবে তাঁর ভাবটাও ওই রকমেরই হবে। তাঁর বাবার চরম পত্র পাবার পরেও তাঁর নিজের মুখের কথাটা শুনবার জন্য আমি তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম; কিন্তু উপর থেকে তিনি ব'লে পাঠালেন যে, দেখা হবে না।

সুভদ্রা আবার কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল;

তার পর হঠাৎ আগ্রহের স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তার পর? তার পর তার সঙ্গে আর তুমি দেখা করতে যাও নি?

আর দরকারও হয় নি।—সুভদ্রার চোখ এড়িয়ে অরুণাংশু উত্তর দিলে।

কেন? দরকার হয় নি কেন বলছ?

আমার দিক থেকে কোন তাড়া ছিল না। আর তিনিও পরদিনই বাপকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে চ'লে গেলেন একেবারে দক্ষিণে রামেশ্বরের দিকে, যাতে আমি বা আমার বাবা-মা আর তাঁদের ধরতে না পারেন।

সুভদ্রা আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল; তার পর অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সংশয়ের স্বরে বললে, ঠিক বলছ তো? এ ছাড়া আর কিছু হয় নি?

অরুণাংশু বিহ্বলের মত উত্তর দিলে, না, আর কিছু নয়। কিন্তু হবার মত বাকিও তো কিছু নেই!

উত্তরটাকে উপেক্ষা ক'রেই সুভদ্রা আবার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি বলছ? অনামিকা দেবী নিজে তোমায় কিছু বলেন নি?

না।

আর আগের কথা? আগে আমার সব কথা সত্যি তাকে তুমি খুলে বলেছিলে?

অরুণাংশুর মুখখানা হঠাৎ যেন বিবর্ণ হয়ে গেল; আহতের মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, ভালবেসে যে মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তার কাছে আমার জীবনের এমন একটা ঘটনা আমি গোপন রাখতে পারি, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?

সুভদ্রা অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; বললে, না, সে কথা বলি নি আমি। আমি শুধু বলছিলাম—

কথাটা সে শেষ করলে না; অরুণাংশুও শেষ পর্যন্ত শুনবার জন্য অপেক্ষা করলে না। একটি নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ স্বরে সে আবার বললে, তবে, হ্যাঁ, সব কথা নিশ্চয়ই বলা হয় নি আমার। তবে যা আমি জানতাম, তার কিছুই গোপন করি নি আমি।

সুভদ্রা কতকটা বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে রইল,

কিন্তু তার পর ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে সে। খাড়া শরীরটাকে চৌকির উপর এলিয়ে দিয়ে সে বললে, যাক, তেমন মারাত্মক কিছু তা হ'লে ঘটে নি। তবু ভাল। মা গো মা, কি ভয়ই তুমি আমায় পাইয়ে দিয়েছিলে! সত্যি, আমার জন্যই তোমার বিয়ে যদি ভেঙে যেত, তবে সারা জীবনেও আমার দুঃখ আর অনুতাপ ঘুচত না।

অরুণাংশু নিজেই এবার বিহ্বল হয়ে বললে, কি বলছ তুমি? তোমার জন্য বিয়ে অবশ্য ভাঙে নি, কিন্তু বিয়ে তো সত্যি ভেঙে গিয়েছে।

ছাই ভেঙেছে!—সুভদ্রা কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, ভিতরের আসল জিনিসটি যখন অক্ষত আর অক্ষুণ্ণ আছে, তখন বাইরের ফাটলটা জোড়া লাগতে খুব বেশি দিন লাগবে না।

তথাপি অরুণাংশু বিহ্বলের মতই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল দেখে একটু পরে সুভদ্রাই আবার বললে, দেখ, অনামিকা দেবীকে তো কাছে থেকেই আমি দেখেছি, কি ভালই যে তিনি তোমায় বেসেছেন তা আমি জানি। আর তার বাবাকেও আমি চিনেছি ব'লেই এ কথা জোর ক'রেই বলতে পারি যে, দু দিন আগে হোক আর পরে হোক, ওই মেয়ের মতেই আবার তাঁকে মত দিতে হবে।

একটু থেমে, ঘাড়টা একটু কাৎ ক'রে আবার কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে কৌতুকের স্বরে কথাটাকে সে শেষ করলে, তুমি দেখো, মালাচন্দন দিয়ে বরণ করবার জন্য দু দিন পর মিঃ গুপ্ত নিজেই আবার তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাবেন।

অরুণাংশু তখনও বিহ্বলের মত সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু সুভদ্রার শেষের কথাটা তার কানে যেতেই হঠাৎ তার মুখখানা এক বার লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। সবেগে মাথা নেড়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বললে, না না, সুভদ্রা, ও দিকের কিছুরই আমার আর দরকার নেই। জালের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে ফাঁস লেগে আমি মরতে বসেছিলাম, মুক্তি পেয়ে আমি তো বেঁচে গিয়েছি।

ইস্!—সুভদ্রা আবার ভ্রূভঙ্গী ক'রে বললে, মুখ দেখেই তা আমি বুঝতে

পেয়েছি। [illegible] মুক্তি পেলে তোমার ও-মুখের যা চেহারা হয় তা তো আমার অচেনা নয়! কাজেই তোমার মুখের কথায় ভুলব কেন আমি।

একটু থেমে, হাসি থামিয়ে হঠাৎ আবার সে ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে আবদারের স্বরে বললে, না না, ও সব মান-অভিমান নয়, ও ভাব তোমার বয়সে শোভাও পায় না। সুবুদ্ধি ছেলের মত তুমি ওঁদের ওখানে আবার যাও, নিজে নিতান্ত না পারলে তোমার মাকে আবার ওঁদের কাছে যেতে বল। এত দিনে ও দিকের ঝড়ঝাপটা নিশ্চয়ই শান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। আমায় কথা দিয়ে যাও তুমি।—না না, তোমার সঙ্গে আমার দেখা যখন হয়েছে, তখন তোমার কথা আদায় না ক'রে আজ আমি তোমায় কিছুতেই ছেড়ে দেব না। বল, ওঁদের ওখানে কবে যাবে তুমি? চল, না হয় আমায়ও সঙ্গে নিয়ে চল; মিঃ গুপ্তকে বুঝিয়ে আমিই শান্ত ক'রে আসব, একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন নিয়ে তবে ফিরব।

একটি নিশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে নিলে অরুণাংশু, সুভদ্রার কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠের অতগুলি কথার প্রত্যুত্তরে সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, তোমায় আমি সঙ্গেই নিয়ে যাব, শুভা, তবে ওঁদের বাড়িতে নয়, আমার নিজের বাসায়।

সুভদ্রা চমকে উঠল; হঠাৎ যেন হালকা একটু লালের ছোপ লেগে তার কালো রঙ বেগুনী হয়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে হাসতেই সে উত্তর দিলে, সে হবে অনামিকা দেবী তোমার বাসায় আসবার পর। এখন আগের কাজ আগে কর তো তুমি, ও দিকের গোলমাল মিটিয়ে তাকে আগে বাসায় নিয়ে এস। তার পর আমি নিজেই তোমাদের বাসায় গিয়ে ভরপেট খেয়ে আসব।

শেষের কথাটা জিভে তার জড়িয়ে গেল। কথা শেষ হবার আগেই আবার অরুণাংশুর চোখের সঙ্গে তার চোখ গিয়ে মিলেছিল, ওটা তারই প্রতিক্রিয়া। অরুণাংশুর মুখের চেহারা তখন বদলে গিয়েছে; অমন সোনার বর্ণ মনে হচ্ছে যেন কালো; দুই চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কেমন যেন একটা অসহায় কাতরতার ভাব। সুভদ্রার বিব্রত মুখখানির দিকে কয়েক সেকেণ্ড কাল আহতের মত চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে গাঢ় স্বরে ডাকলে, সু!

শুধু একটা কথা,—কথাও নয়, অস্ফুট একটা ধ্বনি মাত্র। কিন্তু ওই শব্দটি কানে যেতেই সুভদ্রার দেহের সবগুলি লোমই যেন এক সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল, এ সেই পুরাতন আহ্বান, এক অরুণাংশু ছাড়া আর কেউ কোন দিনই এ নামে তাকে ডাকে নি। ডাকটা কানে যেতেই তার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠল।

এ যা!—ব'লে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল সে; অরুণাংশুর দৃষ্টি এড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, চায়ের কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছি। ব'স তুমি, আমি এক্ষুনি চা ক'রে আনছি।

কিন্তু দোরের কাছে গিয়েই সে থমকে দাঁড়াল; ফিরে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সংশয়ের স্বরে সে আবার বললে, আমার সন্ধান কার কাছে পেলে তুমি? কে তোমায় আমার ঠিকানা ব'লে দিয়েছে? ডাক্তার বোস?

সুভদ্রার ভাব দেখে অরুণাংশু ক্রমেই যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সোজা প্রশ্নটাকে সে এড়াতে পারলে না। এক বার ঢোঁক গিলে সে বললে, না, ডাক্তার বোস এক বার একটা মেসের ঠিকানা আমায় দিয়েছিলেন, সে অনেক দিন আগে।

সেখানে গিয়েছিলে তুমি?

হ্যাঁ, সে প্রায় তিন মাস আগে। কিন্তু তখন সেখান থেকে তুমি চ'লে এসেছ, মেসের কেউ তোমার ঠিকানা জানেন না বললেন।

তার পর?

তার পর অনেক দিন তোমার কোন সন্ধান পাই নি।

কিন্তু আজ? আজ কেমন ক'রে খোঁজ পেলে? কমলা খবর দিয়েছে তোমাকে?

অরুণাংশু নিজেই এবার বিস্মিত হয়ে বললে, কমলা কে? পরে নিজেই সে আবার বললে, কমলাকে আমি চিনি নে। তোমার ঠিকানা আমায় দিয়েছে সুবোধ।

সুবোধবাবু!—সুভদ্রা হঠাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। এ বার এক নিমেষেই তার মুখখানা একেবারে যেন মড়ার মুখের মতই বিবর্ণ হয়ে গেল।

সেই মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে অরুণাংশু বললে, সব কথা আগে

শোন তুমি। তোমার নিষেধ ছিল ব'লে আগে সুবোধ আমায় কিছুই বলে নি। এ বারও প্রথমে কিছুই বলতে চায় নি সে। তার পর কথায় কথায় আমার বিয়ে হয় নি শুনে পরে বলেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার হয়ে তোমায় বলতে ব'লে দিয়েছে যে, তোমার মঙ্গলের কথা ভেবেই তোমার নিষেধ সে অমান্য করেছে।

শুনতে শুনতে সুভদ্রার শরীরটা আবার যেন পাথর হয়ে গেল। দৃষ্টিহীন নিশ্চল চোখ দুটি অরুণাংশুর মুখের উপর বিন্যস্ত ক'রে দোরের পাশেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দেখে অরুণাংশু আরও বেশি বিব্রত হয়ে পড়ল; আগের চেয়েও কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, সুবোধের দোষ নেই, শুভা, আমার পীড়াপীড়িতেই কথাটা সে খুলে বলেছে।

সুভদ্রা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; অস্ফুট স্বরে বললে, তা হবে। তার পরেই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তার সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল তোমার? হুগলীতে?

অরুণাংশু ঢোক গিলে উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

এখনও ওখানেই আছেন তিনি?

বোধ হয় না।—অরুণাংশু বেশ একটু ইতস্তত ক'রে বললে, সে দিন অকস্মাৎ তার সঙ্গে আমায় দেখা হয়েছিল। তার পর অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও আর তার দেখা পাই নি। বোধ হয় ওখানে আর সে নেই। পুলিসও তাকে খুঁজছে, কিন্তু পায় নি।

সুভদ্রা আবার চমকে উঠল; আবার আর্তনাদের মত ক'রে সে বললে, পুলিস খুঁজছে? কেন?

চারদিকে সব গোলমাল হচ্ছে কিনা!—অরুণাংশু আবার ঢোক গিলে উত্তর দিলে, আর তা ছাড়া ওখানে মজদুরদের হরতাল হয়েছিল, সুবোধই তাদের দিয়ে হরতাল করিয়েছিল।

হরতাল! সুভদ্রার চোখ দুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হরতাল হয়েছে ওখানে? চলছে এখনও?

না।—অরুণাংশু অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলে, দু দিন পরেই সে হরতাল ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছে! কেন ভাঙল?

উত্তরে অরুণাংশু সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়েই বললে, এ সব কথা এখন থাক্, শুভা; আর এক দিন সব কথা তোমায় বুঝিয়ে বলব। আপাতত স্থির হয়ে ব'স তুমি। তোমার সঙ্গে আজ অন্য কথা আছে আমার।

না।—বলতে বলতে সুভদ্রা যেন ভয় পেয়েই এক পা পিছনে স'রে গেল,—আমার সঙ্গে আর কি কথা থাকবে তোমার! হুগলীর কথাই বল তুমি। সুবোধবাবুকে পুলিস খুঁজছে বলছ, কিন্তু শ্যামাচরণদা? সে ভাল আছে তো?

অরুণাংশু আরও বেশি কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলে, শ্যামাচরণদা আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে।

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখ এর প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে আরও বেশি বিবর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু তার পর আবার তেমনি অকস্মাৎ তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তুমি? তুমি এখনও ধরা পড় নি যে?

অরুণাংশু প্রথমে অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু তার পর মুখ তুলে অল্প একটু হেসেই সে বললে, আমার ধরা পড়বার কথাও তো নয়। যে নীতির বিরুদ্ধে পুলিসের আক্রোশ, সেই মূল নীতিই তো অনেক আগেই আমি বর্জন করেছি। আর সুবোধ-শ্যামাচরণদা যা করতে চাচ্ছে, তার আমি বিরোধী। সে কথা পুলিস জানে। তোমারও তা মনে থাকবারই কথা।

সুভদ্রা আবার চমকে উঠে বললে, তা বটে।

তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিলে সে; অস্ফুট স্বরে আবার বললে, ব'স তুমি, আমি চা আনছি।

ব'লেই দোরের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, পাণ্ডুর মুখের উপর পাউডারের পাতলা একটা প্রলেপ লাগিয়ে আধঘণ্টাখানেক পর সুভদ্রা আবার যখন রান্নাঘরে ঢুকে জলন্ত

স্টোভটাকে নিবিয়ে দিলে তখন তার মুখের চেহারা আর এক বার বদলে গিয়েছে। পরনের কাপড়খানাকে বুকের চারদিকে এঁটে বেঁধে, আঁচলটাকে কোমরে গুঁজে চায়ের সরঞ্জামভরা বারকোশখানিকে সে হাতে তুলে নিলে।

কিন্তু বসবার ঘরে ঢুকবার মুখেই থমকে দাঁড়াল সে।

ভিতরে দোলার উপর খোকা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পরিবর্তন হয়েছে কেবল অরুণাংশুর। ইতিমধ্যে বসবার চৌকিখানাকে সে দোলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে ব'সে ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার পলক নেই, বাইরের জগৎটাকেই সে যেন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

কিন্তু হাতের চুড়ি আর পায়ের শব্দ শুনেই সে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই উঠে দাঁড়াল সে। মুখ ফিরাতেই সুভদ্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল; তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে দূরের আর একটা চৌকিতে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে পড়ল সে; কিন্তু জুতোর শব্দ হ'ল, অসাবধানে চৌকির ধাক্কা লেগে দোলাটি দুলে উঠল; আর ওইটুকুতেই জেগে উঠে খোকা ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।

ওই কান্নার শব্দ শুনেই সুভদ্রাও যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। চমকে এক বার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে সে। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে বেশ সহজ ভাবেই সে ভিতরে চ'লে এল। বারকোশখানা টেবিলের উপর নামিয়ে এমন সহজ আর শান্তভাবে সে দুধ-চিনি মিশিয়ে চা তৈরি করলে, যেন ইতিমধ্যে কিছুই ঘটে নি, অসাধারণ কিছুই তার চোখে পড়ে নি। চায়ের ভরা পেয়ালাটি অরুণাংশুর কাছে এগিয়ে দিয়ে অল্প একটু হেসে সে বললে, চা খাও। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার। তবু একটু অমলেট ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। চাকরটাও বাসায় নেই কিনা, আমার কপাল আর কি!

কিন্তু কথাটা শেষ ক'রেই পাশ ফিরে রোরুদ্যমান খোকাকে সে বুকে তুলে নিলে।

সে যেন র‍্যাফেলের ম্যাডোনা।

অরুণাংশু চায়ের পেয়ালায় হাতও দিলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে সে বললে, এ কথা আমায় জানাও নি কেন, শুভা?

সুভদ্রা অরুণাংশুর দিকে প্রায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, তথাপি প্রশ্নটা শুনে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আরও একটু দূরে স'রে গিয়ে মৃদু স্বরে সে বললে, আমি না জানালেও জানতে কিছুই তো তোমার বাকি নেই দেখতে পাচ্ছি!

কিন্তু আগে আমায় জানাও নি কেন? জানালে কাউকেই তো এত ভুগতে হ'ত না!

সুভদ্রা এ কথার আর কোন উত্তর দিলে না; বুকের উপরেই খোকাকে ধীরে ধীরে দোল দিয়ে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। অরুণাংশুর কথা সে যে শুনতে পেয়েছে, এমন কোন লক্ষণও তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

একটু পরে অরুণাংশুই আবার বললে, মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন, শুভা? চাও আমার দিকে, কথাটার উত্তর দাও।

সুভদ্রা উত্তর দিলে না, কিন্তু ফিরে তাকাল সে। তখন আর তার মুখের উপরে লজ্জা বা সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। বেশ সহজ ভাবেই এগিয়ে গিয়ে অরুণাংশুর সামনের চৌকিখানাতেই সে ব'সে পড়ল; আর সোজাসুজিই তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, এ কি, চা খাচ্ছ না যে? ও যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত চায়ের পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে নিলে; কিন্তু দু-তিন চুমুক খাবার পরেই পেয়ালাটা আবার পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে সে বললে, না, মস্ত ভুল করেছ তুমি। সে দিন, সেই হুগলীতে শেষ বার তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন এ কথা আমায় খুলে বল নি কেন?

সুভদ্রা অল্প একটু হেসে উত্তর দিলে, দরকার মনে করি নি, তাই বলিও নি।

দরকার মনে কর নি? কেন?

তোমার নিজের মুখ থেকে সত্য কথাটা শুনবার পর আমার অবস্থার কথা তোমায় জানাবার কোন সার্থকতা আমি দেখতে পাই নি।

না না, শুভা!—অরুণাংশু মাথা নেড়ে প্রতিবাদ ক'রে বললে, সার্থকতা ছিল, খুবই ছিল; সে দিন আভাসেও যদি এ কথা আমায় জানতে দিতে!

তা হ'লে আমায় আরও একটু বেশি অপমান করতে পারতে তুমি, না?

সুভদ্রার মৃদু, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। উত্তরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, ওর প্রত্যুত্তরে একটা কথাও অরুণাংশুর মুখে ফুটল না।

কিন্তু সুভদ্রা নিজে তার মুখের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসতে হাসতে আবার বললে, তোমার মনে বুঝি বড্ড ক্ষোভ র'য়ে গিয়েছে? আর মনের সেই ক্ষোভই বুঝি আজ তুমি মেটাতে এসেছ?

শুকনো জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটি এক বার চেটে নিয়ে অরুণাংশু টেনে টেনে বললে, আমায় এত ছোট তুমি ভাবতে পেরেছ, সুভদ্রা? সে দিন এ কথা জানতে পারলে আমি তোমায় আরও অপমান করতাম।

কি করতে, শুনি?—সুভদ্রা এবার শব্দ ক'রেই হেসে উঠে বললে, মানলাম, অস্বীকার তুমি করতে না। কিন্তু তোমার যে বুক থেকে ভালবাসা কর্পূরের মত উড়ে গিয়েছে, সেই বুকেই হতভাগিনীর জন্য করুণার বান ডেকে উঠত তো? শিক্ষিত পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান ঘুম ভেঙে জেগে উঠত তো? আর তারই অনুপ্রেরণায় পরদিনই রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে গিয়ে তুমি আমায় যথারীতি বিয়ে করতে। তার পর যে মেয়েকে এক দিন তুমি ভালবেসেছিলে অথচ আর বাস না, তারই প্রতি কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর যা কর্তব্য,—তাই জ্বরের রোগীর কুইনাইন খাওয়ার মত মুখ ক'রে আজীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন ক'রে যেতে! কিন্তু সে-ও কি সে মেয়েকে অপমান করা নয়? ভালবাসা আর কর্তব্য পালন করা কি এক?

অরুণাংশু অভিভূতের মত নির্বাক হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেখে সুভদ্রাই আবার বললে, আর কি করতে, শুনি? আমার অবস্থার কথা জানতে পারলেই তোমার মরা প্রেম প্রাণ পেয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠত না কি? দোহাই তোমার, অত বড় একটা অসম্ভব কথা অন্তত তুমি আমায় বিশ্বাস করতে ব'লো না।

অরুণাংশু আর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলে না; মুখ

ফিরিয়ে, সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ স্বরে সে বললে, তোমার সব তিরস্কারই আজ আমি মাথা পেতে নেব, সুভদ্রা, ভুল যখন আমি করেছি—

কিন্তু ভুল তো কর নি তুমি!—সুভদ্রা কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে ব'লে উঠল।

অরুণাংশু থতমত খেয়ে থেমে গেল। তার বিহ্বল মুখের উপর সহাস্য চক্ষের চটুল একটা কটাক্ষ হেনে সুভদ্রাই আবার বললে, ভুলের কথা কি বলছ তুমি? তোমার ভালবাসা তো সত্যি শেষ হয়ে গিয়েছিল, নইলে অনামিকা দেবীকে কি তুমি ভালবাসতে পারতে? না, সেটাও তোমার ভুল হয়েছিল বলতে চাচ্ছ?

না!—অরুণাংশু মুখ না তুলেই মৃদু স্বরে উত্তর দিলে, নিজের সাফাই গাইবার জন্য কোন কথাই আমি বলতে চাই নে। তুমি আজ যত শক্ত আঘাতই আমায় কর না কেন, সব আজ আমি মাথা পেতে নেব।

সুভদ্রা উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও নিজেকে সামলে নিলে; কয়েক সেকেণ্ড কাল অরুণাংশুর আনত মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত সে বললে, থাক্ এ সব কথা, কি থেকে কি সব কথা উঠে পড়ছে! তুমি চা খাও, অতীতের কথা তোলবার দরকারই নেই আজ।

খোকা ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল; সুভদ্রা কথাটা শেষ ক'রেই উঠে ঘুমন্ত খোকাকে আবার দোলনার উপর শুইয়ে দিলে। তার পর ফিরে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, এ কি! চা খাচ্ছ না যে তুমি?

কিন্তু চায়ের বাটির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে সে আবার বললে, ও হরি, চা যে জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গিয়েছে! থাক্ থাক্, ও চা খেতে হবে না তোমাকে। ফেলে নূতন গরম চা ঢেলে দিচ্ছি আমি।

ব'লেই চায়ের বাটিটা তুলে নিয়ে সুভদ্রা বাইরে বের হয়ে গেল। স্নানের ঘরে সেটাকে ধুয়ে তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ফিরে এল সে; কেৎলি থেকে গরম জল ঢেলে নূতন ক'রে চা তৈরি ক'রে তাতে দুধ-চিনি মিশিয়ে বাটিটা অরুণাংশুর কাছে এগিয়ে দিয়ে সে আবার বললে, চা খাও; দেখো, এ বার আবার নষ্ট ক'রো না যেন।

কিন্তু এ বারও দু-তিন চুমুক খাবার পরেই পেয়ালাটা পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে বললে, অতীতের কথা আজ আমিও তুলতে চাই নে, শুভা ; কিন্তু আমাদের জীবনের যোগসূত্রটি যে জায়গায় হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকেই আবার শুরু করতে চাই।

সুভদ্রার কানের কাছটা আবার ঈষৎ লাল হয়ে উঠল ; তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বললে, দূর—তা কি হয় !

হয়, হতেই হবে।—অরুণাংশু উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলে, হওয়াবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তোমাকে আমার সঙ্গে আজ যেতে হবে, শুভা ; আমি যথাবিধি তোমায় বিয়ে করব।

সুভদ্রা মুখ তুললে না, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ক'রেই বললে, না, তা হয় না।

অরুণাংশু চমকে উঠে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, হয় না !

না, হয় না।

কণ্ঠস্বর মৃদু হ'লেও তাতে অস্পষ্টতা ছিল না। সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে অরুণাংশু যেন ভয় পেয়ে গেল, আবেগ বা উত্তেজনার চিহ্নও তাতে নেই, আছে কেবল দৃঢ় সঙ্কল্পের সুস্পষ্ট ছাপ। সে মুখ যেন পাথরের তৈরি।

গৌরীশৃঙ্গের চূড়া থেকে হঠাৎ যেন তুষারের দমকা একটা ঝড় এসে অরুণাংশুর মুখের উপর আঘাত করলে।

জলে ডোবা মানুষের মত হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণাংশু বললে, কিন্তু আমি যে তোমায় নিতে এসেছি, শুভা।

সুভদ্রা উত্তরে বললে, তা হ'লেও তোমায় একাই ফিরে যেতে হবে।

তুমি যাবে না ?

না।

তোমায় পাব না আমি ?

না।

বিবর্ণ মুখে কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক হয়ে থাকবার পর অরুণাংশু হঠাৎ সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি, শুভা—

কি !—ব'লে সুভদ্রা চমকে অরুণাংশুর মুখের দিকে তাকাল ; শান-দেওয়া

ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ একটা দীপ্তি তার চোখ আর ঠোঁটের কোণে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে ফুটে উঠল।

অরুণাংশু যেন ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। বার দুই ঢোঁক গিলে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, আমি— মানে, আগে যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, আজ তোমায় আমি ভালবাসি।

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলে; কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠেই সে উত্তর দিলে, কিন্তু আমি বাসি নে।

বাস না!—অরুণাংশু আবার রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, তুমি আমায় ভালবাস না?

সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে বললে, না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে তাকাল সে; সোজা অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, ভালবাসলে মুখ বুজে আর এক জনের হাতে তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসতাম নাকি? আমি তো দেবী নই, আমি যে এই মাটির পৃথিবীরই রক্তমাংসের মানুষ।

বিহ্বল অরুণাংশুর মুখে এ বার উত্তর দূরে থাক্, অস্ফুট একটা শব্দও ফুটল না।

কিন্তু তার সেই মুখের দিকেই আরও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার পর সুভদ্রা আগের মতই টিপে টিপে হাসতে হাসতে আবার বললে, অবাক হয়ে গিয়েছ তুমি? হবারই কথা। অবস্থাটা প্রথম যে দিন বুঝতে পারি, সে দিন আমিও তোমার মতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শোন তবে, কথাটা খুলেই বলছি।

সত্যই বসবার চৌকিখানাকে সুভদ্রা অরুণাংশুর আরও একটু কাছে সরিয়ে নিয়ে বেশ জেঁকে বসল। তার পর কৌতূহলী শ্রোতার কাছে অভিজ্ঞ কথক যেমন সরস ক'রে গল্প বলে, তেমনি ক'রেই রসিয়ে রসিয়ে সে বললে, সেদিন হুগলীতে তোমার মুখে ও কথা শুনবার পর আমার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্ব'লে উঠেছিল। খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি নে—এমনি অবস্থা। জলেই ডুবব, না, গলায় দড়ি দেব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে ভিতরের জ্বলুনিটা ক'মে আসতে লাগল, আর তারই সঙ্গে

তোমায় ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাও। তখন মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলেই নিজেই তাকে বোঝাতে লাগলাম, যাক্ গে, আমায় ছেড়েই সে যখন বেশি সুখী হয়েছে, তখন তার সুখের কথা ভেবেই আমিও সুখী হব, কেবল ভালবেসেই আমার ভালবাসা সার্থক হবে,—এই সব শেখা কথা আর কি! ঘটনাক্রমে সুবোধবাবু আমার মুখ থেকে সব খবর জানতে পেরে যখন তোমায় সব কথা জানাতে চাইলেন, তখন হঠাৎ আমার মনটা একেবারে বেঁকে বসল। তিনি কত রকম ক'রে বোঝালেন, তাঁর বন্ধু অতি ভদ্রলোক, আমার হক্ আছে, এই সব। কিন্তু কিছুতেই আমার মন সায় দিলে না। তিনি আমার জীবনের ব্যর্থতার ইঙ্গিত করতেই আমি ফণা-ধরা সাপের মত ফোঁস ক'রে উঠে বললাম, যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি, তাতেই আমার বুক ভ'রে রয়েছে, তাই হবে আমার জীবনের অবশিষ্ট যাত্রাপথের পাথেয়,—যে সব কথা দিয়ে আগে নিজের মনকে বুঝিয়েছিলাম—সেই সব কথা আর কি! সুবোধবাবু চ'লে যাবার পর আমার মনটা যেন আরও শক্ত হয়ে উঠল; শেষে এমন হ'ল যেন কিছুই হয় নি। তোমাকে টেনে আনা দূরে থাক্, খুঁজে বের করবারও আর ইচ্ছে রইল না। তার পর ঘটনাক্রমে সে দিন মিঃ গুপ্তের ওখানে তোমার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। অনামিকা দেবীর বিয়ের কথা আগে যা শুনেছিলাম, তার সঙ্গে তোমার ওই আসাটাকে মিলিয়ে, দুই আর দুয়ে যোগ ক'রে বেশ বুঝতে পারলাম যে, অনামিকা দেবীর সঙ্গে তোমারই বিয়ের পাকা কথা আর আয়োজন ঠিক হয়ে আছে। ওই দু তিন মিনিটের মধ্যেই এ কথাও বুঝলাম যে, ইচ্ছে করলেই সেই দিনই তোমার ওই বিয়ে ভেঙে দিয়ে তোমায় আবার আমি দখল ক'রে নিতে পারি। কিন্তু সে রকম ইচ্ছের আভাস পর্যন্তও মনে এল না। অনামিকার মুখের দিকে চেয়ে কি আমার মনে হ'ল, জান? ঈর্ষা নয়, দিব্যি ক'রে বলতে পারি আমি, একটুও ঈর্ষা হ'ল না আমার। ব্যথা যা বোধ করলাম তা নিজের জন্য নয়, কেবল ওই অবুঝ মেয়েটির জন্য। আর জান? তোমার জন্য। মাইরি বলছি, তোমার সে দিনের সেই কালো মুখখানা মনে ক'রেই বুকটা আমার যেন ব্যথায় টনটন ক'রে উঠল। তক্ষুনি মন ঠিক হয়ে গেল আমার; ভাবলাম, আমার নিজের যা হবার সে তো

হয়েছেই, এদের দুজনের সুখের পথে আবার কাঁটা হতে যাব কেন? তাই কাউকে কিছু না ব'লে তক্ষুনি ওখান থেকে চ'লে এলাম আমি।

আর তবু তুমি বলছ যে, তুমি আমায় ভালবাস না!—অভিভূতের মত সুভদ্রার কাহিনী শুনতে শুনতে অরুণাংশু হঠাৎ তার কথার মাঝখানেই উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল।

সুভদ্রা বাধা পেয়ে থতমত খেয়ে থেমে গিয়েছিল; কিন্তু অরুণাংশুর চোখের দিকে চেয়েই হঠাৎ সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল এবং ওই হাসির ফাঁকে ফাঁকেই থেমে থেমে সে আবার বললে, শোনই না কথাটা আগে, ঠিক ওই কথাটাই তো সে দিন আমারও মনে উঠেছিল। তার পর কমলাকে সব কথা বলতে বলতেও অনেক দিন অন্যমনস্ক হয়ে আমি ভেবেছি, সত্যি আমিও দেবী হয়ে গেলাম নাকি, ওই যারা প্রিয়তমের সুখের জন্য নিজেদের নিঃশেষে মুছে ফেলে, অসন্তুষ্ট স্বামীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সতীনকে বরণ ক'রে ঘরে তোলে, কুষ্ঠরোগী অচল স্বামীকে কাঁধে তুলে নিয়ে যায় তার প্রিয়তমা বারবণিতার কুড়েঘরে, সে কাল ও এ কালের পুরাণ ও সাহিত্যের সেই সব মহিয়সী নারীর মত আমিও অতি-মানুষের পর্যায়ে গিয়ে উঠেছি নাকি! কিন্তু তার পর রহস্য কেটে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, দুর্বোধ্য সমস্যা সমাধান হয়েছে, নিজের বুকের মধ্যে তাকিয়েই সত্যটাকে অবশেষে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি আমি।

সুভদ্রা থামল। হাসি থামিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল সে। কিন্তু অরুণাংশুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রেই একটু পরে আবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে সে বললে, সত্যি বলছি তোমাকে, স্পষ্ট চোখে দেখেছি আমি। সেই যে তোমার মুখ থেকে কথাটা শোনবার পর আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠেছিল, সেই আগুনেই তোমার প্রতি আমার ভালবাসাও পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আজ তোমায় পাবার আকাঙ্ক্ষা আমার একেবারেই নেই, আর ঢাকের উল্টো পিঠের মত ভালবাসারই বিপরীত যে বিতৃষ্ণা, তা-ও নেই। আজ আমার বুকের মধ্যে আছে কেবল একটা নির্মম উপেক্ষা। আসল কথা কি, জান?—বলতে বলতে সুভদ্রার ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, আমার জীবন থেকে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়েই মুছে গিয়েছ।

শুনে অরুণাংশুর মুখের উপর বর্ণের শেষ আভাটুকুও একেবারেই মিলিয়ে গেল। পড়তে পড়তে নিজেকে যেন সামলে নিলে সে; চৌকির হাতা দুটি দু হাতে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে অসহায় চোখে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটিটিই মুখে তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসেই সবটুকু চা খেয়ে ফেললে।

তার পর পেয়ালাটি নামিয়ে রেখে আবার যখন সে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকাল, তখন সুভদ্রার নিজের মুখের হাসিও মুছে গিয়েছে। অরুণাংশুর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই এ বার কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে সে; অরুণাংশুকে কথা বলবার অবসর না দিয়েই নিজেই গম্ভীর স্বরে বললে, দেখ, আমার কথা শুনে হয়তো তোমার কষ্ট হচ্ছে। তবু আমার কথা বিশ্বাস যদি তুমি না কর, তবে ভবিষ্যতে আরও দুঃখ পাবে তুমি।

ভবিষ্যতের কথা থাক্।—বলতে বলতে অরুণাংশু সোজা হয়ে বসল, আজ কোন্ কথা তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বলছ? তুমি আমায় ভালবাস না, সেই কথা?

মাথাটা আরও একটু নীচু ক'রে সুভদ্রা উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

অরুণাংশু বললে, তা হ'লেও আমি তোমায় ভালবাসি। সেই অধিকারেই আজ আমি তোমায় দাবি করতে এসেছি।

এ বার বিব্রতের মত অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা বললে, কি দাবি করতে এসেছ তুমি?

তোমাকে—আমার সুভদ্রাকে আমি চাই।

তোমার সুভদ্রা!—বলতে বলতে সুভদ্রা হেসে ফেললে; কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে আবার বললে, কিন্তু তোমার সুভদ্রাকে পাবে কোথায় তুমি? সে তো ছ'মাস আগে ম'রে গিয়েছে।

কথাটা সে হাসতে হাসতে বললেও ওর সুরটা এমনি তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল যে, অরুণাংশু পরিহাস ব'লে ওকে উড়িয়ে দিতে পারলে না। বরং তার ভিতরে মরিয়া ভাবের যে জোরটুকু ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছিল, তা ওই হাসির আর কথার আঘাতেই এ বার যেন নির্জীব হয়ে এলিয়ে পড়ল। সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে সে বললে, এ তুমি কি বলছ, শুভা?

এও সত্য কথা।—সুভদ্রা হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, মানুষ এক নদীতে দু বার স্নান করতে পারে না, এ কথাও কি আজ তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

এও যেন কথা নয়, আর একটা নির্মম আঘাত। অরুণাংশুর মাথাটা এ বার একেবারেই গুলিয়ে গেল। কিন্তু ডানা-ভাঙা পাখীর মত অরুণাংশুর বিহ্বল চোখ দুটি ঘুরতে ঘুরতে ঘুমন্ত খোকার দোলার উপর গিয়ে পড়তেই হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সুভদ্রার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে আগ্রহের স্বরে সে বললে, থাক্ তবে, ভালবাসার কথারই আর দরকার নেই। এস, অন্য দশ জন সুস্থ, সহজ, বস্তুবাদী, সংসারী লোকের মতই ঘর-সংসার করব আমরা। সেই জন্যই আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়।

সুভদ্রা আবার বিব্রত ভাবে মুখ নামিয়ে নিলে, কুণ্ঠিত স্বরে বললে, ঘর-সংসার কি বলছ? ঘর-সংসারের কোন দরকার নেই আমার।

তোমার বা আমার দরকার না-ও যদি থাকে।—অরুণাংশু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, তা হ'লেও আমাদের সন্তানের জন্য তার দরকার আছে।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠে সুভদ্রা বললে, কি!

হ্যাঁ, দরকার আছে।—অরুণাংশু উত্তর দিলে, আমাদের সন্তানের জন্য,—আমার সন্তানের জন্য—ঘরসংসারের খুব দরকার আছে আমাদের। খোকার জন্যই আমাদের দুজনের সংসার পাততে হবে।

না, হবে না।—সুভদ্রা হঠাৎ যেন গর্জন ক'রে উঠল। অরুণাংশুর চোখ দুটি ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর গিয়ে পড়েছে দেখেই তার নিজের চোখ দুটি হঠাৎ যেন বাঘের চোখের মতই উজ্জ্বল আর হিংস্র হয়ে উঠল। গলার স্বর আরও এক পরদা উপরে চড়িয়ে সে আবার বললে, তোমার সন্তান কি বলছ তুমি? কে তোমার সন্তান?

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত মুখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, খোকা তো আমারও সন্তান!

তোমার সন্তান!—সুভদ্রা আবার গর্জন ক'রে বললে, প্রমাণ করতে

পার তুমি ? সমাজের কাছে, আদালতের কাছে, কারও কাছে এ কথা তুমি প্রমাণ করতে পার ? কোন্ অধিকারে আজ তাকে সন্তান ব'লে দাবি করছ তুমি ?

অরুণাংশুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তার এক বার মনে হ'ল যে, সুভদ্রা ক্ষেপে গিয়েছে ; এক বার সে ভাবলে যে, সে হয়তো স্বপ্ন দেখছে। যন্ত্রচালিতের মতই দুই হাতের তালু দিয়ে বার দুই চোখ মুছে বিহ্বল স্বরে সে বললে, প্রমাণের কথা কি বলছ তুমি, সুভদ্রা ? তুমি নিজেই তো জান যে, আমার কথা মিথ্যে নয়।—

সুভদ্রা তখনও যেন থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছিল। অরুণাংশুর কথার উত্তরে আগের মতই দৃপ্ত কণ্ঠে সে বললে, জানি ; কিন্তু আমার সেই জানাটাকেই আমারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রে আমার খোকাকে তোমায় আমি কেড়ে নিতে দেব না।

ব'লেই হঠাৎ সে আসন ছেড়ে উঠে ঘুমন্ত খোকাকেই বুকে তুলে অরুণাংশুর কাছ থেকে অনেক দূরে স'রে গেল।

অরুণাংশু প্রথমে চমকে উঠেছিল ; কিন্তু সুভদ্রার ওই অনাবশ্যক উত্তেজনা ও সতর্কতা লক্ষ্য ক'রে ওই অবস্থায়ও সে হাসি চাপতে পারলে না। নিজেও সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এ কি ছেলেমানুষি করছ, শুভা ! খোকাকে আমি কেড়ে নেব কেন ? নিজের সন্তানকে তার মায়ের কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয় নাকি ?

ততক্ষণে নিজের ব্যবহারের আতিশয্যটা সুভদ্রা নিজেই বুঝতে পেরে থাকবে ; তাই একটু কুণ্ঠিত হয়েই সে বললে, তবে কি চাও তুমি ?

আমার ছেলেকে আমি চাই।—অরুণাংশু ভিতরের মস্ত একটা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করতে করতে উত্তর দিলে, ওকে যে আমি ভালবাসি।

কি !

ব'লে সুভদ্রা অরুণাংশুর দিকে ফিরে তাকাল। হঠাৎ আবার চোখ দুটি তার ছুরির ফলার মত ঝক্‌ঝক্ ক'রে জ্ব'লে উঠল ; বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, কি বলছ, ওকে ভালবাস তুমি ?

বাসি বইকি!—অরুণাংশু কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে; এক বার ঢোক গিলে আবার বললে, সব বাপই তো সন্তানকে ভালবাসে।

বল কি!—কুটিল কটাক্ষে অরুণাংশুর মুখে দিকে চেয়ে, ঠোঁট দুখানা এক বিচিত্র ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুভদ্রা বললে, সব বাপই সন্তানকে ভালবাসে! যে সব বাপ তাদের সন্তানের অস্তিত্বের কথাটাও জানতে পারে না, তারাও?

খোঁচাটা তার মর্মস্থানে গিয়েই লেগে থাকবে হয়তো, অরুণাংশুর আনত মুখখানিও লাল হয়ে উঠল।

পরিবর্তনটা এতই স্পষ্ট যে, ওটা সুভদ্রার চোখ এড়াল না। একটু চুপ ক'রে থেকে সুর বদ্‌লে গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, দেখ, অশিক্ষিতা নার্স হ'লেও একেবারে বোকা তো আমি নই!—মতলব হাসিল করবার জন্য নিতান্ত উদ্ভট একটা কথা তুমি আমায় বিশ্বাস করাতে চেষ্টা ক'রো না। দুদিন আগে যার অস্তিত্ব দূরে থাক্‌, সম্ভাবনার কথাও তোমার জানা ছিল না, তারই দিকে দু-এক বার তাকাতেই বাৎসল্যরস তোমার বুকের মধ্যে উথলে উঠল, এ কথা তুমি হলপ ক'রে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

অরুণাংশু আহতের মত এক বার সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়েই পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে নিলে; ক্ষুব্ধ অস্ফুট স্বরে সে বললে, আমার নিজের সন্তানকে আমি ভালবাসতে পারি, আমার সম্বন্ধে এটুকুও কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

কিন্তু সুভদ্রা হেসে ফেললে; বললে, তুমি নিজেই জান যে, সে কথা আমি বলি নি। আমি শুধু বলেছি যে, নিজের সন্তান ব'লে যার নিবিড় সাহচর্য তুমি পাও নি, ভালবাসবার জন্য তাকে কাছে না পেলেও তোমার দিনের খাওয়া আর রাতের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না।

না হয় হবে না।—বলতে বলতে আবার মুখ তুললে অরুণাংশু, কিন্তু নিজের সন্তান ব'লে যাকে চিনতে পেরেছি, তার প্রতি পিতার যা কর্তব্য তা-ও কি তুমি আমায় পালন করতে দেবে না?

কর্তব্য!—সুভদ্রার কণ্ঠস্বর আবার বিদ্রূপে কঠিন হয়ে বাজল; নিবিড় বিতৃষ্ণায় ভুরু আর ঠোঁট বেঁকিয়ে প্রায় বিষাক্ত কণ্ঠেই সে বললে, এতক্ষণে

ঠিক পুরুষের সুরটি ধরেছ! পিতার কর্তব্য পালন করতে চাও তুমি? অন্ন-দাতার কর্তব্য? কিন্তু সে যে সত্যযুগের ইতিহাস গো!—যে যুগে পুরুষেরা মেয়েদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, হাত-পা বেঁধে তাদের চলৎশক্তিহীন ক'রে তার পর অবলা স্ত্রী আর অসহায় সন্তানের প্রতিপালক হবার গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু আমার এই খোকা তো সত্যযুগের দেবীর সন্তান নয়। তার মানুষী মা একাই যে গতর খাটিয়ে তাকে মানুষ ক'রে তুলবার শক্তি রাখে। তুমি তোমার পিতার কর্তব্যটুকু বিশ্ব-জনের চোখের সামনে ঘটা ক'রে সম্পন্ন না করতে পারলে তোমার নিজের অহঙ্কার ঘা খেয়ে মুষড়ে পড়তে পারে; কিন্তু তাতে খোকার যে কোন লোকসান হবে না এ কথা তুমি ঠিক জেনো।

শুনতে শুনতে অরুণাংশুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, উত্তরে কি একটা কথা বলবার উপক্রম ক'রেও কোন কথাই সে মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না। তথাপি ওর ঐ কালো মুখের দিকেই একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সুভদ্রাই হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে আবার বললে, এ সব বাজে কথা কেন বলছ তুমি? কান টেনে মাথাটাকে হাত করতে চাও? কিন্তু তা হবে না। জান তো, শেষ অঙ্কের অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর যবনিকা আর ওঠে না।

শেষের কথাটা শেষ হবার আগেই সুভদ্রা হঠাৎ চমকে উঠল, বাইরে কে যেন বন্ধ দ্বারে কড়া নাড়ছে। কান খাড়া ক'রে কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থাকবার পর ফিরে অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে সে মৃদু স্বরে বললে, ব'স তুমি, দেখি, কে আবার কড়া নাড়ছে! কিন্তু সাবধান, আর কোন লোকের সামনে কোন বেফাঁস কথা ব'লে ফেলো না যেন,—এইটুকু মাত্র দয়া আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি আমি।

কড়া নেড়েছিল তাদেরই চাকর দাশু; দোর খুলে তাকে দেখেই সুভদ্রার মুখের উদ্বিগ্ন ভাবটা কেটে গেল। রান্নাঘরের কাছেই দাশুর পথ আগলে দাঁড়িয়ে সে বললে, ভালই হয়েছে দাশু যে, তুমি সকাল সকাল ফিরে এসেছ। খোকাকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়েছি আমি। বাইরের এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি, আর ও থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। ঘরের মধ্যে

বড্ড গুমোট কিনা!—বোধ হয় সেই জন্যই। তা তুমি ওকে নিয়ে একটু ছাদে যাও তো, ভাই,—খোলা হাওয়ায় ও হয়তো শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

দাশু খোকাকে নিয়ে বের হয়ে যাবার পরেও সুভদ্রা কিছুক্ষণ ঐ দোরের কাছেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট পাঁচেক পর আবার যখন সে ঘরে ফিরে গেল, তখন তার মুখের উপরকার অসুস্থ উত্তেজনার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য অনেকটা কোমল হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সে; এক খানা চৌকির উপর অরুণাংশু নির্জীবের মত ব'সে রয়েছে; তার চোখ খোলা, কিন্তু তাতে দৃষ্টি আছে ব'লে মনে হ'ল না; সামনের টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালার গায়ে দু-তিনটি মাছি এসে বসেছে; আধ-খাওয়া অমলেটটি শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে; মনে হয়, যেন এক টুকরো চামড়া।

একটু ইতস্তত ক'রে সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, গোলমালে ভাল ক'রে চা-ই খাওয়া হ'ল না তোমার। আর একটু চা ক'রে আনব?

অরুণাংশু সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে বললে, না, চা আর নয়।

আবার একটু ইতস্তত করলে সুভদ্রা; কিন্তু তার পর বেশ শান্ত কণ্ঠেই সে বললে, তা হ'লে এবার তোমায় আমি উঠতে বলব। আমায় মাফ কর তুমি। দাশু ফিরে এসেছে, কমলাও কখন হয়তো এসে পড়বে। এদের কারও সঙ্গেই তোমার দেখা হওয়াটা আমার ইচ্ছে নয়।

অরুণাংশুর বিবর্ণ মুখখানি আরও যেন বিবর্ণ হয়ে গেল; আহত পশুর মত সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কাতর স্বরে সে বললে, যা তুমি বলেছ, তাই কি তোমার শেষ কথা, সুভদ্রা?

মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে সুভদ্রা উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

একেবারে খালি হাতে আমার ফিরিয়ে দেবে?

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সুভদ্রা উত্তর দিলে, কি দেব তোমায়? দেবার মত কিছুই তো আমার নেই।

অরুণাংশু গাঢ় স্বরে বললে, আশা আমি ছাড়তে পারছি নে শুভা, আজ না হোক, ভবিষ্যতেও তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না?

উত্তরে কুণ্ঠিত স্বরে সুভদ্রা বললে, ক্ষমার কথা কি বলছ তুমি? তোমার তো কোন অপরাধ হয় নি!

অরুণাংশু চমকে উঠল; তার ব্যথিত নিষ্প্রভ চোখ দুটি হঠাৎ যেন আশা ও উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন কথা বলবার আগেই সুভদ্রাই শান্ত গম্ভীর স্বরে আবার বললে, আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমায় দোষী ক'রো না তুমি। এক দিন অবশ্য তোমার বিরুদ্ধে মনটা আমার সত্যি বিষিয়ে উঠেছিল, মনে হ'ত যে, আমার প্রতি মস্ত একটা অবিচার করেছ তুমি কিন্তু তখন মনে আমার গর্ব ছিল, আর গর্ব ক'রে মনের সে কথা একদিন তোমায় আমি শুনিয়েও দিয়েছিলাম যে, আমার ভালবাসা কাচের মত ঠুনকো জিনিস নয়। কিন্তু আমার সেই ভালবাসাও যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন আজ কোন্ মুখে তোমায় আমি দোষী করতে যাব! করলে আমার নিজের নিষ্ঠীবন ফিরে আমারই মুখের উপর এসে পড়বে যে!

অরুণাংশুর চোখে মুখে যে আলোটুকু ফুটে উঠেছিল, তা আবার নিবে গেল। চৌকির একটা হাতা আর এক বার শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে, বার দুই ঢোক গিলে অনেক চেষ্টায় সে শুধু বললে. কিন্তু—এই কি সত্য কথা, সুভদ্রা?

একেবারে খাঁটি সত্য।—সুভদ্রা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত ক'রে দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে।

তার পরেই সোজা অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে সে আবার বললে, একটুও বাড়িয়ে বলি নি আমি, শুধু তোমায় কেন, আমার ঐ খোকা ছাড়া আর কাউকেই দেবার মত কিছুই আর আমার নেই নিজের বুকের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি আমি। ঐ যে আগুনের কথা তোমায় বললাম, ওতেই সব পুড়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা রসও আর আমার বুকে নেই। আছে কেবল কালো কালো কয়েকখানা অঙ্গার, দু·চারটি আগুনের ফুলকি, আর গাদা গাদা ছাই। ওখানে বীজ পড়লেও তা থেকে অঙ্কুর আর বের হয় না,—বীজটাই বরং আগুনতাতে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়।

একটু থেমে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে আবার বললে, না, তোমায় দেবার মত কিছুই আজ আর আমার নেই। এখান থেকে আজ তোমায় খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে।

অরুণাংশু কি একটা কথা বলবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু সুভদ্রার শেষের কথাটা শুনে নিজেকে সামলে নিলে সে; কয়েক সেকেণ্ড মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবার পর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, তা হ'লে এখন আমি আসি।

সুভদ্রা চমকে পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বললে, এস।

কিন্তু অরুণাংশু খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই সুভদ্রা ছুটে এসে তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল; তার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, দেখ, তোমায় আমি নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তোমার সঙ্গে কথা বলবারই মুখ নেই আমার। তবু তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষে চাইবার আছে। আমার একটা কথা তুমি রাখবে?

অরুণাংশু অপরিসীম বিস্ময়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি?

সুভদ্রা প্রথমে চোখ নামিয়ে নিলে; কিন্তু তার পর আবার অরুণাংশুর মুখের দিকে চেয়েই বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে সে বললে, দেখ, অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে ভাগ্যক্রমে কমলার কাছে এই আশ্রয়টুকু আমি পেয়েছি। তুমি এ বাসার খোঁজ পাবে, তা আমি ভাবি নি। কিন্তু খোঁজ তুমি পেয়েছ ব'লেই তোমায় আমি বলছি, তুমি আবার এখানে এলে আমাকেই এ বাসা ছেড়ে আবার অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতে হবে।

অরুণাংশু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর সশব্দে একটি নিশ্বাস ছেড়ে মৃদু স্বরে সে বললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সুভদ্রা; শুধু এ বাড়িতে কেন, পথে বের হ'লেও কোথাও তুমি আমার ছায়াও আর কোন দিন দেখতে পাবে না।

সুভদ্রা আর কোন কথা না ব'লে পথ ছেড়ে দিলে। কিন্তু অরুণাংশু চলবার উপক্রম ক'রেও থমকে দাঁড়াল; একটু ইতস্তত ক'রে সে আবার বললে, কিন্তু তোমার কাছেও আমার একটা অনুরোধ রইল, শুভা; কোন দিন কোন কারণে আমাকে যদি তোমার দরকার হয় সে দিন অসঙ্কোচে আমায় একটা খবর দিও তুমি। আমার নিজের বাড়ির দোর ভবিষ্যতে তোমার জন্য বরাবরই খোলা থাকবে।

অসহ্য গুমোট। হাওয়া আছে কি নেই বোঝা যায় না। আকাশে

পাঁশুটে রঙের মেঘ ঘন হয়ে জ'মে রয়েছে; নীচে পৃথিবীর মুখের উপরে তারই কালো ছায়া। ছাদ আর দেয়াল-ঘেরা ফ্ল্যাট-বাড়িতে সুভদ্রার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। অরুণাংশু চ'লে যাবার পরেও জানলার একটা লোহার শিক শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সুভদ্রা সেখানেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রায় মিনিট দশেক পর একটি নিশ্বাস ছেড়ে সে আবার তাদের বসবার ঘরেই ফিরে গেল। ঘর খালি, টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে; অমলেটের টুকরাটি এখন আর চোখে পড়ে না, এক ঝাঁক মাছির কালো পাখার নীচে খাদ্যবস্তুটি ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। দোরের কাছেই সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল; এক বার বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে সে; তার পর ছুটে গেল খোকার দোলার কাছে।

দোলা খালি; তার উপর চোখ পড়তেই সে চমকে উঠল। স্বতঃস্ফূর্ত অস্ফুট একটা আর্তনাদ তার মুখ থেকে বের হয়ে এল; পড়তে পড়তে টেবিলের কোণটা শক্ত ক'রে চেপে ধরলে সে; কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার বিবর্ণ মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল; খ'সে-পড়া আঁচলটাকে বাঁ হাতে কোমরের কাছেই চেপে ধ'রে সে ছুটতে ছুটতে ছাদে উঠে গেল। বাইরের দোরটাও যে খোলাই প'ড়ে রইল, তা সে লক্ষ্যই করলে না।

সন্ধ্যার পর ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরে কমলার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। রান্নাঘরে যেন এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন চলছে। চাল, তরকারি আর মসলা ঘরময় ছড়াছড়ি; একখানা থালায় খোসা-ছাড়ানো গোটা আলুর স্তূপ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে, আর একখানায় ফালি ফালি বেগুন। ঘরের কোণে দাশু কেবল পায়ের আঙুল কাটার উপর ভর দিয়ে ব'সে শিলের উপর উপুড় হয়ে মসলা পিষছে; সুভদ্রা নিজে এক ডেক্‌চি মাংসে দুই হাতে মসলা মাখাচ্ছে। মসলা মাখানো তো নয়, যেন কসরৎ। গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে, উননের আগুনের আভায় তার কালো মুখখানিও মনে হচ্ছে যেন টুকটুকে লাল।

এ কি ব্যাপার, শুভা!—কমলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

মুখ তুলে কমলাকে দেখেই সুভদ্রা হেসে ফেললে; হাতের কাজ বন্ধ ক'রে বললে, ভোজ—ভোজের আয়োজন করছি।

ভোজ!

হ্যাঁ গো, ভোজই তো। পোলাও, মাংস, দই, সন্দেশ—সব আমি আনিয়েছি। দেখছ না কেমন ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি শুরু হয়েছে? সারা রাত আজ জল হবে। আজ আমাদের ভোজ হবে না তো কি!—বলতে বলতে সুভদ্রা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

সে হাসির যেন আর বিরাম নেই। অবাক বিস্ময়ে আরও কিছুক্ষণ সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর কমলা হঠাৎ ভুরু বেকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, তা তুই আবার এ সব হাঙ্গামার মধ্যে এলি কেন? পোলাও-মাংস দাশু কি আর রাঁধতে পারে না! ওঠ্‌ শীগগির, হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে—

তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কমলা।—সুভদ্রা বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, আজকের রাতটা নিজের হাতেই রাঁধতে দাও আমায়। কিছু একটা না করতে পারলে আজ দম ফেটে মারা যাব আমি। তুমি ঘরে গিয়ে খোকার কাছে বোসগে। আমি ততক্ষণ—

ব'লেই চোখ নামিয়ে দুই হাত আবার মাংসের মধ্যে ঢুকিয়ে হঠাৎ সুর ক'রে সে গেয়ে উঠল, 'প্রেম নহে মোর মৃদু ফুলহার'—

রান্নাঘর আর স্নানের ঘরের মাঝামাঝি ছোট সরু রাস্তাটা পূব দিকে যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেটা এই ছোট বাড়ির বারান্দা। বারান্দা মানে দু জন বা বড় জোর তিন জন লোক পাশাপাশি দাঁড়াবার মত ছোট এক ফালি জায়গা, যেখানে দাঁড়ালে নীচের বস্তির খোলার চাল আর কাছাকাছি বড় বাড়িগুলির খোলা জানলার ভিতর দিয়ে অনেক গরিব আর মধ্যবিত্ত পরিবারের 'ছায়াসুনীবিড়, শান্তির নীড়' এক-একটি সংসারের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। রান্না শেষ ক'রে স্নানের জন্য স্নানের ঘরে যাবার পথে সেই বারান্দায় কমলাকে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুভদ্রাও থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কি দেখছ, কমলা?

নীচের বস্তিতে তখন একটা কোলাহল চলছিল, মেয়ে আর মেয়েতে কলহ,

—হয়তো এ বাড়ির বউয়ের সঙ্গে ও বাড়ির ঝিয়ের, নয়তো একই বাড়িতে শাশুড়ীর সঙ্গে বউয়ের কলহ। সুভদ্রার ডাক শুনে কমলা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল; বললে, না, কিছু না।

কিন্তু তখনই সুভদ্রার কাছে এগিয়ে এল সে; গলাটা একটু খাটো ক'রে আবার বললে, মা গো, মা, ছোটলোকের মত রাতদিন কি ঝগড়াই ওরা করতে পারে!

ছোটলোকের মত কি বলছ!—সুভদ্রা উত্তরে বললে, ওরা ছোটলোক ছাড়া আবার কি' আমাদের ভদ্রলোকের সংসারেই কি কাণ্ড হয়ে গেল আজ!—বলতে বলতে সে ফিক ক'রে হেসে ফেললে।

কমলা বিস্মিত হয়ে বললে, কোন্ ভদ্রলোকের সংসারে কি হ'ল আবার?

ওপাশের তেতলার ফ্ল্যাটে।—সুভদ্রা উত্তর দিলে, সেই ভদ্রলোকের বাসায় গো,—ওই যে মহিমবাবু না কি নাম! সন্ধ্যার একটু আগে দেখি কি না, স্বামী আর স্ত্রীতে কথা-কাটাকাটি চলছে। গলার আওয়াজ উপরে চড়তে চড়তে শেষে এমন কাণ্ড হ'ল,—মাগো মা, ওই মহিমবাবু ওই বউটার পিঠে, মুখে, গালে দুমদাম ক'রে কিল চড় লাথি— বলতে বলতে কথাটা শেষ না ক'রেই সুভদ্রা একেবারে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

কমলা কতকটা বিব্রত, কতকটা বিরক্ত হয়ে বললে, ও কি, সোয়ামী বউকে ধ'রে মেরেছে, তাই হ'ল তোর কাছে হাসির কথা!

হবে না!—সুভদ্রা আরও জোরে হেসে উঠে উত্তর দিলে, পাঁচ-পাঁচটি ছেলে-মেয়ের মা-বাপ ওরা, আরও একটি নাকি আবার পেটে এসেছে; অথচ— বলতে বলতে সুভদ্রা নিজের মুখের মধ্যে আঁচল পুরে দিয়ে পাশের দেয়ালের গায়ে ঢ'লে পড়ল।

কমলা নিজেও এ বার হাসি চাপতে পারলে না; তথাপি সুভদ্রার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে সে বললে, পোড়ারমুখী, তোর আজ হ'ল কি কালামুখে হাসি যে আর ধরছে না! কথায় কথায় হেসে ঢ'লে পড়ছিস! যা, গা ধুয়ে আয় শীগগির। কিন্তু এত রাত্রে মাথায় আবার জল ঢালিস নে যেন!

পরদিন সকালে চা খেতে ব'সে কমলা সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তোর মুখখানা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন, শুভা?

ধরা গলায় সুভদ্রা উত্তর দিলে, শরীরটা তেমন ভাল নেই আমার, গা-হাত-পা—

অ্যাঁ!—কমলা চক্ষের পলকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল; সুভদ্রার কপালে হাত দিয়ে সে বললে, এই তো! কাল পইপই ক'রে অত বারণ করলাম, তবু আগুনতাতে ব'সে,—তার পর অত রাত্রে আবার স্নান! জ্বরই হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

না, জ্বর নয়।—সুভদ্রা কুণ্ঠিত স্বরে বললে, অমনি শরীরটা ভার ভার হয়েছে।

থাক্।—কমলা ধমক দিয়ে বললে, ডাক্তারী আর তোমায় করতে হবে না। কিছু এখন মুখে দিস নে যেন—এক চা ছাড়া। আর সারা দিন চুপ ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকবি। নাওয়া, খাওয়া, চলা, ফেরা—সব আজ বন্ধ।

সে দিন সারাটা দিন সুভদ্রা শুয়েই কাটাল; রাত্রে কমলার সঙ্গে ভাল ক'রে সে কথাও বললে না। বার বার কপালে হাত দিয়ে, দু-তিন বার থার্মোমিটার লাগিয়ে তবে কমলা নিশ্চিন্ত হ'ল যে, সুভদ্রার জ্বর হয় নি। তথাপি সে দিন তার গেল উপোস। পরের দিন সে খেতে পেলে কেবল পাউরুটি আর দুধ। তৃতীয় দিন শুক্তোর ঝোল আর ভাত খেয়ে সুভদ্রা বললে, অনর্থক তিলকে তুমি তাল করছ, কিচ্ছু হয় নি আমার।

না হ'লেও সাবধান থাকতে হয়।—কমলা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলে, চার দিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে আজকাল। তুমি বিছানায় পড়লে খোকাকে দেখবে কে? আমি ওদিকে যে রোগী নিয়ে পড়েছি—

পরের দিন সকালের চায়ের সঙ্গেই দুপুরের খাওয়াটা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে কমলা সারা দিনের মত বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু খোকা তখনও তারই কোলে, দিই দিই ক'রেও তাকে সে সুভদ্রার কোলে নামিয়ে দিতে পারছিল না। কিছুক্ষণ হাসিমুখে এই দৃশ্য উপভোগ করবার পর সুভদ্রা অবশেষে অনুনয় ক'রে বললে, দাও, কমলা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কমলা খোকাকে সুভদ্রার কোলে ছেড়ে দেবার আগেই দাশু একখানা চিঠি আর একখানা পিয়ন-বই এনে সুভদ্রার হাতে দিলে।

সরকারী খামের মধ্যে হালকা চিঠি, এসেছে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল থেকে।

পিয়ন-বইতে সই ক'রে সুভদ্রা চিঠি রাখলে। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়তে পড়তে তার মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল।

কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কার চিঠি লো?

সুভদ্রার মুখে উত্তর ফুটল না, বরং তার কম্পিত হাত থেকে খোলা চিঠিখানা মাটিতে প'ড়ে গেল।

দেখে কমলার বুকটাও ধড়াস ক'রে উঠল; তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে সবটা প'ড়ে ফেললে সে।

সরকারী ভাষায় সংক্ষিপ্ত চিঠি। সুবোধ ব্যানার্জি নামক একজন যুবক গুলির আঘাতে আহত হয়ে দিন কয়েক আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, তার বর্তমান অবস্থা সঙ্কটজনক—বাঁচবার আশা একেবারেই নেই। নিজে সে সুভদ্রা দেবীকে এক বার দেখতে চায়; এই তার অন্তিম ইচ্ছা মনে ক'রে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সুভদ্রা দেবীকে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

পড়তে পড়তে কমলার মুখখানাও বিবর্ণ হয়ে গেল। তার সেই মুখের দিকে চেয়ে সুভদ্রা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, সুবোধবাবুর কথা লেখা রয়েছে না ওতে?

তাই তো দেখছি।—কমলা ঢোঁক গিলে উত্তর দিলে, কিন্তু এ চিঠি তো কালকের লেখা! হতচ্ছাড়ারা—

ততক্ষণে পিয়ন চ'লে গিয়েছে, কমলা গায়ের ঝাল মিটিয়ে তিরস্কার করা দূরে থাক্, একটা কৈফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করতে পারলে না।

কমলার হাত থেকে চিঠিখানা টেনে নিয়ে সুভদ্রা আর এক বার সেখানা পড়লে; তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যাই, কমলা।

কমলা চমকে উঠে বললে, তুমি যাবে?

কিন্তু সুভদ্রার মুখের উপর চোখ পড়তেই তার মুখের ভাব বদলে গেল। তৎক্ষণাৎ সে আবার বললে, চল, আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।

কিন্তু খোকা?

সেও আমাদের সঙ্গেই যাবে।—কমলা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে।

মিনিট পনরোর মধ্যেই দুজনে রওনা হয়ে গেল।

হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ করতেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, সুবোধ ব্যানার্জি আগের রাত্রে মারা গিয়েছে। একে পুলিস-কেস, তাতে আবার কেউ তার শবদেহ নিতে আসে নি, কাজেই সেটা হাসপাতালের মর্গেই রাখা রয়েছে।

খবর শুনে কমলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু সুভদ্রা বললে, আমি এক বার দেখতে পারি নে? এ চিঠি তো আপনারা আমাকেই লিখেছিলেন—

চিঠি দেখাতেই অনুমতি পাওয়া গেল। একজন ছোকরা কেরানী সুভদ্রা ও কমলাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আর দুটি লোক মর্গের কাছেই পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল, তারাও এদের পিছনে পিছনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মৃতদেহ সেখানে ছিল মাত্র একটি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটা দেহই একখানা কালো কম্বল দিয়ে ঢাকা। ডোম মুখের আবরণটুকু খুলে দিলে।

সে যেন সুষুপ্তের মুখ,—রোগের শীর্ণতা নেই, যন্ত্রণার বিকৃতি নেই, এমন কি, মৃত্যুর পাণ্ডুরতা পর্যন্ত চোখে ধরা পড়ে না; সৌম্য, সুন্দর এবং শান্ত সেই মুখ। ব্যর্থ জীবনের সকল বেদনা, সকল অতৃপ্তি, সকল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর সুগভীর শান্তির মধ্যে মহানির্বাণ লাভ করেছে।

সুভদ্রা পলকহীন চোখে সেই মুখের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু সঙ্গে যে কেরানীটি এসেছিল, সে অধৈর্য হয়ে উঠল। এমন দৃশ্য জীবনে সে অনেক দেখেছে। কিছুক্ষণ উসখুস করবার পর কমলাকে লক্ষ্য ক'রে সে ব'লেই ফেললে, আপনারা কি লাস নিয়ে যাবেন?

কমলার চোখে জল এসে গিয়েছিল; সে আঁচলের কোণ দিয়ে চোখ দুটি মুছে ফেলবার পর সুভদ্রার গা টিপে মৃদু স্বরে ডাকলে, শুভা!

সুভদ্রা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল; চমকে ফিরে তাকাল সে।

কেরানীটি এ বার তারই মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, লাস কি নিয়ে যাবেন আপনি?

সুভদ্রার নিষ্প্রভ চোখ দুটি চক্ষের নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে আগ্রহের স্বরে বললে, নিতে পারি আমি ?

আত্মীয় হ'লে পারেন—কেরানীটি খুব সহজ ভাবেই উত্তর দিলে।

সুভদ্রার চোখের আলো যেমন অকস্মাৎ জ্ব'লে উঠেছিল, তেমনি অকস্মাৎ নিবে গেল আবার।

কেরানীটির চোখে অবশ্য এ পরিবর্তন ধরা পড়ল না; সে সহজ ভাবেই আবার জিজ্ঞাসা করলে, উনি কে হন আপনার ?—স্বামী ?

সুভদ্রা আবার চমকে উঠল। চক্ষের নিমেষে তার কালো মুখখানি এক বার আগুনের মত লাল হয়ে উঠেই পরক্ষণেই আবার একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। চকিতে আর এক বার সুবোধের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেই দু'পা পিছনে সরে গিয়ে সে বললে, না, কেউ না; আত্মীয়ই নন উনি আমার, তার আবার—

কমলার মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে আবার বললে, চল, কমলা,—আমরা এখন যাই।

কিন্তু দোর পর্যন্ত আসবার আগেই আবার বাধা পড়ল। সেই যে দুটি লোক প্রাঙ্গণ থেকেই তাদের পিছু নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরই এক জন সুভদ্রার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, দয়া ক'রে একটু দাঁড়াতে হবে আপনাকে,—আপনার নামই কি সুভদ্রা দেবী ?

কেন বলুন তো ?—সুভদ্রা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে লোকটি বললে, আমাদের সঙ্গে আপনাকে এক বার পুলিস-আপিসে যেতে হবে।

আমাকে ? কেন ?

আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে,—মানে, আপনারই নাম সুভদ্রা দেবী যদি হয়।

উত্তরে অসহিষ্ণুর মত সুভদ্রা বললে, হ্যাঁ, আমারই নাম সুভদ্রা। কিন্তু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেন ?

লোকটি কুণ্ঠিত ভাবে চোখ নামিয়ে নিলে; পকেট থেকে এক তাড়া

কাগজ টেনে বের ক'রে ওদেরই একখানা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে পরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি হুগলীর জেম্‌সন টম্‌সন কোম্পানির কারখানার হাসপাতালে নার্স ছিলেন তো ?

সুভদ্রা মুখে উত্তর দিলে না, অভিভূতের মতই শুধু মাথা নেড়ে জানালে যে, কথাটা সত্য।

তখন অল্প একটু হেসে লোকটি বললে, তা হ'লে আমার ভুল হয় নি, সুভদ্রা দেবী,—আপনাকেই আমরা চাই।

সুভদ্রার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি,—তার মনে হচ্ছিল যে, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। বিহ্বল স্বরে সে বললে, কিন্তু কেন ? কি করেছি আমি ?

তা তো জানি নে।—ব'লে লোকটি থেমে গেল ; খুক্‌ ক'রে এক বার একটু কেসে, চকিতে সুভদ্রার মুখখানি আর এক বার দেখে নিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে আবার বললে, তবে বোধ হয় যে, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে ব'লেই এ দুর্ভোগ আপনাকে ভুগতে হবে।

কি বললেন ?—সুভদ্রা চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বললেন ?

লোকটি কথা বললে না, কিন্তু চোখের ইঙ্গিতে সুবোধের মৃতদেহটিকে দেখিয়ে দিলে।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সুভদ্রার নিজের চোখ দুটিও আর এক বার সুবোধের মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

সেই সৌম্য সুন্দর শান্ত মুখ। বাতায়নের পুরু কাচের ভিতর দিয়ে প্রখর রৌদ্র কোমল হয়ে সেই মুখের উপর এসে পড়েছে। জীবনে ক্ষুব্ধ বাসনার উদ্দাম তরঙ্গের নীচে এত দিন যা আত্মগোপন ক'রে লুকিয়ে ছিল, তারই অনবগুণ্ঠিতা সুষমা আজ মৃত্যুর পরিপূর্ণ শান্তির ভিতর দিয়ে স্নিগ্ধ মাধুর্যে স্পষ্ট হয়ে ফুঠে উঠেছে। সে এক অপার্থিব সৌন্দর্য !

সুভদ্রার বিহ্বল চোখের চকিত দৃষ্টি সেই মুখের উপর গিয়ে পড়তেই অকস্মাৎ তার নিজের কঠিন বিষণ্ণ মুখখানিও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিদ্যুদ্বেগে সেই লোকটির মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে সে রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, কি বলছেন ? সুবোধবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আছে ?

লোকটি কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিলে, আমাদের রিপোর্ট তাই তো বলে।

সত্যি? আপনাদের রিপোর্টে এই কথা আছে? সুবোধবাবুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা?

তাই তো দেখছি।—বলতে বলতে লোকটির ঠোঁঠের কোণে অল্প একটু হাসিও ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি সুভদ্রার মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলে সে; কিন্তু ওতেও তেমন সুবিধে হ'ল না বুঝে হাতের কাগজের তাড়াটি সে মুখের কাছে তুলে ধরলে; তার পর আবার খুক ক'রে একটু কেশে হাতের ঐ কাগজখানার উপরেই চোখ রেখে অধিকতর কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, অনেক দিনের সম্বন্ধ আপনাদের—আর তা তো দেখছি,—রীতিমতই ঘনিষ্ঠ। অনেক দিন যাবৎই তো এক সঙ্গে কাজ করছেন আপনারা—সব যুদ্ধবিরোধী পঞ্চমবাহিনীর কাজ।

সব কথা সুভদ্রার কানে গেল না; সব কিছু সে লক্ষ্যও করলে না,—না লোকটির কুণ্ঠিত ভাব, না তার ঠোঁটের কোণের সযত্নসংযত কৌতুকের হাসিটুকু। লোকটি যে তার প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলে নি, বলেছে 'হ্যাঁ,' শুধু এইটুকু বুঝেই সুভদ্রা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, আঃ, বাঁচলাম। উৎফুল্ল চোখে আর এক বার সুবোধের মুখখানা দেখে নিয়ে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে আবার বললে, তবে আর কোন ভাবনা নেই আমার। চলুন, কোথায় যেতে হবে, আমার একটুও আপত্তি নেই।

কিন্তু সে চলবার উপক্রম করতেই কমলা পিছন থেকে তার আঁচল টেনে ধ'রে চাপা গলায় ডাকলে, শুভা,—ও শুভা!

কমলা এতক্ষণ হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে ছিল, তার চোখের সামনে নাটকের মত কি যে সব ঘটছে, তা সে ঠিক ঠিক বুঝতেই পারছিল না। এ বারও ভাল ক'রে কিছু না বুঝেই কেবল অন্ধ আবেগেই সুভদ্রাকে ডেকে ফিরালে সে।

সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল। চমকে মুখ ফিরাতেই তার চোখ দুটি কমলার কোলে ঘুমন্ত খোকার মুখের উপর গিয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার উৎফুল্ল মুখখানি এক নিমেষেই একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

আমার খোকা!

সুভদ্রা হঠাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। বিদ্যুদ্বেগে পুলিস-কর্মচারীটির

মুখের দিকে।করে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে সে আবার বললে, আমার খোকার কি হবে ?

লোকটি নিজেও থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, বিব্রতের মত এক বার খোকা, এক বার কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পরে সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, ওটি বুঝি—

আমার খোকা।—সুভদ্রা আবার ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠল, আমার ছেলে ! আমি গেলে ও কোথায় থাকবে ?

লোকটি এ বার হেসেই ফেললে ; বললে, সে জন্য ভাবনা কি মিস্ দাস ? ইচ্ছে করলে ওকে আপনি সঙ্গেই নিতে পারেন।

ওই হাসি, ওই সম্বোধন, এ সবের অর্থ সুভদ্রার মাথায় ঢুকলই না। রুদ্ধ নিশ্বাসে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি বলছেন আপনি ? ওকে সঙ্গে নিতে পারব আমি ?

নিশ্চয়।—লোকটি এ বার আপ্যায়নের স্বরেই উত্তর দিলে, নিশ্চয় পারেন, আইনই আছে।

সুভদ্রার বিবর্ণ মুখখানি আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে, আঃ, বাঁচলাম। আমায় বাঁচালেন আপনি।

কিন্তু খোকাকে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে কমলার মুখের দিকে তাকাতেই সুভদ্রা অকস্মাৎ শিউরে উঠে এক পা পিছনে হ'টে গেল।

কমলার মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ, তার শরীরটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

দাঁতে ঠোঁট চেপে সুভদ্রাও কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; তার পর খপ ক'রে কমলার মুক্ত হাতখানি দুই হাতে চেপে ধ'রে আগ্রহের স্বরে সে বললে, কমলা, ভাই, খোকা তোমার কাছেই থাকবে। ও তো তোমারই খোকা।

কমলা বিহ্বলের মত এক বার খোকা, এক বার সুভদ্রা, ও এক বার পুলিস-কর্মচারীটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর সে হাসলে, সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

কমলার হাতখানি আরও জোরে চেপে ধ'রে সুভদ্রা বললে, না, হাসির

কথা নয়, ওকে তোমায় রাখতেই হবে কমলা। কথা তো অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে, ও তো তোমার।

হঠাৎ কি যেন একটা হয়ে গেল, কমলার মুখের বিষণ্ণ হাসি দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ মাধুর্যে মহিমময় হয়ে উঠল।—আমার বই কি! খোকা তো আমারই। বলতে বলতে বুকের উপর খোকাকে সে আরও জোরে চেপে ধরলে; তার পর সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে সে আবার বললে, কিন্তু ওকে মানুষ করবার ভার আমি তোর হাতে ছেড়ে দিলাম, শুভা। মনে যেন থাকে, জেল থেকে ফিরে এসে আমার এই গচ্ছিত ধন আবার আমাকেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

বিহ্বল মুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর ফুটল না; কিন্তু সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু পরে কমলাই সকৌতুক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, বোকার মত চেয়ে রইলি যে? এই নে।

বলতে বলতে এক রকম জোর ক'রেই খোকাকে সে সুভদ্রার বুকে তুলে দিলে।

আধ ঘণ্টা পরের কথা।

হাসপাতালের ঠিক সামনেই বড় রাস্তার উপর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল; পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন কন্‌স্টেব্‌ল। ওদেরই এক জন গাড়ির দোর খুলে দিলে। পুলিস-কর্মচারীটি সুভদ্রার মুখের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন।

সুভদ্রা কমলার মুখের দিকে তাকাতেও পারলে না, সে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু কমলাই গাঢ় স্বরে বললে, একটু দাঁড়াও, সুভদ্রা।

সুভদ্রা থমকে দাঁড়াল; সে কুণ্ঠিত চোখে ফিরে তাকাতেই কমলার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল; তার পর দুই জোড়া চোখই প্রায় এক সঙ্গেই খোকার মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

সুভদ্রার কোলে আসবার সময় খোকার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন কেঁদেও উঠেছিল সে। কিন্তু মায়ের বুকের পরিচিত কোমল স্পর্শ অনুভব ক'রে তার পর সে আর কাঁদে নি। কেবল তার সরোবরের মত প্রশান্ত নীল

স্বচ্ছ চোখ দুটি দিয়ে সে যেন অপরিসীম বিস্ময়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

কমলা খোকার মুখের উপর ঝুঁকে পড়তেই সেই চোখ দুটি কমলার আনত মুখের উপর গিয়ে প'ড়েই একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

কমলা কোন কথা বললে না, কেবল আরও একটু হেঁট হয়ে খোকার কপালের উপর আলগোছে একটি চুমো খেয়েই সে আবার অনেকখানি দূরে স'রে গেল।

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠিল। কন্‌স্টেব্‌ল দুজন আগেই সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে ব'সে ছিল, এবার সাদা-পোশাক-পরা কর্মচারী দুজনও ভিতরে সুভদ্রার দুই দিকে গিয়ে বসল। এক জন ড্রাইভারকে উদ্দেশ ক'রে বললে, চালাও গাড়ি।

কমলা এক দৃষ্টে গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে ঐ ফুটপাথের উপরেই অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু গাড়ি আর তার চোখে পড়ল না।

শেষ

এই লেখকের

সুবৃহৎ উপন্যাস

অগ্নিসংস্কার-এর

প্রথম পর্ব

প্রধূমিত বহ্নি

মূল্য—৪৲

শ্রীসজনীকান্ত দাস বলেন—মণীন্দ্রবাবুর 'অগ্নিসংস্কার—প্রধূমিত বহ্নি' যুগ-মনোভাবকে উপন্যাসের আকার দেওয়ার শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা। নায়ক-নায়িকাদের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জাতির ভুলত্রুটি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যতের নির্দেশ লেখক দিতে পারিয়াছেন।

Hindusthan Standard বলেন—Mr. Roy's novel draws upon the inspiration of this historic land-mark (August, 1942) and sets an inward drama of love, deceit and despair against a sombre political background....Mr. Roy has given a human story and it is about the lives of a number of frustrated, storm-tossed, star-crossed mortals whose individual destinies mingled with the destiny of a nation in rebellion in 1942.

আনন্দবাজার পত্রিকা—সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব শিল্পীর নয়, জীবন-চিত্র প্রকাশ করাই তাহার কর্তব্য। সে কর্তব্য লেখক সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ভাষার গতি ও বর্ণনাশক্তির উপর লেখকের বিশেষ অধিকার আছে।···ধনীর পুত্র অরুণাংশু, সুভদ্রা ও সুবোধ পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়াছে।···পুস্তকখানি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত। ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক।

Amrita Bazar Patrika—The author writes with fluent grace, has an insight into the working of the human mind and can portray characters vividly.

দেশ—রাজনীতিই এই কাহিনীর উপজীব্য বা মূল কথা নয়। রাজনীতিগত মতভেদ, ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈপরীত্য, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ইত্যাদির ফলে গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য কাহিনীটি ঘোরালো, উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে।···প্রত্যেকটি চরিত্রই সজীব,—সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহারা যেন আমাদের পরিচিত। লেখকের ভাষা সরল, সাবলীল ; বর্ণনাভঙ্গি প্রশংসনীয়।

যুগান্তর—এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানির এমন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে যাকে উপেক্ষা করা কঠিন। বইখানির বিষয়বস্তু, তার রচনাভঙ্গি স্বভাবতঃই পাঠকপাঠিকার মন টেনে নিয়ে চলে পরিণতির দিকে,—অসীম কৌতূহলে উৎকণ্ঠিত ক'রে রাখে পাতায় পাতায়।···অনমুমোদিত মাতৃত্বের সমস্যা থেকে বিভিন্ন দলগত ঐক্যের সমস্যাকে তিনি বাস্তবের আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার অসংখ্য গল্প-উপন্যাসের মধ্যে এই বইখানি আপন স্বাতন্ত্র্যে উপভোগ্য।

পূর্ব্বাশা—মণীন্দ্রবাবু সত্যি সত্যি একটি ভাল কাহিনীকে অবলম্বন ক'রেই উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন।···ঘটনাপরম্পরায় "প্রধূমিত বহ্নি" পাঠকের মনে আগাগোড়া একটা কৌতূহল সমান ভাবে জাগিয়ে রাখতে পারে।

প্রবর্ত্তক—লেখকের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও প্রখর। বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তিনি নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের অন্তর্লোককে পরিস্ফুট ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষক—যে রাজনৈতিক ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে এই কাহিনীর সৃষ্টি, তার চাপে প'ড়ে কাহিনীর শ্বাসরুদ্ধ হয় নি বা তার সহজ গতি ক্ষুণ্ণ হয় নি। অপর পক্ষে ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা না ক'রেও তাঁর রচনা, তাঁর সৃষ্টি ইতিহাসের ঊর্দ্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছে।···গ্রন্থকার যে প্রচুর রস পরিবেশন করেছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৯২৯ সালে বাজেয়াপ্ত

কাকোড়ি ষড়যন্ত্র (২য় সংস্করণ)

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম রোমাঞ্চকর কাহিনী

মূল্য—২৲

রুশিয়ার নৈতিক জীবন

(আলোচনা—২য় সংস্করণ)

মূল্য—১৲

স্রোতের টানে (উপন্যাস

মূল্য—২৷৹

Salaries of Public Servants In India

—A COMPARATIVE STUDY -/8/-

—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

১৯৩১ সালে বাজেয়াপ্ত

মায়ের ডাক (গল্প-সংগ্রহ)

ভুল (উপন্যাস)

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়